

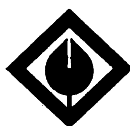
হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

রাক্ষুসে নেকড়ে

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

রাক্ষুসে নেকড়ে





পত্রভারতী

পৌলমী সাহা, সৌগত সেনগুপ্ত
রাজর্ষি সরকার, অরিন্দম দীঘাল ও
আমার অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় বন্ধুদের

বিপুলা এ পৃথিবী। বিচিত্র তার জীবজগৎ! তার কতটুকুই বা জানি। ক্রিপ্টোজুলজিস্ট হেরম্যান আর সুদীপ্ত ঘুরে বেড়ায় এই সব গল্প কথার আশ্চর্য প্রাণীদের খোঁজে। মাদাগাস্কারের জল-জঙ্গল অধ্যুষিত গহীন অরণ্য প্রদেশে এমন এক মাংসাশী গাছ নাকি আছে যা মানুষদের তার খাদ্য হিসাবে টেনে নেয়। নরখাদক গাছ! এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন মিশনারী পর্যটক বা প্রাচীন অভিযাত্রীরা। আদিম জনজাতিদের কাঠে খোদাই ছবিতেও আঁকা আছে সেই নরখাদক গাছের ছবি। অক্টোপাসের দাঁড় মতো আকর্ষ দিয়ে সে জড়িয়ে ধরছে জ্যান্ত মানুষকে। জীববিজ্ঞানী ও উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা নানা সময়ে মাদাগাস্কারে সেই গাছের সন্ধানে অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। কেন না সেই জঙ্গল প্রদেশের আদিম উপজাতিরা গাছের সন্ধান জানলেও বাইরের পৃথিবীকে তার খোঁজ দিতে চায় না। কারণ, গাছকে তারা দেবতাজ্ঞানে পুজো করে। সেই নড়খাদক গাছের সন্ধানেই নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে হেরম্যান আর সুদীপ্ত অভিযান চালায় মাদাগাস্কারের জল-জঙ্গল অধ্যুষিত গ্রামে। তারপর? এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল শারদীয়া 'বসুমতী' পত্রিকায়।

বইয়ের দ্বিতীয় উপন্যাস 'নেকড়ে খামার'-এর পটভূমি সিকিম। হিমালয়ের তুষারাবৃত কুয়াশামাখানো প্রাচীন রেশম পথ। সেখানে তুষার নেকড়েদের পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলেছেন জার্মান প্রাণীবিদ ভাইমার। কিন্তু স্থানীয় লোকরা আতঙ্কিত সেই নেকড়ে খামার নিয়ে। তাদের ধারণা ওই নেকড়েগুলো আসলে সীমান্ত যুদ্ধে নিহত মানুষদের প্রেতাত্মা! 'ওয়ার উল্ফ'। বিশেষ গোপন কারণে সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওই ক্যাম্পকে বন্ধ করার। প্রাণীগুলোকে হত্যা করার। ভাইমার তার প্রাণীগুলোর প্রাণ রক্ষা করার জন্য আবেদন জানান 'বিশ্ব বন্যপ্রাণ সংস্থা'-র কাছে। তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে ভাইমারের নেকড়ে খামারে হাজির হয় অনীশ। কী অভিজ্ঞতা হল অনীশের সেই নেকড়ে খামারে?

দুটি উপন্যাসের নাম মিলিয়ে এ বইয়ের নামকরণ করা হল—'রাক্ষুসে নেকড়ে'।

প্রকাশককে ধন্যবাদ একমলাটে এই দুই উপন্যাসকে যুক্ত করার জন্য। সববয়েসি অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী পাঠকদেরই এই উপন্যাস দুটি ভালো লাগবে বলে আমার আশা।

২০ মার্চ ২০১৭

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত



মাদাগাস্কারের রাক্ষুসে গাছ ১১

নেকড়ে খামার ৯৩

লেখকের অন্যান্য বই

খাজুরাহ সুন্দরী
চন্দ্রভাগার চাঁদ
ফিরিঙ্গি ঠগি
রুদ্রনাথের চুনির চোখ
কৃষ্ণলামার গুম্ফা



মাদাগাস্কারের রাক্ষুসে গাছ

এয়ারপোর্ট থেকে মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্তানরিভোর রাস্তা ধরে হোটেলের পথে ছুটছিল সুদীপ্তদের গাড়ি। ঝাঁ-চকচকে রাস্তা। দু-পাশে আধুনিক দোকানপাট, শপিং মল, বড় বড় ঘরবাড়ি। রাস্তার মাঝে ফোয়ারা-শোভিত আইল্যান্ড, রেলিংঘেরা ফুটপাত। শহরটা বেশ সাজানো-গোছানো। গাড়িতে বসে পথের দু-পাশটা দেখছিল সুদীপ্ত। মাঝে মাঝে সাইনবোর্ডে রাস্তার নাম লেখা আছে। বেশ অদ্ভুত-খটমট বিরাট বিরাট সব নাম। চট করে পড়া যায় না বা উচ্চারণ করা যায় না। যেমন আমবেহিবাঙ্গানাকা, রাদিমারাসাকাকা এসব। ট্রাফিক সিগন্যালে কয়েক মুহূর্তের জন্য যখন গাড়ি থামছিল তখন সুদীপ্ত পড়ার চেষ্টা করছিল সাইনবোর্ডে লেখা নামগুলো।

এক সময় সে হেরম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'খেয়াল করেছেন এখানকার রাস্তাঘাটের নামগুলো কেমন অদ্ভুত আর বিরাট?'

হেরম্যান হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, খেয়াল করেছি। তা ছাড়া মাদাগাস্কার নিয়ে কয়েকটা বই পড়ছিলাম, এ দেশটা সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য। সেখানেও অদ্ভুত কিছু নাম পেয়েছি। যেমন সতেরো শতকে মাদাগাস্কারের যিনি রাজা ছিলেন তাঁর নাম ছিল 'থানদিয়ানোম্পোনিমেরিনার।' কী বিরাট নাম! অনেক কষ্টে নামটা মুখস্থ করেছি।'

সুদীপ্ত হেসে ফেলে বলল, 'এ নাম উচ্চারণ করতেই আমার জিভ জড়িয়ে যাবে।'

হেরম্যান বললেন, 'আসলে ইন্দোনেশীয়, ফরাসি আর আফ্রিকান শব্দ মিলেমিশে এই নামগুলো তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপরাষ্ট্র এই মাদাগাস্কার আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত হলেও আফ্রিকার জনজীবন সংস্কৃতির চেয়ে এদেশের সংস্কৃতির অনেক বেশি মিল পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরের দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে। এ দেশের ভাষাতে সে দেশের ভাষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি। দশম দশকে এখানে প্রথম আসে

ইন্দোনেশিয়রা, চতুর্দশ শতকে আসে আফ্রিকানরা আর ষোড়শ শতকে ফরাসিরা এদেশ দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাদাগাস্কারে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রিটিশ সেনা ঘাঁটি গাড়ে। ১৯৬০ সালে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা অর্জন করে এই দেশ...।'

কথা বলছিল সুদীপ্তরা। হঠাৎ ড্রাইভার বেশ জোরে ব্রেক কষে থামিয়ে দিল গাড়ি। আশপাশের গাড়িগুলোও দাঁড়িয়ে পড়ল। কী হল ব্যাপারটা! সামনে রাস্তার দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত। লাল-নীল-হলুদ-সবুজ, যেন একটা রামধনুর স্রোত বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সামনে দিয়ে। গিরগিটির ঝাঁক রাস্তা পেরোচ্ছে। সংখ্যায় তারা কয়েক হাজার হবে! অদ্ভুত দৃশ্য! এ-দৃশ্য আগে কোনওদিন সুদীপ্ত দেখেনি। এত গিরগিটি! তবে ফুটপাথ ধরে হেঁটে যাওয়া মানুষজন এই অদ্ভুত দৃশ্যের দিকে তাকাচ্ছে না দেখে সুদীপ্ত বুঝতে পারল সম্ভবত তারা এ দৃশ্য দেখে অভ্যস্ত। সুদীপ্তর চোখে বিস্ময়ের ভাব খেয়াল করে ড্রাইভার বলল, 'সারা পৃথিবীতে যত গিরগিটি আছে তার পঁচাত্তর ভাগ কিন্তু আমাদের মাদাগাস্কারেই আছে। এ-দৃশ্য আপনারা এখানে বিভিন্ন সময় দেখতে পাবেন। এত গিরগিটি থাকলেও এদের মারা কিন্তু কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যে কারণে এদের জন্য খুব সাবধানে আমাদের গাড়ি চালাতে হয়।'

মিনিটখানেক সময় লাগল সেই চলমান রামধনুর রাস্তা পেরোতে। তারপর আবার চলতে শুরু করল সুদীপ্তদের গাড়ি।

হেরম্যান বললেন, 'এ দেশটাতে নানা বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ ও পশুপাখি পাওয়া যায় বলে এ দেশকে বলা হয়—দ্য ল্যান্ড অব দ্য লিভিং ফসিলস্।' যেমন 'লেমুর' মাদাগাস্কার ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। যে কারণে জীববিজ্ঞানী-প্রকৃতিবিদ্‌রা এদেশে ছুটে আসেন। আমাদের সফরসঙ্গী প্রকৃতিবিদ রবার্টও এ কারণেই এখানে এসেছিলেন।'

এরপর একটু থেমে হেরম্যান বললেন, 'হয়তো আমরা যার সন্ধানে এদেশে এসেছি সেই 'মানুষখেকো গাছ' সত্যিই আছে এদেশে। নইলে যুগ যুগ ধরে মাদাগাস্কারের রাক্ষুসে গাছের গল্প চলে আসছে কেন? রবার্টও তার ইঙ্গিত পেয়েছেন।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'বাইরের পৃথিবীতে এই নরখাদক গাছের গল্প

ছড়াল কীভাবে?'

হেরম্যান বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই এই দ্বীপের আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই মানুষখেকো গাছের কথাটা প্রচলিত ছিল। তবে সভ্য পৃথিবীর সামনে মানুষখোকা গাছের কথা তুলে আনেন প্রকৃতিবিদ এডমুন্ড স্পেনসর। পৃথিবী-বিখ্যাত এই প্রকৃতিবিজ্ঞানী ১৮৭৪ সালে 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড' নামের সে সময়কার বিখ্যাত সংবাদপত্রে 'ম্যান ইটিং ট্রি অব মাদাগাস্কার' নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখেন। আর তার ক'দিনের মধ্যেই জার্মান প্রকৃতিবিদ কার্ল লিচের একটি অভিজ্ঞতার কথা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় ওই গাছ সম্বন্ধে। তার বিবরণ সংক্ষেপে মোটামুটি এই রকম। একদিন লিচে নমুনা সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান একদল মকোড়ো আদিবাসী সন্তপর্ণে কোথাও যাচ্ছে। মকোড়োরা এ দ্বীপের অন্যতম প্রাচীন জনগোষ্ঠী। জঙ্গলে থাকে তারা। কৌতূহলবশত লিচে সন্তর্পণে তাদের অনুসরণ করেন। জঙ্গলের গভীরতম অংশে একটা ফাঁকা জায়গাতে তারা গিয়ে উপস্থিত হয়। মকোড়োদের নেতৃত্বে ছিল তাদের 'উইচ ডক্টর' বা জাদুকর পুরোহিত। চারপাশে জঙ্গলঘেরা ফাঁকা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল একটা অদ্ভুত দেখতে গাছ। সে গাছটা দেখতে পেয়েই নাকি মকোড়োরা চিৎকার করে ওঠে 'টেপ টেপ' বলে। গাছটার বিবরণও দিয়েছেন লিচে। গাছের গুঁড়িটা অন্তত আট ফুট উঁচু। কালচে-ছাই রঙের মোটা গুঁড়ি। গাছটা দেখতে অনেকটা আনারস গাছের মতো। মাথাটা অনেকটা আকর্ষর মতো পাতা দিয়ে ঢাকা। তার মধ্যে আটটা পাতার দৈর্ঘ্য দশ-বারো ফুট। অক্টোপাসের বাহুর মতো বা শুঁড়ের মতো দেখতে সেই পাতাগুলো গাছের মাথা থেকে নীচে নেমে মাটিতে লুটোচ্ছে। তাদের রং কালচে সবুজ। মকোড়োরা ধীরে ধীরে গাছটার দিকে গিয়ে তার হাত পাঁচেক দূরে থেমে যায় যেখানে গাছের মাথা থেকে বাহুর মতো নেমে আসা পাতাগুলো পৌঁছবে না। এরপর জাদুকরের নির্দেশে মকোড়োরা তাদেরই দলের একটা মেয়েকে ধরে বর্শা ছোড়ার মতো তাকে ছুড়ে দেয় গাছের মাথায়। গাছের মাথা থেকে ঝুলতে থাকা পাতা বা শুঁড়গুলো লাফিয়ে মাথার দিকে উঠে গিয়ে নাগপাশের মতো জাপটে ধরে, মেয়েটাকে। শুঁড়ের কঠিন নিষ্পেষণে

ছটফট করতে থাকে মেয়েটা। গাছের মাথাটায় পাতাগুলো সরে গিয়ে উন্মোচিত হয় এক গহ্বর। বাহুগুলো আর মেয়েটা অন্তর্হিত হয় সেই গহ্বরে। এরপর দীর্ঘক্ষণ ধরে থরথর করে কাঁপতে থাকে গুঁড়িসমেত গাছ। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল গাছটার ভিতরে ভয়ংকর কিছু ঘটে চলেছে সেসময়। কম্পন থেমে যায় এক সময়। ধীরে ধীরে সেই বাহু বা অদ্ভুত শুঁড়ের মতো পাতাগুলো আবার গাছের মাথার গহ্বর থেকে নীচে নেমে এসে মাটিতে এলিয়ে পড়ে নির্জীবভাবে। অজগর শিকার গলাধঃকরণের পর যেমন এলিয়ে পড়ে ঠিক তেমনই। ততক্ষণে তারা আরও স্ফিত হয়েছে। তাদের সবুজ ত্বকের ভিতর থেকে ফুটে বেরোচ্ছে লাল আভা। গাছের মাথা থেকেও গুঁড়ি বেয়ে চুঁইয়ে পড়তে থাকে গাছের রসমিশ্রিত রক্ত, মেয়েটার দেহের অন্তঃযন্ত্র। অসভ্য মকোডোরা তখন গাছের কাছে এগিয়ে গিয়ে সঙ্গে আনা কাঠের পাত্রে সেগুলো সংগ্রহ করতে থাকে, সম্ভবত তা খাবার জন্য। পরে লিচে একজন মকোডোর সঙ্গে কথা বলে জেনেছিলেন এটা নাকি মকোডো উপজাতিদের আত্মবলিদানের পদ্ধতি। পরবর্তীকালে লিচে সে জঙ্গলে আরও বেশ কিছু অমন ছোট গাছ দেখেছিলেন। গাছগুলোর গহ্বরে নাকি আঠালো রস পরিপূর্ণ থাকে। একবার একটা গাছকে লেমুরও খেতে দেখেছিলেন তিনি। স্পেনসর ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তাঁর আর লিচের বয়ান "মানুষখেকো" গাছ সম্বন্ধে সারা পৃথিবীতে তোলপাড় ফেলে দেয়। বেশ কিছু ধর্মপ্রচারক খ্রিস্টান মিশনারীও বিভিন্ন সময় ওই গাছের কথা বলেছেন। আমেরিকার মিশিগান প্রদেশের গভর্নর অসবর্নও "দ্য ল্যান্ড অব ম্যান ইটিং ট্রি" বলে একটা বিখ্যাত বই লিখেছিলেন।'—একটানা কথা বলে হেরম্যান থামলেন।

সুদীপ্ত তার কথা শুনে একটু ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু উদ্ভিদবিজ্ঞানী বা জীববিজ্ঞানীরা তো এই মানুষখেকো গাছের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করতে চান না?'

তার কথা শুনে হেরম্যান একটু ক্ষুব্ধভাবেই বললেন, 'যে কথাটা তোমাকে আগেও বেশ কয়েকবার বলেছি সে কথা তোমাকে আবারও বলি। বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি গবেষণাগারে ইঁদুর বা গিনিপিগ বা মটরশুঁটি গাছ নিয়ে কাজ করা আর সেমিনারে বক্তৃতা করা, তথাকথিত

ডক্টরেট ডিগ্রিধারী বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্যর ওপর আমি খুব বেশি আস্থাশীল নই। তাঁদের পুঁথিগত বিদ্যা অনেক সময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এক সময় তাঁরা বিশ্বাসই করতেন না ইন্দোনেশিয়ার কেমোডো ড্রাগনের কথা। সেটা নাকি ছিল ইন্দোনেশিয়ার অশিক্ষিত মানুষের মন-গড়া গল্প অথবা আমাদের মতো ক্রিস্টোলজিস্ট অর্থাৎ যাঁরা রূপকথা বা উপকথার প্রাণী বা উদ্ভিদদের খুঁজে বেড়ান তাঁদের ধাপ্পাবাজি। অথচ একদিন প্রমাণিত হল যে ইন্দোনেশিয়ার সুন্দা দ্বীপমালায় বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে সেই দানব সরীসৃপ। সভ্য পৃথিবীর পুঁথিপড়া বিজ্ঞানীরা বলতেন দানব অক্টোপাস, যারা জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারে, তা নাকি নিছকই মাতাল নাবিকদের গালগল্প। অথচ বছর দশেক আগে জাপানি ক্রিস্টোজ্যুলজিস্টরা সমুদ্রের গভীর অংশ থেকে তাদের চলমান ছবি তুলে এনে পুঁথিপড়া পণ্ডিতদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করলেন। মাত্র একশো বছর আগেও ইউরোপীয়ান পণ্ডিতরা বিশ্বাস করতেন না যে ক্যাঙারুর মতো কোনও দ্বীগর্ভ প্রাণী আছে। প্লাটিপাস বা হংসচঞ্চু, অ্যান্টিলোপ প্রজাতির ওরিক্সওতো এক সময় অনেক জীববিজ্ঞানীর হাসাহাসির বিষয় ছিল। এ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে কিন্তু এখনও মানুষের পা পড়েনি। আধুনিক পৃথিবী উপগ্রহ চিত্রে তাদের অস্পষ্টভাবে দেখেছে মাত্র। তার মধ্যে আছে সমুদ্রের গভীরতম অংশ, উত্তুঙ্গ পর্বতকন্দর, গহীন অরণ্য প্রদেশ বা মরু অঞ্চল। এসব জায়গার কোথায় কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ লুকিয়ে আছে কে বলতে পারে? গত একশো বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একশোরও বেশি নতুন প্রজাতির প্রাণীর সন্ধান মিলেছে। আর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা আরও বেশি। এমন দিন হয়তো আসবে যেদিন হয়তো মানুষখেকো গাছের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবে এই পৃথিবী। বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রাচীর বা কাঁটাতারের বেড়ার ঘেরাটোপে প্রদর্শিত হবে তার নমুনা।'

সুদীপ্ত বলল, 'আপনার বক্তব্য আমি মানছি। কিন্তু এর আগেও তো বেশ কয়েকবার অভিযান চালিয়েছেন উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা ওই গাছের খোঁজে। কিন্তু তার সন্ধান মেলেনি।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছে। কিন্তু হয়তো অনুসন্ধানকারীরা এই দ্বীপরাষ্ট্রের বিশাল অরণ্যের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোতে পারেননি। এ

ব্যাপারটা অনেকটা আফ্রিকার হিরের খনির সন্ধানের মতো। আছে ঠিকই, কিন্তু সবাই তার সন্ধান পায় না। হিমালয়ের তুষারচিতা বা দানব স্কুইডের সন্ধান কিন্তু মিলেছে বহুবার অভিযান চালাবার পর। সাদা গোরিলার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। হয়তো বেশ কিছু ব্যর্থ অভিযানের পর আমরাই খুঁজে বার করলাম মাদাগাস্কারের মানুষখেকো গাছকে। গতবার জাভাতে আগ্নেয় পর্বত অধ্যুষিত বনভূমিতে আমরা দুজন যে উড়ুক্কু দানব 'আহুল'-এর সন্ধানে অভিযান চালিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত তাকে সভ্য পৃথিবীর কাছে হাজির করতে না পারলেও কিন্তু তাকে চাক্ষুষ করেছি আমরা। সেটাই তো বড় ব্যাপার। আমরা তো আর অর্থের লোভে বা পুরস্কারের লোভে ওইসব প্রাণী বা উদ্ভিদদের খুঁজে বেড়াই না। খুঁজে বেড়াই মনের তাগিদে তাদের খুঁজে বার করার নেশায়। নইলে তো আমি এসব অভিযানের পিছনে এত অর্থ ব্যয় না করে আমার দেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যার অধ্যাপক হতে পারতাম। একটা ডক্টরেট ডিগ্রি তো আমার আছে। অথবা পারিবারিক ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট ব্যবসায় লাখ-লাখ ইউরো কামাতে পারতাম। আর তুমিও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসব অভিযানে সামিল না হয়ে এ সময়টা অন্য কাজে ব্যয় করে অর্থ-যশ পেতে পারতে।'

সুদীপ্ত হেরম্যানের কথা শুনে হেসে বলল, 'আপনার এ কথাগুলো আমি সমর্থন করি। আমাদের এখন পর্যন্ত অভিযানগুলো সফল হোক বা না-হোক এক জীবনে কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল বলুন তো? মানুষের জীবন তো একটাই। কখনও আমরা দুজন "বরফ দেশের ছায়া মানুষ" বা 'ইয়েতির' সন্ধানে পাড়ি দিয়েছি তুষারধবল হিমালয়ে। কখনও পাড়ি দিয়েছি, "বুরুণ্ডির সবুজ মানুষ"-এর খোঁজে আফ্রিকার অন্ধকার অরণ্য প্রদেশে বা "আহুল"-এর খোঁজে জাভার জঙ্গলে। আবার কখনও গেছি দানব অক্টোপাসের খোঁজে মুক্তা আহরণকারীদের সঙ্গে অস্ট্রেলীয় সমুদ্রের গভীরে। অথবা গেছি প্রাণহীন মরুরাজ্যে 'ইউনিকর্নের সোনার সিং"-এর খোঁজে। পাহাড়-অরণ্য-সমুদ্র-মরুভূমিতে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছি আমরা। কত বিচিত্র পরিবেশ! কত বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শ! কতবার মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছি আমরা। এক জীবনে অনেক ক'টা জীবনের

স্বাদ পেয়েছি। অর্থ বা খ্যাতির পরিমাপে এর কোনও মূল্য হয় না। এ অভিজ্ঞতা অমূল্য!'

সুদীপ্তরা কথা বলার ফাঁকেই রাস্তা ছেড়ে গাড়ি প্রবেশ করল হোটেল চত্বরে। মাঝারি মাপের একটা হোটেল। নাম 'গোল্ডেন লেমুর।' পোর্টিকোতে এসে থামল সুদীপ্তদের গাড়িটা। কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে কালো কাচে ঘেরা হোটেলের রিসেপশন রুম। তার ঠিক বাইরে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন এক ভদ্রমহিলা। পরনে খাকি শার্ট-প্যান্ট, কোমরে চওড়া বেল্ট, পায়ে হাইহিল বুট। তার গায়ের রং আর মাথায় ছোট ছোট অসংখ্য বিনুনি করা কুঞ্চিত কেশদাম দেখেই বোঝা যায় যে ভদ্রমহিলা আফ্রিকান বংশোদ্ভূত। তাঁর বয়স সম্ভবত ছাব্বিশ-সাতাশ হবে। তাঁকে গাড়ির ভিতর থেকে দেখতে পেয়েই হেরম্যান বলে উঠলেন, 'আরে রবার্ট দেখছি আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।' তাঁর কথা শুনে একটু অবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত। রবার্ট নামের একজন মার্কিন প্রকৃতিবিদ তাদের এই অভিযানে সামিল হবেন এবং তিনি সুদীপ্তদের এখানে আসার দুদিন আগে এসে অভিযানের বন্দোবস্ত করছেন একথা জানা ছিল সুদীপ্তর। কিন্তু তাঁর নাম শুনে সুদীপ্তর ধারণা হয়েছিল তিনি কোনও মাঝবয়সি, চোখে চশমা বা দাড়িওয়ালা কোনও ভদ্রলোক হবেন। রবার্ট যে একজন তরুণী বা ভদ্রমহিলা সুদীপ্ত তা ভাবেনি।

হেরম্যান সুদীপ্তর মনের ভাব পড়তে পেরে বললেন, ওর পদবি রবার্ট। পুরো নাম ডক্টর আনা রবার্ট। মিশিগান ইউনিভার্সিটি থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় ডক্টরেট।

২

সুদীপ্তরা গাড়ি থেকে নামতেই ওপর থেকে নীচে নেমে এগিয়ে এসে হেরম্যানের দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে আনা বলল, 'তোমাদের কোনও চিন্তা নেই। সব ব্যবস্থা এ দুদিনে করে ফেলেছি আমি। আগেরবার আমার এ দেশে আসাটা নানাভাবে কাজে লেগে গেল। তবে বড়

হোটেলের ব্যবস্থা করিনি এই কারণে যে, তোমরা তো আর এখানে বেশিক্ষণ থাকবে না।'

হেরম্যান এরপর রবার্টের সঙ্গে সুদীপ্তর পরিচয় করিয়ে দিলেন। ঝকঝকে হাসি হেসে সুদীপ্তর সঙ্গে সে করমর্দন করার পর সুদীপ্ত মৃদু হেসে বলল, 'আমি কিন্তু তোমার বা হেরম্যানের মতো উদ্ভিদবিদ্যা বা প্রাণীবিদ্যায় ডক্টরেট নই। আমি নিছকই একজন অ্যাডভেঞ্চারিস্ট। অবশ্য হেরম্যানের সঙ্গে বেশ কিছু অভিযানে থাকার সুবাদে ইদানীং মাঝে মাঝে নিজেকে ক্রিস্টোজ্যুলজিস্ট হিসাবে কোথাও কোথাও বলে ফেলছি।'

রবার্ট প্রত্যুত্তরে হেসে বলল, 'আরে অ্যাডভেঞ্চারিস্টরাই তো প্রথমে সব কিছু আবিষ্কার করে। আমরা তাদের পথ ধরে হেঁটে যাই। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কথা বলছেন? আমি বছরখানেক আগে মধ্য আফ্রিকার এক অরণ্যপ্রদেশে গিয়েছিলাম। সেখানে বান্টু জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ আছে যাদের অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত নেই। কিন্তু তারা আপনার দেওয়া যে-কোনও অচেনা গাছের পাতা হাতে নিয়ে ডলে তার রস বার করে গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারবে ওই পাতা বা গাছের কোনও ভেষজ গুণ আছে কিনা এবং তা কোন চিকিৎসায় ব্যবহার করা যেতে পারে। আধুনিক ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিকরা অনেক পরীক্ষার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা ওই লোকগুলো পাতার গন্ধ শুঁকেই নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে। জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নয়, অভিজ্ঞতার দাম সবচেয়ে বড়।'

এ কথা শেষ হবার পর রবার্ট সুদীপ্তদের হোটেলের ভিতরে নিয়ে চলল। যে গাড়িটা সুদীপ্তদের এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে এল সেটা হোটেলরই গাড়ি। ড্রাইভার মালপত্র নামিয়ে অনুসরণ করল তাদের।

নিজেদের ঘরে ঢুকে মুখোমুখি বসল রবার্ট আর সুদীপ্তরা। রবার্ট তার রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন সবে সকাল ন'টা বাজে। ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম নিতে পারবেন আপনারা। তারপর হোটেলেরই গাড়ি আমাদের নিয়ে যাবে ওখানে একটা ডোমেস্টিক রানওয়েতে। সেখান থেকে একটা ফকার প্লেনে আমরা তিনশো মাইল দূরে এক গ্রামে যাব। বিকাল নাগাদ আমরা গ্রামটাতে পৌঁছে যাব।'

সুদীপ্ত কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, 'ওটা কি মকোডো উপজাতিদের গ্রাম?'

রবার্ট বলল, 'না। ওখান থেকে ম্যাঙ্গকি নদীর অববাহিকা ধরে আমাদের পদব্রজে আরও একদিনের পথ যেতে হবে মকোডোদের গ্রামে পৌঁছোবার জন্য। ম্যাঙ্গকি নদীর অববাহিকা জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। জলা-জঙ্গলপূর্ণ জায়গা। এদেশটা আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত হলেও এখানকার জঙ্গলে কিন্তু সিংহ বা চিতা নেই। তবে জলেতে কুমির আছে, জঙ্গলে নানা বিষধর সাপ আর বিষাক্ত গিরগিটি আছে। আর আছে নানা ধরনের লেমুর ও অনেকটা বেড়ালের মতো দেখতে কিন্তু তার চেয়ে বড় এক ধরনের প্রাণী 'ফসা'। শেষ দু-ধরনের প্রাণী মাদাগাস্কারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আর তার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ তো আছেই।'

হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ওই মকোডো গ্রামে এর আগে ক'দিন ছিলে? তুমি ওখানে ঠিক কী অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলে? তোমাকে কেন আবার উৎসাহিত করছে আমাদের এই অভিযানে সামিল হতে?'

রবার্ট বলল, 'আমি কিন্তু ওই গ্রামের খোঁজে সেবার ওখানে যাইনি। আসলে ম্যাঙ্গকির অববাহিকা ধরে বিভিন্ন উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করতে করতে এগোবার সময়, ঘটনাচক্রে কিছুটা দিক্‌ভ্রষ্ট হয়েই মকোডোদের গ্রামে পৌঁছে যাই আমি আর আমার স্থানীয় গাইড ইদ্‌জেল। সে এবারও আমাদের পথ-প্রদর্শকের কাজ করবে। গ্রামের জনসংখ্যা কিন্তু বেশি নয়। আমি গতবার গুণে দেখেছিলাম। তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র সাঁইত্রিশ। তার মধ্যে নারীর সংখ্যা হল পাঁচ আর শিশু দুজন। মকোডোরা পৃথিবীর বিলুপ্তপ্রায় জনজাতির অন্যতম। যাই হোক, ওই গ্রামে গিয়ে আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়ি। সামনে জলা অধ্যুষিত ওই স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে একটু সমস্যা হয়েছিল আমার। তিনদিন আমাকে থাকতে হয় ওই গ্রামে। আপাতদৃষ্টিতে মকোডো উপজাতির লোকরা বেশ শান্ত প্রকৃতির। তবে তারা যে খুব সাহসী তার প্রমাণ আমি তাদের কুমির শিকারের সময় দেখেছি। জলার কুমির, গাছের লেমুরের মাংস আর ফলমূল খেয়ে তারা জীবন কাটায়। ওই গ্রামে আমার সঙ্গে টবু বলে

একটা কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ের পরিচয় হয়। আমি তাকে একটা রংচঙে পুঁতির মালা উপহার দেওয়ায় সে আমার খুব অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল একদিনের মধ্যেই। সময় পেলেই সে চলে আসত আমার কাছে। তার বিজাতীয় ভাষা আমি কিছুটা বুঝতাম, কিছুটা বুঝতাম না। তবে টুকরো টুকরো শব্দ আর আকার ইঙ্গিতে কথা চলত। বেশ হাসিখুশি একটা মেয়ে। চারবেলার মধ্যেই তার সঙ্গে প্রায় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তৃতীয় দিন খুব ভোরে আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি তখন সে এসে হাজির হল আমার কুঁড়েতে। তার চোখ-মুখে কেমন যেন একটা বিষণ্ণতা। টবু তার গলা থেকে আমার দেওয়া মালাটা খুলে আমার হাতে ফেরত দিয়ে বলল, ওটা তার আর দরকার নেই।

আমি অবাক হয়ে তার কারণ জানতে চাইলাম। সে তার জবাবে যা বলল, তার মধ্যে থেকে যতটুকু আমি বুঝলাম তা হল তাকে বনদেবতা বা বৃক্ষদেবতার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। গ্রামের ভালোর জন্য স্বেচ্ছায় সে সেখানে যাচ্ছে। বনদেবতার কাছে গায়ে কোনও গহনা পরে যাওয়া যায় না। ইতিমধ্যেই সে তার কাঠের গহনাগুলো খুলে ফেলেছে।

আমি জানতে চাইলাম বনদেবতা কোথায় থাকেন? কীভাবে সেখানে যেতে হয়?

টবু জবাব দিল, সে জায়গাটা চেনে না। গ্রামের 'উইচ ডক্টর' অর্থাৎ জাদুকর পুরোহিত তাকে নিয়ে যাবে সে জায়গাতে। আমি প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাপারটা নিয়ে এত ভাবিনি। তাই আমি তাকে বললাম, 'ঠিক আছে, মালাটা আমার কাছে থাক। আমি তো আজকের রাতও থাকব। তুমি ফিরে এসে মালাটা ফেরত নিয়ো। নইলে আমি মালাটা রেখে যাব অন্য কারও কাছে।'

এ কথা শোনার পর টবু কিন্তু আর দাঁড়াল না। বিষণ্ণ হেসে সে চলে গেল কুটিরের সামনে থেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোরের আলো ভালো করে ফুটতেই আমি ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম, দেখলাম গ্রামের সবাই টবুকে নিয়ে এগোচ্ছে যে ফাঁকা জমিতে গ্রামটা আছে তার লাগোয়া জঙ্গলের দিকে। আমিও কয়েক

পা হাঁটলাম সেদিকে, জঙ্গলের প্রান্তসীমায় এসে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। নারী-পুরুষ শিশু—সবাই একবার করে চুমু খেল তাকে, মাথা ঝুঁকিয়ে সুর করে তার উদ্দেশ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে একসঙ্গে কী যেন বলল সবাই। তারপর পুরোহিত আর কয়েকজন টবু নামের মেয়েটাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গলের ভিতর। অন্যরা আবার গ্রামে ফিরে এল। আমি তাদের একজনকে জিগ্যেস করলাম যে পুরোহিতরা কোথায় গেল? সে শুধু জবাব দিল, 'বনদেবতার কাছে।'

সারাদিন গ্রামটা কেমন যেন নিঝুম হয়ে থাকল। সূর্য ডোবার কিছু আগে যারা জঙ্গলে গেছিল তার সবাই ফিরল। তাদের মধ্যে টবু নামের মেয়েটাই শুধু নেই, সন্ধ্যা নামার পর গ্রামের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাতে আগুন জ্বালিয়ে তাকে ঘিরে গ্রামের সবাই বসল। পুরোহিত একটা পাত্র থেকে কী যেন একটা পানীয় খেতে দিলেন সবাইকে। আমার গাইড ইদ্‌জেল পরে আমাকে বলেছিল যে ওই পানীয়টা নাকি সম্ভবত রক্ত ছিল। কারণ, বাতাস থেকে একটা আঁশটে গন্ধ ভেসে এসেছিল তার নাকে। এরপর সমবেত সঙ্গীত শুরু করল মকোডোরা। মাঝরাত পর্যন্ত কুঁড়েঘরে শুয়ে আমি শুনলাম সেই অদ্ভুত সঙ্গীত। কখনও সে সুর দ্রুতলয়ের, আবার কখনও বিষণ্ণ অদ্ভুত এক সুর। তাই শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে আমরা গ্রাম ছাড়ব। তার আগে গিয়ে হাজির হলাম টবু যে কুঁড়েতে থাকত সেখানে। সে আর তার বাবা দুজনে থাকত সেখানে। আমি সেই কুঁড়েতে গিয়ে টবুর বাবার হাতে মালাটা দিতেই দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল তার চোখ বেয়ে। কিন্তু এরপরই সে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল যে, টবু আর ফিরবে না। বৃক্ষদেবতা তাকে গ্রহণ করেছেন। গ্রামের সবার মঙ্গলের জন্য বৃক্ষদেবতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছে সে।'

—একটানা দীর্ঘক্ষণ কথা বলার পর থামল রবার্ট। তারপর টেবিলে রাখা জল খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'আসলে মাদাগাস্কারের মানুষখেকো গাছের গল্প আগে আমি শুনলেও স্পেনসর বা লিচের অভিজ্ঞতার কথা পড়া ছিল না আমার। তা জানলে তখনই হয়তো ব্যাপারটা বুঝে চেষ্টা করতাম খোঁজখবর নেবার। হেরম্যান,

ইন্টারনেটে তোমার "রাক্ষুসে গাছের খোঁজে অভিযান ও তাতে কোনও প্রকৃতিবিদ্ সঙ্গী হাতে চান কিনা?"—এই বিজ্ঞাপন পড়ার পরই আমি ওই গাছ সম্বন্ধে আগ্রহী হই, এবং তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে স্পেনসরের, লিচের লেখা প্রথম পড়ি।'

হেরম্যান হেসে বললেন, 'আমার ওই বিজ্ঞাপনটা নিয়ে কিন্তু বেশ হাসাহাসি হয়েছে ভদ্রমহলে। কেউ কেউ আমাকে পাগলও ঠাউরেছেন। যাই হোক, তোমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে স্পেনসর-লিচের অভিজ্ঞতার কোনও যোগসূত্র আছে তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন, লিচের বক্তব্যেও ওই মানুষখেকো গাছের কাছে মেয়েরা নিজেদের উৎসর্গ করে বলা হয়েছে। বলিদানের কথা বলা হয়নি। মেয়েটার বাবাও তো তোমাকে বলেছে যে ওই মেয়েটি নিজেকে উৎসর্গ করেছে বৃক্ষদেবতার কাছে। আর মেয়েটিও তো তোমার কথা অনুযায়ী, আগেই জানত ব্যাপারটা। আমার ধারণা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই ঘটনার ফলে নারীসংখ্যা কমার কারণেই মকোডোদের জনসংখ্যা এত হ্রাস পেয়েছে। মহিলা না থাকলে সন্তানের জন্ম দেবে কারা? আর কয়েক দশকের মধ্যেই হয়তো পৃথিবী থেকে মকোডো জনগোষ্ঠী হারিয়ে যাবে। আর তার সঙ্গে হারিয়ে যাবে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি।

সুদীপ্ত বলল, 'মকোডোদের জঙ্গল থেকে শহরে এনে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে না সরকার, যাতে তাদের অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যায়?'

রবার্ট বলল, 'না, তা করা যায় না। কারণ মকোডোরা আপনাদের দেশের আন্দামানের "জারোয়া" বা ব্রাজিলের আমাজন অববাহিকার "মোচে" জনগোষ্ঠীর মতো ইউনেস্কোর সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত জনগোষ্ঠী। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী এদের জীবনযাত্রার ওপর কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারবে না কোনও দেশের সরকার। এইসব জনগোষ্ঠীকে তাদের বাসস্থান থেকে অন্য কোথাও তুলেও আনা যাবে না যদি না তারা স্বেচ্ছায় আসতে চান। এমনকী যেহেতু তারা এখনও পরিপূর্ণভাবে সভ্য নয় তাই দেশের ফৌজদারি আইনও তাদের ওপর প্রযোজ্য নয়। ধরো, যদি কেউ আন্দামানে জারোয়াদের বিষাক্ত তিরের আঘাতে অথবা

ব্রাজিলের মোচেদের ব্লো-পাইপে প্রাণ হারায় তবে ঘাতকের কোনও বিচার হবে না সে দেশের আইনে। ফাঁসি তো অনেক দূরের কথা, একঘণ্টার জন্যও আটক করা যাবে না জারোয়া, মোচে বা মকোডোদের।'

সুদীপ্ত বলল, 'এবার বুঝলাম ব্যাপারটা। আফ্রিকার বুরুন্ডিতে সবুজ মানুষের সন্ধানে গিয়ে আমরা এমনই এক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ছিলাম। জাভাতেও এ ধরনের জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছি আমরা।'

রবার্ট এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখন আমি যাচ্ছি। আমাকেও তৈরি হতে হবে। ঠিক বারোটায় কিন্তু হোটেল ছাড়ব আমরা। আমাদের অভিযানে যেসব জিনিস সবার কাজে লাগবে, তাঁবু, রসদ ইত্যাদি আগেই গাড়িতে তুলে রাখব।'

সুদীপ্ত আর হেরম্যানও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হেরম্যান তার উদ্দেশে বললেন, 'যাবার আগে তোমাকে শেষ একটা প্রশ্ন করব। তুমি প্রকৃতিবিদ্ ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী। একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসাবে তোমার কি মনে হয় যে অমন মাংসাশী গাছের অস্তিত্ব থাকতে পারে? অত বড় কোনও গাছ, যা মানুষকেও খেতে পারে?'

রবার্ট বলল, 'মাংসাশী গাছ যে পৃথিবীতে আছে তা আমি আপনি সবাই জানি। তার মধ্যে বিখ্যাত কোবরা লিলি, মাউস ইটিং পিচার প্ল্যান্ট, রেনবো প্ল্যান্ট, বাটার ওয়ার্টস, উট্রিকল্যারিয়া এসব। এদের মধ্যে "মাউস ইটিং পিচার প্ল্যান্ট" ছোট ইঁদুর খায় আর অন্য সব পোকামাকড় খায়। এখন পর্যন্ত নথিভুক্ত সবচেয়ে বড় কার্নিভোরাস বা মাংসাশী গাছ হল "নেপেনথেস রজা"।' বের্নিওর মাউন্ট কিনাবলুর গভীর জঙ্গলে পাওয়া যায় ওই পিচার প্ল্যান্ট। তার মুখের ব্যাস দেড় ফুট। ছোটখাটো প্রাণীকে সে খেতে পারে। তবে অত বড় মাংসাশী গাছ থাকতে পারে বা পারে কিনা, সে সম্বন্ধে চট করে সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। এই বিপুলা পৃথিবীর কোথায় কী লুকিয়ে আছে আমাদের জানা নেই। আশা নিয়েই তো আমরা কোনও কিছুর সন্ধান করি।'

রবার্টের শেষ কথাটা বেশ ভালো লাগল সুদীপ্তর। হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, আশাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে।'

৩

একটু বিশ্রাম নিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে ঠিক বেলা বারোটায় হোটেলের বাইরে বেরোল সুদীপ্তরা। রবার্ট পোর্টিকোতেই গাড়িতে মালপত্র উঠিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হোটেল ছেড়ে রওনা হল এয়াপোর্টের উদ্দেশে। রবার্ট পথে যেতে যেতে বলল, 'এদেশের আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু বেশ ভালো। তোমরা যেখানে নামলে সেই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ছাড়াও শুধু এখানেই আরও চারটে ছোট এয়ারপোর্ট আছে দেশের বিভিন্ন জায়গাতে পৌঁছোবার জন্য। আসলে এ দেশের বিভিন্ন শহর জঙ্গল অথবা নদী দিয়ে ঘেরা। স্থলপথে সেখানে পৌঁছোতে অনেক সময় লাগে। তাই আকাশপথে সেখানে যাওয়া সুবিধাজনক এবং তাতে খরচও কম হয়।'

ছোট্ট ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টটা শহরের বাইরে। আধঘণ্টার মতো সময় লাগল সুদীপ্তদের সেখানে পৌঁছোতে। ছোট্ট লাউঞ্জে পাইলট অপেক্ষা করছিলেন তাদের জন্য। লোকটা রবার্টের পূর্ব পরিচিত। তার সঙ্গে মালপত্র-লটবহর নিয়ে টারম্যাকে প্রবেশ করল সুদীপ্তরা। একপাশে ছোট ছোট প্লেন সার বেঁধে আকাশের দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সির মতো। এয়ারট্যাক্সি। ফোর সিটার, টু-সিটার প্লেন সব। তারই মধ্যে একটা ফোর সিটার ফকার প্লেনে সুদীপ্তরা মালপত্র নিয়ে উঠে বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলরুম থেকে সংকেত মিলল আকাশে ওঠার জন্য। সুদীপ্তদের নিয়ে ছোট্ট ফকার প্লেনটা মাটি ছাড়ল অজানার উদ্দেশে পাড়ি দেবার জন্য।

খুব নীচ দিয়ে উড়ে চলেছে প্লেন। নীচের সব কিছুই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। শহর ছাড়িয়ে জঙ্গল। মাঝে মাঝে জঙ্গলঘেরা ছোট শহর বা গ্রাম। কখনও বা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে বয়ে চলেছে নদীখাত। একটা বড় শহর 'আন্তসিরাবে' পেরোল তারা। তারপর চোখে পড়ল বিরাট একটা নদী। রবার্ট বলল, 'এই নদীর নাম "ম্যানিয়া", এটা

অতিক্রম করে জঙ্গলপ্রদেশে প্রবেশ করব। আমরা এগোচ্ছি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। সামনে পাহাড়ও আছে।'

সত্যিই, ম্যানিয়া নদী অতিক্রম করার পরই জঙ্গলের মধ্যে ছোট জনপদগুলো যেন ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল। পায়ের নীচে শুধু ঘন জঙ্গল আর জঙ্গল। ওপর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তার মধ্যে কোনও কোনও জায়গাতে দিনেরবেলাতেও সূর্যালোক প্রবেশ করে না। সময় এগিয়ে চলল সুদীপ্তদের সঙ্গে সঙ্গে। নীচের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে হেরম্যান বললেন, 'এইসব জঙ্গলের মধ্যে হয়তো এখনও অনেক এমন উদ্ভিদ বা প্রাণী লুকিয়ে আছে যাদের সন্ধান বাইরের পৃথিবী জানে না।'

রবার্ট বলল, 'ঠিক তাই। এখনও তো জীববিজ্ঞানীরা সমুদ্রর তলদেশ বা গভীর জঙ্গল থেকে কত নতুন নতুন প্রজাতির প্রাণী আবিষ্কার করে চলেছেন। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করছেন কত নতুন প্রজাতির উদ্ভিদ।'

হেরম্যান বললেন, ''হ্যাঁ। পঞ্চাশ ফুট লম্বা ফিতার মতো সরু সামুদ্রিক সার্পেন্টাইল স্নেক' তো বিজ্ঞানীরা এই সেদিন খুঁজে পেলেন। খুঁজে পাওয়া গেছে 'ওয়াকিং ক্যাটফিস'। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে নতুন প্রজাতির 'বাজার', কঙ্গোর পাহাড়ি অঞ্চলে নতুন ধরনের 'গোরিলা'।''

সুদীপ্তদের প্লেন এরপর প্রবেশ করল পাহাড়ের গোলোকধাঁধায়। এত নীচ দিয়ে এশৃঙ্গ-ওশৃঙ্গর ফাঁক গলে প্লেন বাঁক নিয়ে উড়ছে যে সুদীপ্তর মনে হতে লাগল, এই বুঝি কোথাও ধাক্কা খেল তাদের ছোট্ট প্লেনটা। পাহাড়ের ঢালগুলোও গভীর জঙ্গলে আচ্ছাদিত, ঘন কুয়াশার চাদরে মোড়া। রবার্ট জানাল, এ দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হল 'মাউন্ট সারতানানা।' সেটা দেশের উত্তরে অবস্থিত। বেশ অনেকটা সময় লাগল পাহাড়ের সেই গোলোকধাঁধা পেরোতে। তারপর আবার সমতলভূমির বিস্তীর্ণ জঙ্গল। এক সময় তারা পৌঁছে গেল ম্যাঙ্গকি নদীর ওপর। বিশাল নদী। ওপর থেকে তাকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা অ্যানাকোন্ডা সাপ!

রবার্ট বলল, 'এ নদীতে প্রচুর কুমির আছে। মকোডো উপজাতিরা কুমির শিকার করে। ওটা ওদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য।'

বিকাল হয়ে এসেছে। ম্যাঙ্গকি নদীর গতিপথের মাথার ওপর দিয়ে

এগোতে লাগল তারা। নদীর দু-পাশে জঙ্গল। মাঝে মাঝে তার মধ্যে জলাভূমি দেখা যাচ্ছে। রবার্ট বলল, 'আমরা প্রায় এসে গেছি। তবে আমাদের এই প্লেন দেখে মকোডোরা আগাম জেনে যাবে যে বাইরের লোক প্রবেশ করছে তাদের এলাকায়।'

রবার্টের কথা শেষ হবার মিনিট দশেকের মধ্যেই নদীর ডানপাশে একটা ফাঁকা জায়গা জঙ্গলের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হল। সেদিকে নামতে শুরু করল প্লেন।

জঙ্গলঘেরা ছোট্ট রানওয়ে। একটা মাত্র কাঠের বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। সুদীপ্তদের প্লেন ল্যান্ড করল সেখানে। বেসরকারি এয়ারপোর্ট। কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র তিনজন। রবার্ট জানাল, 'জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট যুদ্ধবিমান নামার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সেনারা নাকি এসব এয়ারপোর্ট বানিয়েছিল।'

সিকিউরিটি চেকিং ইত্যাদির কোনও বালাই নেই এই এয়ারপোর্টে। সুদীপ্তরা প্লেন থেকে নামার পর এয়ারপোর্টের একজন কর্মচারী এসে নিতান্ত দায়সারাভাবে শুধু জানতে চাইল যে, তারা কী কারণে এসেছে এ জায়গাতে। হেরম্যান জানালেন যে, এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য দেখা হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। লোকটা এরপর একটা কাগজে সুদীপ্তদের নাম লিখে নিয়ে নিজের কেঠো অপিসের ভিতর চলে গেল। আর এরপরই আবার গিরগিটিদের একটা বড় ঝাঁক দ্বিতীয়বারের জন্য নজরে এল। রানওয়ের একপাশের জঙ্গল থেকে একটা সবুজ গালিচা যেন বেরিয়ে এসে রানওয়ে অতিক্রম করে অন্যপাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল। সবুজ রঙের গিরগিটি। অথবা তারা জঙ্গলের ভিতর ছিল বলে সবুজ রং ধারণ করেছে। রবার্টের পিছন পিছন মালপত্র নিয়ে রানওয়ে ধরে বাইরে যাবার জন্য এগোতেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল, উলটোদিক থেকে একজন হেঁটে আসছে তাদের দিকে। ছিপছিপে চেহারার কোঁকড়া চুলঅলা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একজন যুবক। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পরনে থ্রি-কোয়ার্টার একটা খাকি প্যান্ট। হাতে ধরা জ্যাভলিনের মতো দেখতে ধাতব ফলাঅলা একটা লাঠি বা বল্লম। তাকে দেখে রবার্ট বলল, 'ওই হল ইদ্‌জেল। আমাদের পথপ্রদর্শক ও মালবাহকের কাজ করবে। আজকের রাতটা ওর গ্রামে ওর আতিথ্যেই

কাটাব আমরা।'

ইদ্‌জেল সুদীপ্তদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রবার্টের উদ্দেশে হেসে বলল, 'নদীতে মাছ ধরছিলাম। আকাশে শব্দ পেয়েই বুঝলাম আপনারা আসছেন।'

রবার্ট তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল হেরম্যান আর সুদীপ্তর। ইদ্‌জেল মাথা ঝুঁকিয়ে অভ্যর্থনা জানাল তাদের। তারপর তাদের কাছ থেকে সবচেয়ে বড় ব্যাগ দুটো নিজের কাছে নিয়ে নিল। সে পিছন ফিরে হাঁটা শুরু করতেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল তার প্যান্টের পিছনে হুক ধরে ঝুলছে একটা অদ্ভুত সুন্দর সবুজ রঙের গিরগিটি। তার লেজটা ঠিক শামুকের মতো বা চরকিবাজির মতো প্যাঁচানো গোলাকার। ড্যাবড্যাবে গোল চোখে সে চারদিকে দেখছে। ক্যামেলিয়ন। এই সরীসৃপের ছবি সুদীপ্ত আগে বইতে, টিভির পর্দায় দেখেছে। মুখের ভেতর গোটানো নিজের দেহের থেকেও লম্বা আঠালো জিভ, এই সরীসৃপ শ্রেণির প্রাণীরা দূরের পোকামাকড় ধরে খায়। রবার্ট বলল, 'এই ক্যামিলিয়নটা ইদ্‌জেলের পোষা। ওর নাম 'ডুবি ডুবি।'

এয়ারপোর্ট ছেড়ে জঙ্গলের পায়ে-চলা পথ ধরল সবাই। কিছুটা এগোবার পর ইদ্‌জেলের গ্রাম। বড় বড় গাছের নীচে গোটা কুড়ি কাঠের ঘর। মাথায় পাতার ছাউনি। গ্রামের অধিবাসীরা সভ্য। কাঠের তৈরি একটা চার্চও আছে গ্রামে। সুদীপ্তদের দেখে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে এল। রবার্ট তৈরি হয়েই এসেছিল। সে তাদের হাতে একটা লজেন্সের প্যাকেট তুলে দিতেই খুব খুশি হল তারা। ইদ্‌জেল বলল, 'আমাদের গ্রামের জনসংখ্যা একশ। আর অনেকেরই অক্ষরজ্ঞান আছে। এদিকে এটাই কিন্তু শেষ সভ্য গ্রাম। কাছাকাছি শহর বলতে একশো মাইল দূরের শহর ফিরানারাস্তসোয়া।'

হেরম্যান জানতে চাইলেন, তোমাদের দিন চলে কীভাবে?'

ইদ্‌জেল বলল, 'গাছের ফলমূল আর নদীর মাছ ধরে দিব্যি চলে যায়। মাঝে মাঝে সরকার থেকে চাল-গম পাঠানো হয়। কিছু সংস্থা জামা-কাপড়-ওষুধপত্র দিয়ে যায়, তাছাড়া আমরা শূকর-ভেড়াও পালন করি।'

গ্রামের লোকরা সবাই সুদীপ্তদের দেখে মৃদু বিস্মিত হলেও খুব বেশি উৎসাহ দেখাল না তাদের নিয়ে। ইদ্‌জেল তাদের নিয়ে তুলল একটা

কাঠের ঘরে। বনভূমির মাথায় ধীরে ধীরে সূর্য ডুবছে। রংবেরঙের নানা পাখির ঝাঁক ডাকতে ডাকতে উড়ে যাচ্ছে গ্রামের ওপর দিয়ে। দু-চারজন লোক গ্রামে ফিরছে। হাতে তাদের মাছ ধরার কোঁচ। কোমর থেকে ঝুলছে দড়িতে গাঁথা মাছ। ইদ্‌জেল সুদীপ্তদের ঘরে ঢুকিয়ে 'পরে আসছি' বলে অন্যদিকে চলে গেল। এরপরই একদল ছোট ছোট ছেলে এসে হাজির হল সুদীপ্তদের ঘরের সামনে। তাদের একজনের হাতে একটা গাঁটঅলা লম্বা লাঠি। আর সেই লাঠির মাথায় গাঁট আঁকড়ে বসে আছে অদ্ভুত একটা প্রাণী। ছোট প্রাণীটা অদ্ভুত দেখতে। দেহের গঠন কিছুটা শ্লথের মতো দেখতে হলেও কালো-সাদা ডোরাকাটা প্রাণীর লেজটা বেশ লম্বা। সামনের পা দুটো পিছনের পায়ের তুলনায় লম্বা। পা না বলে অবশ্য তাকে হাত বলাই ভালো। লম্বা লম্বা আঙুল আছে হাতে। সেই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আছে লাঠির গাঁট। গলায় একটা দড়ি বাঁধা প্রাণীটার। সেটা অন্য একটা ছেলের হাতে ধরা।

রবার্ট বলল, 'এটা একটা লেমুর, প্রায় একশো প্রজাতির লেমুর পাওয়া যায় এ দেশে। এটা তারই কোনও একটা ছোট প্রজাতি হবে।'

বাচ্চা ছেলেগুলো এরপর ইনিয়ে-বিনিয়ে কী যেন বলল সুদীপ্তদের উদ্দেশে। ছবির বইয়ের বাইরে এই প্রথম লেমুর দেখল সুদীপ্ত। আগে এদেশে আসার সুবাদে এবং ইদ্‌জেলের সাহচর্যে এদের ভাষাটা মোটামুটি বোঝে রবার্ট। ছেলেগুলোর কথা শোনার পর রবার্ট হেসে বলল, 'আমাদের দেখে ওদের ধারণা হয়েছে যে আমরা চিড়িয়াখানার লোক এবং আমরা এখানে লেমুর ধরতে এসেছি। কারণ, এর আগে বেশ ক'বার চিড়িয়াখানার লোকরা লেমুর ধরতে এসেছে এখানে। আমাদের মতো তারাও প্লেনে করে আসে। বাচ্চাগুলো কদিন আগে এই লেমুরটাকে জঙ্গল থেকে ধরেছে। ওরা আমাদের কাছে প্রাণীটাকে বিক্রি করতে এসেছে। খুব সস্তায় দিয়ে দেবে বলছে। তোমরা কেউ কিনবে নাকি?' রবার্ট মজা করেই প্রশ্নটা করল।

সুদীপ্ত আর হেরম্যানও হাসল প্রশ্নটা শুনে।

লেমুর খুব সুন্দর প্রাণী হলেও সেটা যে তাদের কেউ কিনতে আগ্রহী নয় তা রবার্ট ছেলেগুলোকে জানিয়ে দেবার পর তারা একটু বিমর্ষভাবে

ফিরে গেল। রবার্ট বলল, 'প্রাণীটার বিনিময়ে মাত্র পাঁচ ডলার চাচ্ছিল ওরা মার্কিন টাকার হিসাবে। অথচ, আমেরিকা বা ইউরোপের বাজারে এই দুষ্প্রাপ্য প্রাণীটার মূল্য হয়তো কয়েক লক্ষ ডলার বা পাউন্ড। কারণ, তোমরা জানো যে এ প্রাণী এই মাদাগাস্কার ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা নামল। আঁধার ঘনিয়ে এল চারপাশে। সঙ্গে আনা একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বালানো হল ঘরে। ইদ্‌জেল আবার এসে হাজির হল। তার সঙ্গে পরের দিনের যাত্রাসূচি ও কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনায় বসল সবাই।'

রবার্ট প্রথমে হাতে আঁকা একটা ম্যাপ বার করে তাদের যাত্রাপথ বুঝিয়ে দিল সুদীপ্তদের। ম্যাঙ্গকি নদীর পাড় বরাবর সোজা পশ্চিমে এগোতে হবে তাদের। তারপর মকোডো গ্রাম। জায়গাটাতে প্রচুর জলা আছে। ইদ্‌জেল রবার্টকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি এবারও গতবারের মতো গাছ খুঁজতে এসেছেন? কিন্তু মকোডো গ্রামে গিয়ে আপনার কী হবে?'

একটু চুপ করে রবার্ট জাবাব দিল, 'হ্যাঁ, গাছ খুঁজতে এসেছি। তবে এক বিশেষ ধরনের গাছ। তুমি নিশ্চয়ই ওই অঞ্চলের মানুষখেকো গাছের কথা শুনেছ? আমরা তার সন্ধানেই এসেছি।'

রবার্টের কথা শুনে ইদ্‌জেল মৃদু চম্‌কে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, সে গাছ আমি না দেখলেও তার গল্প শুনে আসছি ছোটবেলা থেকে। আর এ-ও জানি মকোডোরা নাকি সে গাছের সন্ধান জানে, কিন্তু বাইরের লোককে তার সন্ধান দেয় না। আমাদের তারা কেন বলবে সে খবর?'

রবার্ট জবাব দিল, 'যদি কৌশলে তাদের কাছ থেকে কোনও খবর সংগ্রহ করা যায়? তোমার নিশ্চয়ই গতবারের অভিজ্ঞতার কথা খেয়াল আছে? গ্রামের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলে ওরা টবু নামের সেই মেয়েটাকে নিয়ে গেছিল। সে আর ফিরে আসেনি গ্রামে। আমার ধারণা ওদিকেই কোথাও আছে সেই রাক্ষুসে গাছ। ওই গাছের খোঁজে যেতে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো?'

ইদ্‌জেল জবাব দিল, 'আপনাদের সঙ্গে যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই। ব্যাপারটা আমার মনে আছে। মেয়েটা ফিরে না আসায় অমনই কিছু ঘটেছে বলে আমি অনুমান করেছিলাম। কারণ, মানুষখেকো গাছের সঙ্গে মকোডোদের সম্পর্কের গল্প আমার অজানা নয়। পাছে আপনি ভয় পান তাই ব্যাপারটা আপনাকে বলিনি। কিন্তু সেবার না-হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে মকোডোরা আপনাকে তাদের গ্রামে থাকতে দিয়েছিল। কিন্তু এবার যদি না দেয়? মকোডো জাদুকরকে দেখলেই বোঝা যায় লোকটা বেশ চালাক।'

রবার্ট জবাব দিল, 'দরকার হলে আবার আমাদের কাউকে অসুস্থতার ভান করতে হবে, বা অন্য কিছু ফন্দি আঁটতে হবে সেখানে থাকার জন্য।'

হেরম্যান জানতে চাইলেন, ঠিক কত সময় লাগবে সেখানে পৌঁছোতে?'

ইদ্‌জেল জবাব দিল, 'কাল ভোরে রওনা দিলে আশা করি বিকাল নাগাদ মকোডোদের গ্রামে পৌঁছে যাব। যদি না দাবানল বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।'

'দাবানল?' প্রশ্ন করলেন হেরম্যান।

হ্যাঁ, বনে প্রতিবছর এ সময় আগুন লাগে। এবারও লেগেছে। মাইলের পর মাইল ধরে পিছনের সব কিছুকে পুড়িয়ে এগিয়ে যায় সেই আগুনের প্রাচীর। তারপর আবার অদ্ভুতভাবে কয়েকশো মাইল পরিধি অতিক্রম করে তার উৎপত্তিস্থলে ফিরে আসে। একবার আমি এক ট্যুরিস্ট দলের সঙ্গে প্লেনে চেপে আকাশের অনেক ওপর থেকে দেখেছিলাম সেই দৃশ্য। কেউ যেন সবুজ বনের মধ্যে বিরাট একটা কালো বৃত্ত এঁকে রেখেছে।'

ইদ্‌জেল এরপর জানতে চাইল, 'আপনাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'দুটো বড় ধারালো ছুরি আছে। অস্ত্র বলতে ব্যস এইটুকুই।'

ইদ্‌জেল বলল, যদিও জলার কুমির আর অজগর ছাড়া হিংস্র শ্বাপদ ও-বনে নেই, আর তেমন হিংস্র উপজাতিও নেই, তবু একটা আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে নেওয়া ভালো। আমার কাছে একটা গাদা বন্দুক আছে, সেটা সঙ্গে নেব।'

আরও বেশ কিছু খুঁটিনাটি আলোচনার পর ঘরে ছেড়ে বেরিয়ে গেল ইদ্‌জেল। সুদীপ্তরাও এরপর বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

৪

পরদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা শুরু হল। গ্রাম ছেড়ে বনে প্রবেশ করল সুদীপ্তরা। ধীরে ধীরে দিনের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ছে অরণ্যে। গাছের মাথায় পাখিদের কল-কাকলি শুরু হয়েছে। ভারী সুন্দর পরিবেশ চারপাশে। কিছুটা এগোবার পরই ইদ্‌জেল পথের পাশে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির মাথার দিকে সুদীপ্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল। সেখানে একটা মোটা ডাল আঁকড়ে বসে আছে বেশ বড় একটা লেমুর। সোনালি দেহ। গাছের পাতার আড়াল বেয়ে আসা সূর্যের আলোতে তার মোটা লেজটা ঝলমল করছে। গাছের ওপর থেকে ড্যাবড্যাবে চোখে প্রাণীটা দেখছে সুদীপ্তদের। ইদ্‌জেল বলল, 'এটা হল গোল্ডেন লেমুর। আরও অনেক ধরনের ছোট-বড় নানা ধরনের লেমুর দেখবেন আপনারা।'

ম্যাঙ্গকি নদীকে ডানহাতে রেখে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে ইদ্‌জেলকে অনুসরণ করে বনের গভীর থেকে গভীরতর অংশে প্রবেশ করতে লাগল তারা। আর তার সঙ্গেই ইদ্‌জেলের কথামতোই তাদের চোখে পড়তে লাগল নানা ধরনের সব লেমুর। বিশাল বিশাল সব গাছের মাথা থেকে মোটা অজগর সাপের মতো সব মোটা মোটা লম্বা লতা নেমে এসেছে মাটির দিকে। সেইসব গাছের ডালে বা লতা আঁকড়ে বসে আছে প্রাণীগুলো। ইদ্‌জেল সুদীপ্তদের চিনিয়ে দিতে লাগল তাদের। কোনটা 'রিংটেল লেমুর', কোনটা 'লেপি লেমুর', কোনটা ডোয়ার্ফ লেমুর ইত্যাদি। কুকুর-বিড়াল-কাঠবিড়ালি এই তিন প্রাণীর সঙ্গে কিছু কিছু সাদৃশ্যযুক্ত অদ্ভুত প্রাণীটার সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়ে যেতে লাগল ইদ্‌জেল। রবার্ট চাপা স্বরে সুদীপ্তকে স্মরণ করিয়ে দিল—'ইদজেল কিন্তু কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেনি।'

সুদীপ্ত হাসল সেকথা শুনে। তারপর ইদজেলকেই প্রশ্ন করল, "আচ্ছা

'লেমুর' শব্দের কোনও অর্থ আছে?"

ইদ্‌জেল হেসে জবাব দিল, "হ্যাঁ, আছে। 'লেমুর' শব্দের অর্থ 'ভূত' বা 'প্রেতাত্মা'। এর একটা কারণ আছে। 'পয়সন আইভি' বলে এ জঙ্গলে এক বিষাক্ত লতা আছে। যার সামান্য অংশ কোনও প্রাণীর পেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। মকোডোসহ বেশ কিছু অরণ্যবাসী তাদের তিরের ফলায় এই লতার রস মাখায়। লেমুরই একমাত্র প্রাণী যারা এই লতা পরমানন্দে খায় অথচ তাদের কিছু হয় না। এ জন্য তাদেরকে প্রেতাত্মা ভাবা হয়। ডাকা হয় 'প্রেতাত্মা' বা 'ভূত' নামে।"

সুদীপ্তরা বেশ আশ্চর্য হল এই চমকপ্রদ তথ্য শুনে।

সময় এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল আরও ঘন হতে লাগল। ঝোপঝাড়ও বাড়তে লাগল। বিরাট বিরাট মানুষ সমান সব ঝোপ। তার ভিতর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ইদ্‌জেল জানিয়েছিল, এইসব ঝোপ হল সাপেদের আস্তানা। বেশ সাবধানে চলতে লাগল সবাই। এক সময়ে জঙ্গলের এক অংশে সুদীপ্তরা দেখতে পেল হাত-কুড়ি চওড়া একটা কালো অংশ চলে গেছে সামনের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালা ঝোপঝাড় সব পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে। নেড়া গাছের ফাঁক গলে সেখানে সূর্যালোক এসে পড়েছে পুড়ে যাওয়া কালো মাটিতে। হঠাৎ তাকালে মনে হবে যে একটা কালো পিচরাস্তা যেন চলে গেছে বনের গভীরে।

ইদ্‌জেল বলল, 'আপনাদের বলেছিলাম দাবানলের কথা। ওই দেখুন তার চিহ্ন। এখান থেকেই যাত্রা শুরু করেছিল সে। আবার এখানেই ফিরে আসবে।'

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'আগুন আবার এখানে ফিরতে কতদিন সময় লাগবে?'

ইদ্‌জেল জবাব দিল, 'সেটা নির্ভর করে বাতাসের ওপর, যতটা পথ সে এগোল তার ওপর। সাধারণত পথে কোনও জলা পড়লে অথবা কোনও ফাঁকা জমি পড়লে সে দিক পরিবর্তন করে চক্রাকারে পিছনে ফিরতে থাকে। তবে ওর যাত্রাপথ দেখে মনে হচ্ছে যে আমরা যে অঞ্চলে যাচ্ছি, বৃত্তাকারে সেদিকেই যাবে ও। তারপর ওই অঞ্চলটাকে ছেদ করে এদিকে ফিরবে।'

রবার্ট এবার প্রশ্ন করল, 'মকোডোদের গ্রামটা আবার দাবানল গ্রাস করবে না তো?'

ইদ্‌জেল তার কাঁধ থেকে পোষা গিরগিটিটাকে তার হাতের মধ্যে নিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'না, তা হবে না। কারণ, তাদের গ্রামটা বসানো হয়েছে গাছপালা কেটে একটা ফাঁকা জমির মধ্যে। এই দাবানালের জন্যই গাছ কেটে ফাঁকা জমিতে গ্রাম বসানো হয়।'

ইদ্‌জেলের থমকে দাঁড়িয়ে তার গিরগিটিটাকে হাতে নেবার কারণ বুঝতে পারল সুদীপ্তরা। তারা দেখতে পেল তাদের যাত্রাপথের একপাশের ঝোপের আড়াল থেকে একটা বড় গিরিগিটির পাল বেরিয়ে দ্রুত ঢুকে যাচ্ছে অন্যপাশের ঝোপে। যেন তারা ভয়ে পালাচ্ছে। সুদীপ্তদের অনুমানই ঠিক হল। সেই গিরগিটির ঝাঁকের পিছু-পিছু বেরিয়ে এল প্রায় গোসাপের মতো একটা কালো কুচকুচে প্রাণী। গিরগিটির দলকে তাড়িয়ে নিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্যপাশের ঝোপে।

সুদীপ্ত জানতে চাইল, ওটা কি সরীসৃপ?'

ইদ্‌জেল উত্তর দিল, 'ওটা "ব্ল্যাক ডেমন ক্যামেলিয়ন"। গিরগিটিখেকো দানব গিরগিটি। ওরা কোনও প্রাণীর চোখ লক্ষ্য করে থুথু ছুড়তে পারে। চোখ অন্ধ হয়ে যায় তাতে।'

রবার্ট হেসে সুদীপ্তকে বলল, 'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে অমন একটা পোষা গিরিগিটি দেখতে পাবে তুমি। খুব কুৎসিত দেখতে প্রাণীটা।'
চলতে চলতে ঘণ্টা পাঁচেক সময় অতিক্রান্ত হল এক সময়। সুদীপ্তরা এখন যে জায়গায় উপস্থিত হল সেখানে জঙ্গল একটু হালকা হয়ে এসেছে। তার পরিবর্তে গাছের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে ছোট-বড় জলা জমি। সূর্যকিরণে সেগুলো চিক্‌চিক্ করছে। জঙ্গলের প্রান্তসীমায় জলা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে এসে সুদীপ্তরা বিশ্রামের জন্য থামল। খাবারও খেয়ে নিতে হবে এখানে। বেশ কিছু ছোট-বড় গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে সে জায়গাতে। সম্ভবত জলা জায়গাকে গ্রাম করার কারণে শিকড়সমেত উপড়ে গেছে গাছগুলো। তারপর ডালপালাগুলো পচে-খসে গিয়ে গুঁড়িগুলোই শুধু টিকে আছে মাটির ওপর। কাছাকাছি বেশ কয়েকটা

গুঁড়ি মাটির ওপর পড়ে ছিল। তাদের ওপর সুদীপ্তরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসল। সঙ্গে আনা শুকনো খাবার ভাগ করে খেতে শুরু করল তারা। ইদ্‌জেল বলল, 'আমাদের যাত্রাপথে এই জলাগুলোই বিপজ্জনক। জলাতে কুমির আছে, বিষধর সাপ আছে, পাইথন আছে। এই জলা অঞ্চল প্রায় পাঁচ মাইল দীর্ঘ। আসলে ওই নীচু জমিতে বর্ষা আর ম্যাঙ্গকি নদীর জল বর্ষার সময় প্লাবিত হয়ে জলার সৃষ্টি করেছে। এই জলা অতিক্রম করেই মকোড়োদের রাজ্যে প্রবেশ করব আমরা।'

রর্বাট বলল, 'হ্যাঁ, ইদ্‌জেল ঠিকই বলছে। গতবার জলা পেরোবার সময় একটা কুমির এগিয়ে এসেছিল আমার দিকে।'

রবার্টের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুদীপ্তর মনে হল সে যে গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে, সেটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুদীপ্তর উলটোদিকে একটা শোয়ানো গুঁড়ির ওপর বসে থাকা হেরম্যান আর রবার্ট একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'সুদীপ্ত, সাপ! সাপ!'

সঙ্গে সঙ্গে ইদ্‌জেলও কাঁধ থেকে বন্দুক খুলে নিয়ে তাগ করল সুদীপ্ত যে গুঁড়িতে বসে আছে তার একদিকে। হেরম্যান আর রবার্ট চিৎকার করা মাত্রই সুদীপ্ত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গুঁড়ি ছেড়ে। আর তারপরই সে দেখতে পেল তাকে। গুঁড়িটা কুড়ি ফুট মতো লম্বা হবে। জলে পচে তার ভিতরের অংশটা ফাঁপা হয়ে গেছে। আর সেই ফাঁপা গুঁড়ির এক প্রান্তে তার ভিতর থেকে সর-সর করে বাইরে বেরিয়ে আসছে একটা অজগর সাপ।

তবে সাপটা কিন্তু কাউকে আক্রমণ করল না। হলুদ-কালো ছোপঅলা প্রায় পনেরো ফুট লম্বা তার বিশাল দেহটা নিয়ে কিছুটা ভীত সন্ত্রস্তভাবেই রওনা হয়ে গেল জলার দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণীটা অদৃশ্য হল চোখের আড়ালে।

ইদ্‌জেল বলল, 'আমারই আপনাদের সাবধান করা উচিত ছিল। মাটিতে শুয়ে থাকা এই ফাঁপা গাছের গুঁড়িগুলো অজগরদের প্রিয় বাসস্থান। জলা ছেড়ে উঠে এসে এই গুঁড়িগুলোর মধ্যে ওরা আশ্রয় নেয়। শীতকালে শীতঘুমও কাটায় এর মধ্যে। তবে খিদে আর ভয় না পেলে

সাধারণত মানুষকে এরা আক্রমণ করে না। এদের সাধারণ খাদ্য হল লেমুর।'

সে জায়গাতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর সুদীপ্তরা এগোল জলার দিকে।

চারপাশে শুধু জলা জমি। তার মধ্যে দিয়ে ঝোপঝাড়-পূর্ণ ধানখেতের আলের মতো সংকীর্ণ পথ। পাশাপাশি দু-জন হাঁটা যায় না সে পথে। জলা জমির মাঝখানে কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে পাতাবিহীন বড় বড় গাছ। যেন তারা এই মাইলের পর মাইল বিস্তৃত জলাভূমিকে পাহারা দিচ্ছে প্রাচীন প্রেতাত্মাদের মতো। শুকনো গাছের ডালে পালকহীন লম্বা গলাঅলা শকুনের মতো পাখি বসে আছে কোথাও কোথাও। ওই পাখিগুলোর স্থানীয় নাম নাকি 'গোকো'। মাংসাশী পাখি। জলার মাছ আর সাপ নাকি ওই পাখিগুলোর খাদ্য!— এ ব্যাপারটা ইদ্‌জেল সুদীপ্তদের জানাল।

চারদিকে স্যাঁতসেঁতে ভেজা পরিবেশ। উঁচু জমি ছেড়ে, মাঝে মাঝে জলেও নামতে হচ্ছে। প্রায় কোমর পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে জলে, গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে কাদায়। তার ওপর কোথাও কোথাও পচা জলের আঁশটে গন্ধ। সুদীপ্তরা অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েছে। কিন্তু এমন নোংরা-পূতিগন্ধময় জায়গা পেরোতে হয়নি কখনও। চলতে চলতে সুদীপ্তরা দেখতে পেল জলার মাঝে একটা ছোট দ্বীপের মতো জায়গাতে একটা গাছ থেকে অসংখ্য সাপ ঝুলছে। ঠিক যেন কেউ অসংখ্য দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছে গাছ থেকে। রবার্টের মাত্র কয়েক হাত তফাত দিয়ে একবার একটা সাপ ভেসে গেল। কখনও জলে নেমে কখনও একটু ডাঙা জমিতে উঠে ইদ্‌জেলকে অনুসরণ করে সুদীপ্তরা এগিয়ে চলল। একবার বেশ দীর্ঘ, লম্বা একটা উঁচু জমিতে উঠে এল তারা। সে জমিটা একটা বড় জলাকে লম্বালম্বিভাবে চিরেছে। সবুজ পানায় ঢাকা জল, পথের পাশে নলখাগড়ার মতো জলজ উদ্ভিদের ঝোপ। একজনের পিছনে একজন এভাবে এগোচ্ছিল তারা। প্রথমে ইদ্‌জেল, তারপর...সবশেষে রবার্ট। চলতে চলতে হঠাৎ ইদ্‌জেল থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত তুলে সবাইকে থেমে

যেতে ইঙ্গিত করল।

সুদীপ্তরা সামনে তাকিয়ে দেখল কিছুটা দূরে রাস্তার ওপর তাদের পথ আগলে শুয়ে আছে বিশাল আকারের একটা কুমির। জলা ছেড়ে উঠে এসে রোদ পোহাচ্ছে প্রাণীটা। দূর থেকে তার হাঁ-করা বিরাট লাল মুখগহ্বর, আর চোয়ালে সারসার দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে। রাস্তা থেকে তাকে সরাবার জন্য ইদ্‌জেল মাটি থেকে একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে সেটা ছুড়ে মারল তার দিকে। ঢেলাটা গিয়ে পড়ল প্রাণীটার পিঠের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটা মৃদু লাফিয়ে উঠে লাফ দিল জলে। ইদ্‌জেল কাঁধ থেকে তার বন্দুকটা খুলে নিয়ে বলল, 'এ পথটা সাবধানে চলতে হবে। জলায় কুমির আছে দেখছি।'

পথের দু-পাশে জলার দিকে চোখ রেখে চলতে লাগল সবাই। এ জলাটা প্রায় আধমাইল লম্বা। তারা তখন দু-পাশের জলা প্রায় অতিক্রম করে ফেলেছে ঠিক সেই সময় একটা দমবন্ধ-করা-ঘটনা ঘটল। রবার্ট সবার শেষে চলছিল। হঠাৎ প্রথমে সে আর তারপর অন্যরা পিছনে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল, তাদের ফেলে আসা পথ ধরে বুকে হেঁটে খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে একটা কুমির। ইদ্‌জেল তার বন্দুক তুলল ঠিকই, কিন্তু সে বুঝতে পারল গুলি চালালে সেটা রবার্টের গায়েও লেগে যেতে পারে। জলার মধ্যে শিরদাঁড়ার মতো জেগে থাকা একফালি জায়গাতে হাত পাঁচেকের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। কুমিরটা এগিয়ে এসে প্রথমে রবার্টকে পাবে এবং তাকেই ধরবে! রবার্ট যদি জলে ঝাঁপ দেয় প্রাণ বাঁচাতে তবে আরও সুবিধা হবে কুমিরটার। তাছাড়া জলে নিশ্চয়ই আরও কুমির আছে। মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে রবার্টের দেহ! কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে প্রমাদ গুনতে লাগল সবাই। রবার্ট যেন পাথরের মূর্তি বনে গেছে। সে তাকিয়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে থাকা মৃত্যুর দিকে। কুমিরটা যখন রবার্টের হাত কুড়ি কাছে চলে এসেছে তখন বাঁচাবার জন্য একটা শেষ চেষ্টার ঝুঁকি নিল সুদীপ্ত। পিছন ফিরে ইদ্‌জেলের হাত থেকে বন্দুকটা টেনে নিয়ে জলায় ঝাপ দিল। যাতে কোণাকুণিভাবে গুলি চালানো যায়

কুমিরটাকে। আর ঠিক সেই সময় রবার্টের হাতেও ভোজবাজির মতো যেন উঠে এল একটা রিভলভার। কুমিরটা তার আরও কিছুটা কাছে আসতেই সে তার হাঁ-করা মুখ লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিল। গুলি চালাল সুদীপ্তও। উপর্যুপরি রিভলভার আর বন্দুকের গর্জনে কেঁপে উঠল জলাভূমি। কয়েকটা গোকো পাখি ভয় পেয়ে কর্কশ ডাক ছেড়ে পাক খেতে শুরু করল আকাশে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে জলাভূমির আকাশে-বাতাসে অনুরণিত হতে থাকল সেই শব্দ। কুমিরটা গুলি খেয়ে উলটে গিয়েছিল। তার দেহের একটা অংশ রাস্তার ওপর আর পিছনের অংশটা জলার মধ্যে। সেদিকে তাকিয়েছিল সুদীপ্ত। হঠাৎ ইদ্‌জেল বলল, 'আরে শিগগির ওপরে ওঠো।'—এই বলে সে তাড়াতাড়ি হাত ধরে সুদীপ্তকে ওপরে তুলে সে জলার যেখানে নেমেছিল তার কিছুটা তফাতে আঙুল তুলে সুদীপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হাত কুড়ি তফাতে জলার মধ্যে পানার আস্তরণ এক জায়গাতে একটু সরে গেছে। আর সেখান থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা কুৎসিত নাক আর একজোড়া ড্যাবড্যাবে চোখ! আরও একটা কুমির। ইদ্‌জেল তাকে না দেখলে সুদীপ্ত হয়তো তার খাদ্য হয়ে যেত। আবার হাঁটতে শুরু করল তারা। চলতে চলতে ইদ্‌জেল বলল, 'আমার ধারণা, যে কুমিরটাকে মারা হল সেটাই আমাদের পথ আগলে শুয়েছিল। কী ধূর্ত প্রাণী! শিকার ধরার জন্য ও এতটা পথ আমাদের অনুসরণ করে এসেছে!'

হেরম্যান রবার্টকে জিগ্যেস করল, 'তোমার কাছে যে রিভলভার আছে তা বলোনি তো? তাছাড়া গুলিও চালালে বেশ দক্ষভাবে।'

রবার্ট বলল, 'আসলে আমি এটা বেআইনিভাবে সংগ্রহ করেছি হোটেলের একজনের কাছ থেকে। ভেবেছিলাম এটা প্রয়োজন ছাড়া বার করব না। ফেরার পথে জিনিসটা জলায় ফেলে যাব। তা হাতের টিপ আমার ভালোই। কিশোর বয়সে একবার শখ চেপেছিল মেরিন কমান্ডো হবার। ওদের ওখানে এক বছর ভলেন্টিয়ার হিসাবে ট্রেনিংও নিয়েছি। আমি মোটামুটি সব ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে পারি।'

কুমির-জলা অতিক্রম করে একটা নতুন জলায় পড়ল সুদীপ্তরা। তারপর আবারও একটা জলা। দুর্গন্ধ আর পোকা ভনভন করছে সেখানে।

সুদীপ্তর এক সময় মনে হতে লাগল এই জলাভূমি মনে হয় কোনওদিন শেষ হবে না। কিন্তু সব পথেরই শেষ হয় এক সময়। বেলা চারটে নাগাদ তারা তাদের যাত্রাপথের শেষে বনভূমি দেখতে পেল। ক্লান্ত-কর্দমাক্ত দেহে জলা ছেড়ে উঠে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর জঙ্গলে ঢুকল তারা।

এ জঙ্গলে ঝোপঝাড়ই বেশি। আর তার মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় সব গাছ। গায়ে তাদের জমাটবাঁধা পুরু শ্যাওলার আস্তরণ। জলাভূমির কাছে অবস্থান বলে এ জঙ্গলের পরিবেশও একটু স্যাঁতসেঁতে। মাটিও একটু ভেজাভেজা। সে পথে চলতে চলতে হঠাৎই রবার্ট থমকে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তদের একটু চমকে দিয়ে বলল, 'ওই যে তোমাদের মাংসাশী গাছ!'

রবার্ট কথাটা একটু মজা করে সুদীপ্তদের চমকে দেবার জন্য বললেও তার কথা মিথ্যা নয়। বনের মধ্যে এক জায়গাতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে হাঁটুসমান উঁচু পিচার প্ল্যান্ট। এই পিচার প্ল্যান্ট বা কলসপত্র উদ্ভিদ নিজের দেশেই পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে সুদীপ্ত আগে দেখেছে। ফুটখানেক উচ্চতার এই উদ্ভিদের মাথাটা একটা কলসির মতো দেখতে। তার মাথায় একটা ঢাকনার মতো পাতা থাকে। পোকামাকাড় কলসির কিনারে বসে পিছলে ভিতরে পড়লে পাতার ঢাকনাটা বন্ধ হয়ে কলসির ভিতর আটকে পড়ে পোকামাকড়। কলসপত্র বা পিচার প্ল্যান্ট সত্যিই মাংসাশী গাছ।

হেরম্যান গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওরা আমাদের চোখে হয়তো নগণ্য। কিন্তু ওই ছোট ছোট গাছ একটা ইঙ্গিত বহন করছে। তা হল এখানকার পরিবেশ মাংসাশী উদ্ভিদের বেঁচে থাকার পক্ষে উপযুক্ত। ওদের মতোই হয়তো এখানে সত্যিও আছে ওদের কোনও দানব প্রজাতি। যারা মানুষ খেতে পারে।'

এরপর সুদীপ্তদের যাত্রাপথে আরও চোখে পড়তে লাগল ওই ছোট গাছগুলো।

জঙ্গলের পথ ধরে ঘণ্টাখানেক চলার পর সবশেষে জঙ্গল একটু হালকা হয়ে এল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল কিছু দূরে বেশ বড় একটা উন্মুক্ত জায়গা। আর তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে পাতায়

ছাওয়া ঘর। রবার্ট বলে উঠল, ‘আমরা পৌঁছে গেছি। ওই তো মকোডোদের গ্রাম।’

৫

সুদীপ্তরা যে পথ ধরে এসেছে সে দিকটাই মনে হয় গ্রামে ঢোকার পথ। কারণ গ্রামসমেত ফাঁকা জমিটার অন্য তিনদিক গভীর ঝোপঝাড়ে ঘেরা। সুদীপ্তরা জঙ্গল ছেড়ে ফাঁকা জমিতে পা রাখতেই সামনে একটা ছোট তোরণের মতো জিনিস নজরে এল। দুটো বড় গাছের খুঁটি আড়াআড়িভাবে মাটিতে পোঁতা সেখানে। আর খুঁটি দুটোর গায়ে আটকানো আছে কঙ্কালসমেত বেশ বড় দুটো কুমিরের চামড়া। সুদীপ্তরা তার নীচ দিয়ে জায়গাটা অতিক্রম করতেই যেন মাটি ফুঁড়ে জনা দশ-বারো দীর্ঘদেহী লোক তাদের সামনে মানবপ্রাচীর রচনা করে দাঁড়াল। যেন পাথর কুঁদে তৈরি করা ছিপছিপে অথচ সুগঠিত পেশিবহুল মূর্তি সব। গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, মাথার চুল ছোট, ঘন, কুঞ্চিত। আফ্রিকানদের মতোই তাদের পুরু ঠোঁট, তবে কারো মুখে দাড়ি-গোঁফ নেই। তাদের কটিদেশে সামান্য বস্ত্রখণ্ড। তাদের দু-একজনের গলায়, কানে কাঠের অলঙ্কার আছে। লোকগুলোর প্রত্যেকেরই হাতে ধরা আছে লম্বা বর্শা। তাদের সূচিমুখগুলো আগন্তুকদের দিকে উদ্যত। যেন সামান্য কিছু বেচাল হলেই বর্শাগুলো ফুঁড়ে দেবে সুদীপ্তদের দেহ।

সুদীপ্তদের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মকোডোরা। তারপর তাদের মধ্যে একজন মনে হয় চিনতে পারল রবার্টকে। হাতের বল্লমটা কিছুটা নামিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় সে যেন কী প্রশ্ন করল রবার্টকে।

রবার্টও সে ভাষাতেই উত্তর দিল।

বেশ কিছুক্ষণ অচেনা ভাষায় কথোপকথন চলল তাদের মধ্যে। তারপর সে লোকটা অন্য একজনকে কী একটা নির্দেশ দেওয়ায় সে ছুটল গ্রামের ভিতর একটা কুঁড়ের দিকে। ইতিমধ্যে গ্রামের অন্য কুঁড়েগুলো থেকেও লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও

চোখে পড়ল। তাদের কটিদেশে কাপড়ের ফালি আর বক্ষদেশ ঢাকা কাঠ আর পাথরের মালায়।

সুদীপ্ত জানতে চাইল, 'ওরা কী বলছে?'

রবার্ট বলল, লোকটা চিনতে পেরেছে আমাকে। আমি ওদের বললাম যে গতবার ওরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমরা এ অঞ্চলে জলা-জমি দেখার সরকারি কাজে এদিকে এসেছিলাম। গতবারের আশ্রয়দানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিছু উপহার এনেছি ওদের জন্য। ক'দিন এখানে বিশ্রাম নিয়ে আবার চলে যাব। আমার কথা শুনে লোকটা জাদুকরকে ডাকতে লোক পাঠাল। সে এসে ব্যাপারটা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে।' রবার্টের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুদীপ্তরা খেয়াল করল যে লোকটা জাদুকরকে ডাকতে গেছিল সে একজন লোককে নিয়ে ফিরে আসছে। যাকে ডেকে আনা হল সে ভিড় ঠেলে সুদীপ্তদের সামনে এসে দাঁড়াল।

লোকটার বেশভূষা অন্যদের থেকে একটু আলাদা। একটা কুমিরের চামড়ায় আচ্ছাদিত তার বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেহ। তার গলায় অজস্র মালা। তার মধ্যে একটা সম্ভবত কুমিরের দাঁতের। আর লোকটার কাঁধে বসে আছে বেশ বড় কালো রঙের একটা ব্ল্যাক ডেমন ক্যামেলিয়ন। গিরগিটি খেকো গিরগিটি। কুৎসিত প্রাণীটার ক্রমশ সরু হয়ে আসা লেজটা লোকটার কোমর ছাড়িয়ে আরও নীচে নেমেছে, গোলগোল চোখে সে সুদীপ্তদের দেখছে আর মাঝে মাঝে তার জিভটা ছুড়ে দিচ্ছে বাতাসে।

লোকটা প্রথমে সুদীপ্তদের ভালো করে জরিপ করল। তারপর রবার্টের উদ্দেশ্যে কী যেন বলল।

রবার্টও তার কথার প্রত্যুত্তরে দীর্ঘক্ষণ ধরে কী যেন কথা বলে তার পিঠের ব্যাগ থেকে এক গোছা নানা রঙের কাপড়ের টুকরো, একটা স্ফটিকের মালা, আর-এক বাক্স তামাক বার করে সেগুলো এগিয়ে দিল জাদুকরের দিকে। সে প্রথমে জিনিসগুলো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। তামাকের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। কাপড়ের বাণ্ডিলটা এরপর সে পাশের একজনের হাতে দিয়ে স্ফটিকের মালাটা নিজের গলায় পরল। বেশ প্রসন্ন দেখাল তাকে। এরপর সে প্রথমে রবার্টকে তারপর

তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে কী যেন বলল। বর্শার ফলাগুলো ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল। জাদুকর ইঙ্গিত করল সুদীপ্তদের গ্রামের ভিতর ঢোকার জন্য। ফাঁকা জমিটার ভিতরে ঢুকল সুদীপ্তরা। মাটির দেওয়াল আর পাতায় ছাওয়া মকোডোদের কুঁড়েগুলো বৃত্তাকার ফাঁকা জমির একপাশে অর্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে সাজানো। তার ঠিক উলটোদিকে সুদীপ্তদের তাঁবু ফেলার জন্য একটা স্থান নির্বাচন করে দিয়ে জাদুকর সদলবলে অন্যদিকে চলে গেল। রবার্ট বলল, 'আপাতত তিনরাত তাঁবু ফেলার অনুমতি মিলেছে জাদুকরের কাছ থেকে। ওর নাম হল "গোকো"। জাদুকরের নির্বাচিত স্থানে কিছুক্ষণের মধ্যেই চটপট দুটো তাঁবু খাটিয়ে ফেলল সুদীপ্তরা।' ছোট তাঁবুটা রবার্টের আর বড়টা অন্য তিনজনের জন্য বরাদ্দ।

তাঁবু খাটাবার পর তারা চারজন তাঁবুর সামনে হাত-পা ছড়িয়ে বসল। সারাদিন ধরে এতটা পথ অতিক্রম করতে তাদের প্রচুর ধকল গেছে। সুদীপ্তরা খেয়াল করল মকোডোদের অনেকেই তাদের ঘরের সামনে বসে লক্ষ করছে তাদের। আর জাদুকর গোকো নিজের কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছে অন্য দুজন পুরুষের সঙ্গে। কথা বলতে বলতে মাঝেমাঝেই তারা তাকাচ্ছে সুদীপ্তদের তাঁবুর দিকে। সম্ভবত তাদের নিয়েই আলোচনা করছে তারা তিনজন।

রবার্ট একটা কুঁড়েঘরের দিকে সুদীপ্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'ওই কুঁড়েটাতেই থাকত মেয়েটা। ভিড়ের মধ্যে কিন্তু ওর বাবাকে দেখতে পেলাম না।'

এরপর সে বলল, 'ওই যে ডানপাশের জঙ্গল দেখছ, ওদিকেই মেয়েটাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছিল গোকো।'

সুদীপ্ত বলল, 'আমরা অনুসন্ধানের কাজ কীভাবে শুরু করব?

রবার্ট বলল, 'ওপাশের জঙ্গলটাতে আমাদের ঢুকতে হবে। হাতে তিনটে দিন সময় পাচ্ছি আমরা। তবে কালকের দিনটা মকোডোদের সঙ্গে মিলেমিশে কাটাব। যদি কারও কথার মধ্যে মানুষখেকো গাছ সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত মেলে।'

জঙ্গল আর তার আড়ালে লুকিয়ে থাকা জলার ওপর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছে। পাখির দল ঘরে ফিরে আসছে। সুদীপ্তদের তাঁবু যেখানে

তার কিছুটা তফাতে ফাঁকা জমির প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছের ডালে সুদীপ্তরা বেশ কয়েকটা লেমুর দেখতে পেল। জলাতে বড় গাছের জঙ্গল না থাকায় সেখানে একটাও লেমুর চোখে পড়েনি সুদীপ্তদের।

অন্ধকার নামল কিছুক্ষণের মধ্যেই। বড় তাঁবুতে একটা স্টোভ জ্বালিয়ে সামান্য কিছু রান্না সারা হল। খাওয়ার পাট চুকে গেলে রবার্ট পাশের তাঁবুতে চলে গেল। আর সুদীপ্তরা নিজের তাঁবুতে শুয়ে পড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম নেমে এল সবার চোখে। মাঝরাতে হঠাৎই যেন কীসের স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তর। তাঁবুর প্রবেশমুখে বাইরে থেকে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে। পাশ ফিরতেই তার চোখ গেল সে জায়গার দিকে। সুদীপ্ত দেখতে পেল গোসাপের মতো একটা প্রাণী বুকে হেঁটে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। জাদুকরের সেই পোষা দানব গিরগিটিটা নাকি! সুদীপ্ত তাড়াতাড়ি উঠে তাঁবুর দরজার সামনে এসে বাইরে উঁকি দিল। কিন্তু প্রাণীটাকে সে কোথাও দেখতে পেল না। চাঁদের আলোতে ঘুমোচ্ছে কুঁড়েগুলো। শুধু জাদুকর গোকোর ঘরের ভিতর থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা ভেসে আসছে। দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর সুদীপ্ত আবার তাঁবুর ভিতর শুয়ে পড়ল।

পাখির ডাকে সকালবেলা ঘুম ভাঙল সুদীপ্তর। ঘুম থেকে উঠে সুদীপ্ত গতরাতে দেখা ঘটনার কথা বলতেই ইদ্‌জেল বলল, হ্যাঁ, ওই প্রাণীটা তাঁবুতে ঢুকে থাকতে পারে। কারণ আমার গিরগিটিটা কেন জানি আমার বুকের মধ্যে ছটফট করছিল। হয়তো বা ওই দানব গিরগিটির উপস্থিতির কারণে হবে।'

ইদ্‌জেল প্রাতঃরাশ তৈরি করা শুরু করল। রবার্টও চলে এল সুদীপ্তদের তাঁবুতে। হেরম্যান তাকে বললেন, 'একটা কাজ করা যেতে পারে। তুমি আর সুদীপ্ত গ্রামে থাকো লোকগুলোর সঙ্গে ভাব জমানোর জন্য। কারণ, তুমি ওদের ভাষা জানো। আর আমি ইদ্‌জেলকে নিয়ে গ্রামের আশেপাশে ঘুরে দেখি। সম্ভব হলে একটু ঘুরপথে ডানদিকের জঙ্গলটাতেও ঢুকব।'

রবার্ট বলল, 'হ্যাঁ, এ প্রস্তাবটাও মন্দ নয়।' এরপর সে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। আর এরপরই তাঁবুর

সামনে এসে হাজির হল গোকো আর দুজন মকোডো। তাদের দেখে সুদীপ্তরাও আলোচনা থামিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। গোকোর কাঁধে বসে আছে তার সেই কুৎসিত সরীসৃপটা।

গোকো কী যেন বলল রবার্টকে। সে-ও তার জবাব দিল। কয়েকবার কথোপকথন হবার পর রবার্ট সুদীপ্তদের বলল, 'ওরা কাছেই একটা জলায় যাচ্ছে কুমির শিকার করতে। আমি গতবার কুমির শিকার দেখতে গেছিলাম ওদের সঙ্গে। ওরা আমাদের আমন্ত্রণ জানাতে এসেছে ওদের সঙ্গী হবার জন্য। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ব্যাপার, তোমরা যাবে নাকি?'

হেরম্যান শুনে বললেন, 'মন্দ কী। ওরা যখন বলছে তখন যাওয়া যেতেই পারে। আশপাশটা দেখতে হবে আবার ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগও হবে।'

হেরম্যানের বক্তব্য শুনে রবার্ট তাদের জানিয়ে দিল তারা তাদের সঙ্গী হতে রাজি। জবাব শুনে গোকো দাঁত বার করে হেসে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাতঃরাশ সাঙ্গ হল, সুদীপ্তরা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। চারজন মকোডো যুবক দাঁড়িয়ে সম্ভবত তাদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। তাদের দুজনের কাঁধে আছে কাছির মতো মোটা ঘাসে বোনা বিরাট লম্বা দড়ি। একজনের হাতে রয়েছে ছোট লাঠির মতো বেশ কয়েকটা কাঠের টুকরো। আর চতুর্থজনের হাতে কুঠার আর বর্শা।

মকোডোদের সঙ্গে এগাল সুদীপ্তরা। গোকো কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদের সঙ্গী হল না। ফাঁকা জমির প্রান্তসীমায় এসে সে থেমে গেল। উলটোদিকের বনে মকোডোদের সঙ্গে প্রবেশ করল সুদীপ্তরা।

তিনজন মকোডো কয়েক পা আগে, আর তাদের পিছনে দড়ি হাতে মকোডোর সঙ্গে সুদীপ্তরা। রবার্ট টুকরো টুকরো কথা শুরু করল সেই পশ্চাদ্‌বর্তী মকোডোর সঙ্গে।

রবার্ট বলল, 'তোমাদের গ্রামটা খুব সুন্দর। আর তোমরাও খুব ভালো লোক।'

'হ্যাঁ', বলে হাসল লোকটা।

'তোমাদের এখানে কী কী প্রাণী আছে?' জানতে চাইল রবার্ট।

লোকটা জবাব দিল, 'লেমুর আছে, সাপ আছে, জলাতে কুমির আছে।

আর গিরগিটিরা তো আছেই।'

'আর গাছ?'

সে বেশ ক'টা গাছের নাম বলল নিজের ভাষায়। রবার্ট তার মধ্যে দু-একটা গাছের বিবরণ চাওয়ায় সে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোকে চিনিয়ে দিল।

রবার্ট লোকটার সঙ্গে কথোপকথন মাঝে মাঝে অনুবাদ করে দিতে লাগল সুদীপ্তদের।

চলতে চলতে বনের মধ্যে এক জায়গাতে বেশ কয়েকটা 'পিচার প্ল্যান্ট' বা কলসপত্র উদ্ভিদ দেখতে পেয়ে হেরম্যান তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করালেন।

রবার্ট গাছগুলো দেখিয়ে মকোডো লোকটাকে বলল, 'এই গাছগুলো পোকামাকড় খায় তুমি জানো?'

লোকটা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, জানি, এ গাছ এখানে অনেক আছে।'

'গাছগুলো কি আরও বড় হয় এখানে?'

'না, ওরা ওই আকারেরই হয়।' উত্তর দিল লোকটা।

রবার্ট এরপর আসল প্রশ্নটা করল—'শুনেছি এখানে নাকি এমন গাছ আছে যারা পোকামাকড় নয়, বড় বড় প্রাণীদেরও খায়?'

প্রশ্নটা শুনেই কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। তারপর জবাব দিল, 'এ কথা আমার জানা নেই। আমি তাকে দেখিনি।' কথাটা বলেই সে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোল তার অগ্রবর্তী সঙ্গীদের দিকে। লোকটা যেন প্রসঙ্গটা এড়াবার জন্যই সুদীপ্তদের সঙ্গ ত্যাগ করল।

রবার্ট তার প্রশ্ন আর মকোডোর জবাব তর্জমা করার পর বলল, লোকটা বলল 'ইয়া-তে-মাটো', অর্থাৎ 'আমি তাকে দেখিনি।'

প্রকৃতিবিদ স্পেনসর আর লিচে দুজনেই বলেছেন যে ওই রাক্ষুসে গাছকে নাকি মকোডোরা 'ইয়া-তে-ভেও' নামে ডাকে। যার অর্থ হল, 'আমি তোমাকে দেখেছি।' অদ্ভুত নাম! লোকটা কী 'ইয়া-তে-ভেও' বলতে গিয়েও 'ইয়া-তে মাটো' বলল? দেখি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলে যদি কোনও সূত্র মেলে।

মকোডোদের সঙ্গে আধঘণ্টা বনপথে চলার পর সুদীপ্তরা দেখতে পেল

জলাটা। বেশ বড় পানায় ঢাকা জলা। জলার পাড়ে হাত দশেক ফাঁকা জমি। তারপর বেশ বড় বড় কয়েকটা গাছ। তার ডালপালা চাঁদোয়ার মতো নেমে এসেছে জলার দিকে নেমে যাওয়া ফাঁকা জমিটার ওপর। একটা গাছের নীচে এসে ঝোপের আড়ালে থামল সকলে। দড়িগুলো প্রথমে কাঁধ থেকে খুলে নিল মকোডোরা। একজন একটা দড়িতে প্রথমে ল্যামোর মতো একটা ফাঁস তৈরি করে সেটা নিয়ে গাছে উঠে ডাল বেয়ে তরতর করে চলে গেল ফাঁকা জমির মাথার ওপর। তারপর ওপর থেকে বিরাট ফাঁসটা প্রায় মাটি ছুঁই ছুঁই করে ঝুলিয়ে দিয়ে এসে দড়ির অপর প্রান্তটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধল। আরও দুজন মকোডো এরপর গাছে চড়ে বসল। তাদের কাছে যে দড়িটা ছিল তারও একটা প্রান্ত গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা হল। আর তার অপর প্রান্ত কোমরের সঙ্গে বেঁধে নিল একজন মকোডো আর এরপরই সে সুদীপ্তদের অবাক করে দিয়ে গাছের ডাল বেয়ে জলার পাড়ের ফাঁকা জমিতে যেখানে ফাঁসটা লাগানো হয়েছে তার কাছাকাছি ওপর থেকে সোজা নীচের দিকে ঝাঁপ দিল। দড়িবাঁধা অবস্থায় ঠিক পেন্ডুলামের মতো মাথা নীচের দিকে দিয়ে ঝুলতে থাকল লোকটা। ওপর থেকে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে লেপটে থাকা একজন লোক ধরে আছে দড়িটা। সে দড়িটা কখনও একটু হালকা করে, কখনও বা টেনে ধরে বেশ কয়েকবার ঝুলন্ত মকোডো যুবককে বিভিন্ন উচ্চতায় উঠিয়ে-নামিয়ে অবশেষে তাকে এমনভাবে ঝোলাল যে তার হাত দুটো যেন মাটি স্পর্শ করে। পায়ে দড়িবাঁধা অবস্থায় উর্ধ্বাসনের ভঙ্গিতে হাতের চেটোয় ভর নিয়ে রইল সেই ঝুলন্ত মকোডো তরুণ।

রবার্টের এই কুমির শিকার দেখার অভিজ্ঞতা আছে। সে বলল, 'ওই ঝুলন্ত লোকটাই হল টোপ।'

চতুর্থ মকোডো এরপর সুদীপ্তদের চুপচাপ ঝোপের আড়ালে বসে পড়তে বলে নিজেও তাদের কিছুটা তফাতে উবু হয়ে বসল। তার কথা শুনে সুদীপ্তরাও বসে পড়ল। ঝোপের আড়াল থেকে ওপাশের ফাঁকা জায়গা, ঝুলন্ত মানুষ, জলা—সবকিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঝোপের আড়ালে বসা মকোডো তার হাতের ছোট লাঠিগুলো একটার গায়ে একটা ঠুকতে লাগল। অদ্ভুত এক শব্দ হতে লাগল। ট্যাপ, ট্যাপ—ট্যাপ, ট্যাপ!

নিষ্পলকভাবে ঝোপের ফাঁক দিয়ে সুদীপ্তরা চেয়ে আছে সেই ফাঁকা জমি আর জলার দিকে। সেই অদ্ভুত ট্যাপ ট্যাপ শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও শব্দ নেই। মিনিটের পর মিনিট কেটে যেতে লাগল। বিস্মিত সুদীপ্ত শুধু ভাবার চেষ্টা করতে লাগল যে এত সময় ধরে কী করে অমনভাবে ঝুলে আছে ওই ছেলেটা!

অবিরাম হয়ে চলেছে সেই ট্যাপ ট্যাপ শব্দ। প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় কাটার পর হেরম্যান প্রথম খেয়াল করলেন যে পাড়ের কাছেই জলার একটা অংশে জলের ওপরের পানা সরে গেছে। আর সেখান থেকে উঁকি মারছে লম্বা কালো একটা মাথা। কৌতূহলী জলের ওপর মাথা ভাসিয়ে পাড়ের দিকে তাকিয়ে শব্দের উৎস খোঁজার চেষ্টা করছে।

একটু পরই সম্ভবত সে দেখতে পেল ঝুলন্ত মকোডোকে। হাতে ভর দিয়ে পাথরের মূর্তির মতো সে দাঁড়িয়ে।

কুমিরটা বার কয়েক ডুবল, ভাসল। তারপর পৌঁছে গেল পাড়ের গায়ে।

প্রথমে মাথা, তারপর সামনের দুটো পা। ঝুলন্ত মকোডো যুবকের দিকে দৃষ্টি রেখে বুকে হেঁটে শিকার ধরার জন্য সন্তর্পণে জল থেকে উঠে আসতে লাগল প্রাণীটা। এক সময় তার সম্পূর্ণ দেহটাই ধরা দিল সুদীপ্তদের চোখে। বিশাল কুমির! অন্তত চোদ্দো ফুট লম্বা হবে! একবার হাঁ করল কুমিরটা। তার চোয়ালের সাজানো দাঁতের সারি ঝিলিক দিল সূর্যের আলোতে। সার সার তীক্ষ্ণ দাঁত। সুদীপ্তরা চমকে উঠলেও মকোডো যুবক কিন্তু অচঞ্চল। দানবটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে তার দিকে। সবাই রুদ্ধশ্বাসে ঝোপের ফাঁক দিয়ে চেয়ে রইল সেই দৃশ্যর দিকে। ট্যাপ ট্যাপ শব্দটা দ্রুত গতিতে বাজছে...

কুমিরটা যখন ঝুলন্ত মকোডোর হাত সাতেক কাছে চলে এসেছে তখন গাছের শাখায় থাকা দুজন ঝুলন্ত মকোডোর দড়ি ধরে টান দিল। ঝুলন্ত মকোডো মাটি থেকে ফুটখানেক ওপরে উঠে জলার উলটোদিকে কিছুটা সরে এল সুদীপ্তরা যেদিকে আছে সেদিকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কুমিরটা। ঝুলন্ত মকোডো স্থির হল এক সময়। কুমিরটা আবারও এগিয়ে আসতে লাগল তার দিকে। সে আবারও যখন তার হাত সাতেক কাছে

চলে এল তখন আবারও টান পড়ল দড়িতে। ঝুলন্ত মকোডো আরও কয়েক ফুট ওপরে উঠে সুদীপ্তদের দিকে সরে এল। একটা জিনিস খেয়াল করল সুদীপ্ত, ঝুলন্ত লোকটা ক্রমশ জলার ধার থেকে দূরে সরে আসছে এবং কুমিরটাও তাকে অনুসরণ করে ক্রমশ ফাঁকা জমির মধ্যে চলে আসছে।

তৃতীয়বার কুমিরটা ঝুলন্ত লোকটার প্রায় হাত পাঁচেক ব্যবধানে চলে এল। লোকটাকে লাফিয়ে ধরার আগে একবার সে মুখটা খুলল। সেটা যেন মুখ নয়, মৃত্যুগহ্বর। দড়িটা কি গাছের ডালে আটকে গেছে? নইলে ওপরের লোকটা টেনে তুলছে না কেন ঝুলন্ত লোকটাকে?

কুমিরটা তার ঠিক নীচে এসে থেমে ওপর দিকে মুখ তুলে লোকটাকে দেখল। আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপরই সে ওপর দিকে ঝাঁপ দেবে শিকারকে টেনে নামাবার জন্য। নির্ঘাত দড়িতে কিছু হয়েছে। নইলে..

দৃশ্য দেখবে না বলে অন্যদিকে মুখ ফেরাতে যাচ্ছিল সুদীপ্ত। ঝুলন্ত লোকটার পরিবর্তে কুমিরটাই যেন হঠাৎ মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল। তার গা থেকে একরাশ জল ঝরে পড়ল সুদীপ্তদের মাথায়। কুমিরটার সামনের দুটো পা আর পেটের মাঝখানে চেপে বসেছে দড়ির ফাঁস। তাকে ওপর দিকে টেনে তুলছে গাছের শাখায় বসা লোকদুটো। অসীম শক্তি আর কৌশল তাদের। শূন্যে ছটফট করছে কুমিরটা। ব্যাপারটা সুদীপ্ত আর হেরম্যানের কাছে এবার স্পষ্ট হল। ঝুলন্ত মানুষের টোপ দেখিয়ে আসলে কুমিরকে ফাঁসটার কাছে টেনে এনেছিল মকোডোরা। তারপর কুমিরটা নিজের অজান্তে সেই ফাঁসের মধ্যে দেহ গলাতেই তাকে ওপরে টেনে তোলা হয়েছে। তবে ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক। কোনওভাবে ঝুলন্ত লোকটা মাটিতে খসে পড়লেই তার মৃত্যু নিশ্চিত। গাছের ওপরের লোকটাও দড়ির টানে ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে খসে পড়তে পারে।

কুমিরটাকে ওপরে টেনে তোলামাত্রই যে লোকটা নীচে বসে শব্দ করেছিল সে পাশে রাখা কুঠার আর বর্শা তুলে নিয়ে একলাফে ঝোপ টপকে ঝুলন্ত লোকটার কাছে পৌঁছোল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই দড়ির বাঁধন থেকে মুক্ত করে ঝুলন্ত দুঃসাহসী মকোডো যুবককে মাটিতে দাঁড় করিয়ে তার হাতে বর্শা ধরিয়ে দিল।

ওপরের লোক দুটো ধীরে ধীরে এরপর মাটির দিকে নামাতে শুরু করল কুমিরটাকে। প্রাণীটা বিশাল চাবুকের মতো তার লেজটা আন্দোলিত করছে। সেই লেজের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য কিছুটা তফাতে সরে গেল মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা মকোডো দুজন। কুমিরটা মাটির কাছাকাছি আসতেই তার বুক লক্ষ্য করে বর্শা ছুড়ে দিল সেই মকোডো যুবক। বর্শাটা তার বুকে ঢুকে ঘাড়ের কাছ ফুঁড়ে বেরিয়ে আটকে রইল ঝুলন্ত কুমীরের দেহে। মিনিট খানেকের মধ্যেই প্রাণীটার লেজের ছটফটানি কিছুটা কমে এল। নিস্তেজ হয়ে পড়ছে প্রাণীটা। যুবক মকোডোর সঙ্গী, সেই শব্দ করা লোকটা এরপর কুমিরটার খুব কাছে এগিয়ে এসে কুঠারের এক আঘাতে লম্বালম্বিভাবে চিরে দিল কুমিরের পেট। শেষবারের মতো ছটফট করে স্থির হয়ে গেল মৃত্যুদূত। প্রাণীটার পেট থেকে তার অন্তঃযন্ত্র বাইরে বেরিয়ে ঝুলতে থাকল। তার মধ্যে থেকে খসে পড়ল বেশ বড় একটা মাছ। সম্ভবত জল থেকে ওঠার আগেই মাছটাকে সে গিলেছিল। মাছের আঁশগুলো সূর্যের আলোতে চিক্‌মিক্ করছে। যেন সদ্য তাকে জল থেকে তোলা হয়েছে।

মৃত কুমিরটাকে নামানো হল মাটিতে। গাছ থেকে মকোডো দুজন নেমে আসার পর একটা লম্বা ডাল কেটে তার সঙ্গে কুমিরটাকে লম্বালম্বিভাবে বাঁধা হল। সামনে পিছনে দুজন করে মকোডো ডালে বাঁধা কুমিরটাকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের দিকে রওনা হল। তাদের অনুসরণ করল সুদীপ্তরা। জঙ্গলের পথ ধরে গ্রামে ফেরার পথে হেরম্যান বললেন, 'আমরা বিভিন্ন অভিযানে উপকথা-রূপকথার প্রাণীদের খুঁজে পাই বা না পাই, কিন্তু যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তাই বা কম কী? যেমন এই আজকের .অভিজ্ঞতা।'

সুদীপ্ত বললেন, 'একদম ঠিক কথা বলেছেন আপনি। এসব অভিজ্ঞতা অমূল্য।'

সুদীপ্তরা গ্রামে ফিরে এল। গ্রামের ঠিক মাঝখানে কুমিরটা নামাতেই জাদুকর গোকো-সহ অন্য নারী-পুরুষরা সেখানে এসে দাঁড়াল। সবার চোখে-মুখেই আনন্দের ভাব। আর কুমির শিকারি মকোডো চারজনের মুখে গর্বের হাসি। জাদুকর গোকো পিঠ চাপড়ে দিল তাদের। কুমিরের মাংস

দিয়ে মহাভোজ হবে।

মাথার ওপর রোদ বেশ চড়া। সুদীপ্তরা ইতিমধ্যেই ঘেমে উঠেছে। বিশ্রাম নেবার জন্য তারা এগোল তাঁবুর দিকে।

কিন্তু তাঁবুতে ঢুকেই চমকে উঠল হেরম্যান আর সুদীপ্ত। তাদের তাঁবুর ভিতর সমস্ত জিনিস কেউ বা কারা যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে রেখেছে। রবার্টের তাঁবুর ভিতরও একই অবস্থা।

কারা তাদের তাঁবুতে ঢুকেছিল তা জানার জন্য সুদীপ্তকে সঙ্গে নিয়ে রবার্ট হাজির হল জাদুকর গোকোর কাছে। সে ব্যাপারটা শুনে বলল, গ্রামের কোনও লোক তাঁবুতে ঢোকেনি। তারপর সুদীপ্তদের তাঁবু দুটোর পিছনের গাছটা দেখিয়ে সে বলল যে ওই গাছে একদল লেমুর থাকে। তারা মাঝে মাঝে সুযোগ পেলে কুঁড়েঘরগুলোতে হানা দেয় খাবারের সন্ধানে। ব্যাপারটা নির্ঘাত তাদেরই কাণ্ড। বানরের এ স্বভাবের কথা জানা আছে সুদীপ্তর। কিন্তু লেমুরও যে এই কাণ্ড ঘটায় তা প্রথম শুনল সুদীপ্ত। তাঁবুতে আবার ফিরে এল তারা। লেমুররা জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করলেও কোনও জিনিসও খোয়া যায়নি বলে মনে হল তাদের।

সব কিছু আবার সাজানো গোছানোর পর স্টোভ জ্বেলে রান্না চাপাল ইদ্‌জেল। তখনই একটা জিনিস খেয়াল করল তারা। তাঁবুতে সব জিনিস ঠিকঠাক থাকলেও 'সল্ট পট' অর্থাৎ নুনের পাত্রটা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। লেমুরা কী নুনের পাত্র নিয়ে গেল?'

হেরম্যান হেসে বললেন, লেমুররা যে নুনে আসক্ত—এই অভিজ্ঞতাও আমার প্রথম হল!'

তার কথা শুনে সুদীপ্তরা হেসে উঠল, নুন ছাড়াই ইদ্‌জেল রান্না করল।

রোদের প্রচণ্ড প্রকোপের জন্য দুপুরবেলা আর তাঁবু ছেড়ে বাইরে এল না সুদীপ্তরা। কিন্তু রোদের তেজ কিছুটা স্তিমিত হতেই তারা তাঁবু ছাড়ল। বাইরে বেরিয়ে তারা দেখতে পেল কয়েকজন মকোডো বাঁশের খুঁটি পুঁতছে মাঠের মাঝখানে। মরা কুমিরটাও সেখানেই পড়ে আছে, মাছি ভনভন করছে তার ওপরে। সূর্য ডুবতে ঘণ্টা তিনেক সময় বাকি। মকোডোর পাশ কাটিয়ে সুদীপ্তরা এগোল গ্রামের বাইরে যাবার জন্য। লোকগুলো একবার শুধু পাশ ফিরে তাকাল তাদের দিকে, কিন্তু মুখে কিছু বলল

না। কুমির তোরণ পার হয়ে গ্রামের বাইরে এসে হেরম্যান বললেন, 'চলো একটু ঘুর পথে গ্রামটাকে বেড় দিয়ে ডানপাশের জঙ্গলে ঢোকা যাক। অবশ্য সোজা ওই জঙ্গলে ঢুকতেও আমাদের বাঁধা নেই। কারণ, জাদুকর গোকো আমাদের ওদিকে যেতে নিষেধ করেনি। তবে ওদের মনে কোনও সন্দেহর উদ্রেক না-ঘটানোর জন্য একটু ঘুরপথে সেখানে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।'

রবার্টও সহমত পোষণ করল হেরম্যানের কথায়।

পরিকল্পনামতোই প্রথমে একটু এগিয়ে তারপর গ্রামটাকে পিছন দিক থেকে বেড় দিয়ে সুদীপ্তরা প্রবেশ করল সেই জঙ্গলে। ঘন জঙ্গল। এ জঙ্গলে অন্য জঙ্গলের তুলনায় ঝোপঝাড়ের আধিক্যও বেশি। জঙ্গলে ঢোকার পর থেকেই পিচার প্ল্যান্ট বা কলসপত্র উদ্ভিদ চোখে পড়তে লাগল সুদীপ্তদের। জঙ্গলের ভিতর যেসব স্থানে বড় বড় গাছের ঘন ডালপালার জন্য সরাসরি সূর্যের আলো মাটিতে এসে পড়ে না, সেই ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে জমিতে দাঁড়িয়ে আছে পিচার প্ল্যান্টগুলো। যতই সুদীপ্তরা জঙ্গলের ভিতরে ঢুকছে ততই তাদের সংখ্যা বাড়ছে। তাই দেখে হেরম্যান বললেন, 'এ জঙ্গলটা কার্নিভোরাস প্ল্যান্টদের ন্যাচারাল হ্যাবিটেট বলেই মনে হচ্ছে।'

রবার্ট বলল, 'হ্যাঁ, পাহাড়ি অঞ্চল বাদ দিলে সমতলে এ ধরনের পরিবেশেই পিচার প্ল্যান্ট জন্মায়।'

সুদীপ্তরা বেশ কিছু অচেনা উদ্ভিদও দেখতে পেল জঙ্গলে। তার মধ্যে রবার্ট যেগুলো চিনতে পারল সেগুলো সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিল সুদীপ্তকে। আর যেগুলো সে চিনতে পারল না, সেইসব গাছের ছবি তুলে সঙ্গে আনা প্লাস্টিকের স্বচ্ছ ব্যাগে তাদের পাতা সংগ্রহ করতে থাকল।

রবার্ট এরপর বলল, 'শুধু পিচার প্ল্যান্টই নয়, অনেক অপরিচিত উদ্ভিদেরই আবাসস্থল এই জঙ্গল। এখানে এমন অনেক উদ্ভিদ দেখছি যা সম্ভবত নতুন প্রজাতির।'

হেরম্যান তার কথা শুনে প্রথমে বললেন, 'তোমার এই বক্তব্য আমার মনে আশার সঞ্চার ঘটাচ্ছে। নতুন প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে হয়তো মানুষখেকো গাছও আছে।'

এরপর তিনি বললেন, 'আর একটা ব্যাপার তোমরা খেয়াল করেছ

কিনা জানি না, বিকালবেলা পাখিদের এই ঘরে ফেরার সময় অন্য সব জঙ্গলে পাখি ডাকলেও এদিকের জঙ্গলে কোনও পাখি ডাকছে না। ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পরও আমি একটা জিনিস খেয়াল করেছি, পাখির দল গ্রামের মাথায় ওপর দিয়ে এক বন থেকে আর এক বনে উড়ে গেলেও এদিকে কোনও পাখি উড়ে আসেনি। কোনও বনে বিপজ্জনক কোনও গাছপালা বা পশুপাখি থাকলে সাধারণত অন্য প্রাণীরা সে-বন এড়িয়ে চলে।'

হেরম্যানের বক্তব্য সঠিক। ব্যাপারটা সুদীপ্তও খেয়াল করেছে। এ বনে ঢোকার পর কোনও পশুপাখি চোখে পড়েনি তার। একটা লেমুর বা সব সময় চোখে পড়া গিরিগিটিও নয়। চারপাশে কেমন যেন একটা থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।

আরও কিছুটা এগোবার পর জঙ্গলের মধ্যেই বেশ কিছু ছোট ছোট ডোবা চোখে পড়তে লাগল। তবে তাদের গভীরতা খুব বেশি নয় বলেই মনে হল সুদীপ্তদের। জায়গাটার পরিবেশ আরও বেশি স্যাঁতসেঁতে। ভেজা মাটিতে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে অনেক অচেনা উদ্ভিদ। ইদ্‌জেল বলল, 'বর্ষার সময় সম্ভবত নদী-প্লাবিত হয়ে জল ঢোকে এই বনে। বর্ষার শেষে প্লাবন থেমে গেলেও নীচু জমিতে জল আটকে পড়ে এই ডোবাগুলো সৃষ্টি হয়েছে।'

জায়গাটাতে ঘুরে বেড়াতে লাগল সুদীপ্তরা। এমনও তো হতে পারে যে অপরিচিত উদ্ভিদমহলে কোনও শিশু মানুষখেকো গাছের সন্ধান মিলে গেল!

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও পশ্চিমে হাঁটতে শুরু করল। হেরম্যান এক সময় ঘড়ি দেখে বললেন, 'চলো এবার ফেরা যাক। কাল সারাদিন এ-বনে অনুসন্ধান চালাব। ডোবাগুলো পেরিয়ে আরও সামনে এগোব আমরা।'

ফিরতে শুরু করল সুদীপ্তরা।

এক সময় যখন তারা প্রায় মকোডো গ্রামের কাছে পৌঁছে গেছে, বাজ পড়ে পুড়ে যাওয়া বিরাট একটা গাছের পাশে বড় ঝোপের আড়ালে হঠাৎ মানুষের কাশির শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। ইদ্‌জেল বন্দুক

বাগিয়ে এগোল সেদিকে। সন্তর্পণে তাকে অন্যরা অনুসরণ করল। ঝোপের অন্যদিকে তাকাতেই অদ্ভুত একটা জিনিস দেখতে পেল তারা। ওটা কি মানুষ না বনমানুষ? তিনদিকে বড় বড়ো ঝোপের আড়ালে মাটির মধ্যে একটা গভীর গর্ত। বন্য শেয়াল-কুকুরা যেমন গর্ত খোঁড়ে তেমনই গর্তটা। আর গর্ত থেকে বাইরে উপরে উঠে আসার জন্য হাত দশেক লম্বা একটা ঢালু সরু সুড়ঙ্গ ওপর দিকে উঠে এসেছে। আর সেই সুড়ঙ্গপথে হামাগুড়ি দিয়ে ওপর দিকে উঠে আসছে একটা লোক। তার হাত-পা সব কাঠির মতো সরু। শ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার নীচে পাঁজরের হাড়গুলো সব বাইরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। চোয়ালের হাড়ও বাইরে বেরিয়ে এসেছে। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ঘোলাটে। অদ্ভুত দেখতে একটা লোক।

সুড়ঙ্গ দিয়ে ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এল সে। গাছের ফাঁক দিয়ে শেষ বিকালের আলো এসে পড়েছে তার ধুলো মাখা দেহে। সামান্য একটা শতছিন্ন বস্ত্রখণ্ড কোনওমতে তার দেহে লজ্জা নিবারণ করছে। ঝোপের বাইরে এসে কয়েকবার এদিক-ওদিক তাকাল লোকটা। দেখে মনে হচ্ছে যে মকোডো উপজাতির লোক হবে। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সুদীপ্তদের দিকে একবার লোকটা তাকালেও তার কোনও ভাবান্তর হল না। সে উঠেও দাঁড়াল না। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকল অন্যদিকে। তারপর এক জায়গাতে থমকে দাঁড়িয়ে গ্রামের দিকে মুখ করে জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকল।

রবার্ট এবার হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে, এ যে সেই মেয়েটার বাবা! যাকে বনদেবতার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।'

রর্বাটের গলার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটা চমকে উঠে মুখ ফেরাল তাদের দিকে। তার চোখ দুটো যেন কুচকে গেল। ভয় পেয়ে কেঁপে উঠে সে লোকটা বলল, 'তোমরা কেন? আমাকে তোমরা মেরো না।'

তার বক্তব্য শুনে রবার্টও সে ভাষাতেই বলল, তোমাকে আমরা মারব কেন? আমি গতবার তোমাদের গ্রামে এসেছিলাম, আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?'

মকোডো জবাব দিল, 'আমি অন্ধ। চোখে কিছু দেখতে পাই না।'

রবার্ট বলল, 'আমি আর আমার এক সঙ্গী ইদ্‌জেল গতবছর এসেছিলাম তোমার গ্রামে।'

রবার্টের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মকোডো। তার চোখ বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর সে বলল, হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারলাম। তোমার কাছে কোনও খাবার আছে? গ্রাম থেকে কুমিরের মাংসের গন্ধ আসছে।'

তাদের দুজনের কথোপকথন ইদ্‌জেল সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করতে থাকল সুদীপ্তদের। গাইড হিসাবে কাজ করার সুবাদে সে দেশীয় ভাষা আর ইংরেজি ভাষা দুটোই বলতে, বুঝতে পারে। সুদীপ্ত বাতাসে লম্বা শ্বাস নিল, 'হ্যাঁ, গ্রামের দিক থেকে সত্যিই যেন একটা গন্ধ ভেসে আসছে। অন্ধ লোকদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলো সাধারণ মানুষের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়। লোকটা তার আগেই গন্ধটা পেয়েছে।

রবার্ট এরপর লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পকেট থেকে একমুঠো লজেন্স বার করে লোকটার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এগুলোই শুধু আছে। অন্য খাবার নেই। তোমার এ অবস্থা হল কীভাবে? তুমি গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে কী করছ?'

লোকটা লজেন্সগুলো হাতে পেয়েই খিদের জ্বালায় সেগুলো মোড়কসুদ্ধ চিবুতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ পর সে জবাব দিল—জাদুকর গোকো গিরগিটির থুতু দিয়ে আমার চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। আমাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'কেন? কী অন্যায় করেছিলে তুমি?' জানতে চাইল রবার্ট।

লোকটা যে জবাব দিল তা একটু উদ্ভট শোনালেও সে প্রসঙ্গটা শুনে চমকে উঠল সবাই।

সে বলল, 'জাদুকর গোকো শুধু শুধু আমার মেয়েটার প্রাণ নিল। আগুন জ্বালিয়ে সে কীভাবে "ইয়া-তে-ভেও"-কে জাগাল তা আমি দেখে ফেলেছি। কথাটা তাকে বলার পর সে আমার এ অবস্থা করল, ও সবাইকে বলল যে আমি নাকি 'ইয়া-তে-ভেও'-কে বিদেশিদের কাছে চিনিয়ে দেব বলেছি। অন্যরাও জাদুকরের কথা বিশ্বাস করল।'

'ইয়া-তে-ভেও।' অর্থাৎ 'মানুষখেকো গাছ!' যার সন্ধানে এত দূর ছুটে

এসেছে হেরম্যান আর সুদীপ্ত! হেরম্যান আর থাকতে না পেরে রবার্টকে বললেন, 'ওকে জিগ্যেস করো সে-গাছ কোথায় আছে তার সন্ধান ও দিতে পারে কিনা? তার জন্য যা করতে হবে আমি করব।'

রবার্ট কথাটা লোকটাকে বলতেই সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'গাছের পাতা খেয়ে তিনমাস বেঁচে আছি। এভাবে আমি বাঁচব না। তোমরা তো ফিরে যাবে। কিন্তু মরার আগে আমি খাবার খেয়ে মরতে চাই। তাই আমি মরার আগে তাকে চিনিয়ে দেব তোমাদের।'

তার কথা শুনে হেরম্যান উত্তেজনায় সুদীপ্তকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আছে! আছে! ''ইয়ে-তে-ভেও'' আছে!' তারপর তিনি রবার্টের মাধ্যমে লোকটাতে বললেন, 'আমরা খাবার দেব তোমাকে। কিন্তু সে কোন জায়গাতে আছে?'

মকোডো জবাব দিল, 'জঙ্গলের মধ্যে যেখানে ডোবা আছে তা পেরিয়ে আরও গভীরে যেতে হবে। আমাকে খাবার দিলে আমি তোমাদের চোখ দিয়ে পথ দেখে সেখানে নিয়ে যাব। তবে জাদুকর বা গ্রামের লোকরা যেন তা না জানে। তাহলে গ্রামের লোকেরা তোমাদেরকে আর আমাকে মেরে ফেলবে। অনেকে এখানে এসেছে ''ইয়ে- ভেও''-কে খুঁজতে। কালো চামড়া, সাদা চামড়া, কেউ তাদের খোঁজ পায়নি। যারা পেয়েছে, আমরা তাদের জলার কুমিরের মুখে ফেলে দিয়েছি। জাদুকর যদি বিনা কারণে আমার মেয়েকে না মারত, আমাকে অন্ধ না করত, আমার খিদে না পেত, তবে আমাকে মেরে ফেললেও আমি তোমাদের দেবতার খোঁজ দিতাম না। ওর মাকেও তো আমি দেবতার হাতে তুলে দিয়েছিলাম গ্রামের ভালোর জন্য। কারণ দেবতা তখন...।

তার কথা শেষ হবার আগেই ইদ্‌জেল বলে উঠল, 'আরে ওই গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখুন—গোকো জঙ্গলে ঢুকছে!'

গোকোকে দূর থেকে দেখেই চুপ করে গেল সবাই। আর 'গোকো' শব্দটা কানে যেতেই, আর কথা থেমে যেতে বৃদ্ধ মকোডো সম্ভবত ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেলল। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল তার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে সে পিছন ফিরে অতি দ্রুত ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুদীপ্তরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে গোকো সম্ভবত সেদিকেই আসছে বলে মনে হয় সুদীপ্তদের। সে এ জায়গাতে এলে অসহায় বৃদ্ধ মকোডোকে তার নজরে পড়ে যেতে পারে। কাজেই তারা সে জায়গা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হল গ্রামের দিকে যাবার জন্য, গোকো যে পথ ধরে আসছে সেদিকেই।

একটু এগোবার পরই সুদীপ্তরা মুখোমুখি হয়ে গেল গোকোর।

গোকো রবার্টকে জিগ্যেস করল, 'তোমরা এদিকে কেন? কোন পথে এখানে এলে?' তার বাচনভঙ্গিতেই যেন একটা সন্দেহর সুর লুকিয়ে আছে।

রবার্ট জবাব দিল গ্রামের পিছন দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে এসেছি। তবে জঙ্গলের বেশি ভিতরে যাইনি। এই কাছাকাছি ছিলাম।'

গোকো একবার তাকাল রবার্টের হাতে ধরা পাতাভর্তি ব্যাগটার দিকে। তারপর বলল, তোমাদের আর ঘুরপথে ফিরতে হবে না। আমি তোমাদের পথ দেখিয়ে গ্রামে নিয়ে যাচ্ছি।'

সুদীপ্তরা অনুসরণ করল তাকে। গ্রামের দিকে যত তারা এগোতে লাগল তত একটা উৎকট গন্ধ ভেসে আসতে লাগল তাদের নাকে।

৭

সেই কুমিরতোরণ দিয়ে নয়। জঙ্গল থেকে সোজাসুজি গ্রামে পা রাখল তারা। যে গন্ধটা তাদের নাকে লাগছে তার উৎস সুদীপ্তরা অনুমান করলেও এবার ব্যাপারটা তারা চাক্ষুষ করল। মৃত কুমিরটাকে খুঁটি থেকে বাঁশে ঝুলিয়ে নীচে আগুন জ্বেলে রোস্ট করা হচ্ছে ছাল-চামড়া সমেত। বেশ কয়েকজন মকোডো তত্ত্বাবধান করছে কাজটার। কেউ আগুনটাকে উসকে দিচ্ছে, দুজন দুপাশে দাঁড়িয়ে বাঁশটাকে মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে গ্রিল করছে কুমিরের দেহটাকে। আর একজন মাঝে মাঝে জলের ছিটা দিচ্ছে কুমিরটার গায়ে। আর তখনই ভসভস করে ধোঁয়া উঠছে দেহটা থেকে। তীব্র উৎকট মাংসপোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। গন্ধটা এত

অসহ্যকর যে গা গুলিয়ে আসছে। সুদীপ্ত পকেট থেকে রুমাল বার করল নাকে চাপা দেবার জন্য। কিন্তু রবার্ট বলল, 'ওটা কোরো না। মকোডোরা ভাববে ওদের খাদ্যকে, ওদের সংস্কৃতিকে আমরা অসম্মান করছি। এসব ব্যাপারে জঙ্গলের মানুষরা খুব স্পর্শকাতর হয়।'

জাদুকর গোকোর সঙ্গে যেখানে কুমিরের রোস্ট হচ্ছে তার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল তারা। গোকো আবারও রবার্টের হাতে ধরা স্বচ্ছ ব্যাগটার দিকে তাকাল। তার ঠোঁটের কোলে আবছা একটা হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, 'বনে কোথায় কোন গাছ জন্মায় আমি তা জানি।'—এ কথা বলে সে নিজের কুঁড়ের দিকে পা বাড়াল।

গোকোর কথার ভিতর লুকিয়ে থাকা বক্তব্যটা ধরতে অসুবিধা হল না সুদীপ্তদের। সুদীপ্তরা যে বনের বেশ ভিতরে ঢুকেছিল তা পাতা দেখে বুঝতে পেরেছে জাদুকর।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে তারা দ্রুত তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। জঙ্গলের আড়ালে সূর্য ডুবে গেছে, দ্রুত সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে চারপাশে।

বড়ো তাঁবুর ভিতরে ঢুকে সবাই বসল। হেরম্যান বললেন, 'আমাদের কাল যেভাবেই হোক আবার বনে ঢুকে ওই বৃদ্ধ মকোডোকে ধরতে হবে। তারপর তাকে নিয়ে গাছটার সন্ধানে যেতে হবে।'

সুদীপ্ত বলল, 'কিন্তু যদি গোকো বা অন্য কোনও মকোডো অনুসরণ করে আমাদের? বাধা দেয় আমাদের?'

রবার্ট বলল, 'হ্যাঁ, সে সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, আমার হাতের পাতার থলি দেখে গোকো বুঝতে পেরেছে যে আমরা মিথ্যা বলেছি। সে নিশ্চয়ই ভাবছে যে আমরা তাকে মিথ্যা বললাম কেন? নিশ্চয়ই আমাদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে ওই বনে ঢোকার পিছনে। আর নিহত মেয়েটার বাবার কথা যদি সত্যি হয়, মানুষখেকো গাছ যদি ওখানে থেকে থাকে তবে গোকো নিশ্চয়ই জায়গাটা সম্বন্ধে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে।'

ইদ্‌জেল শুনে বলল, 'আমার মনে একটা পরিকল্পনা আছে। আমাদের মধ্যে কেউ মৃদু অসুস্থতার ভান করে বলি যে এ জায়গার পরিবেশ আমাদের ঠিক সহ্য হচ্ছে না। কাল সকালেই তাই মকোডোদের থেকে

বিদায় নিয়ে গ্রাম ছাড়ব আমরা। যে পথ ধরে আমরা গ্রামে এসেছি, ঠিক সে পথেই আমরা ফিরতে শুরু করব। জাদুকর বা তার নির্দেশে মকোডোরা খুব বেশি হলে জঙ্গল পেরিয়ে জলা পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ করবে। তার বেশি যাবে না, কারণ, ওরা নিজেদের চৌহদ্দি খুব একটা অতিক্রম করে না। ওদের সীমানা ওই জলার মুখ পর্যন্ত। যে বনে আমরা মানুষখোকা গাছ খুঁজতে যাব, তার অবস্থান আমি বুঝে নিয়েছি। আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা জানা নেই এদিক থেকে প্রথম জলাটা অতিক্রম করলে বাঁদিকে একটা পথ আছে অন্য একটা জলের গা ঘেঁষে। ও পথ ধরে আবার পিছু ফিরলে আমরা গ্রামের ডানদিক দিয়ে গ্রামটাকে বেশ তফাতে রেখে ওই জঙ্গলে প্রবেশ করতে পারব। জলায় ঢুকে সারাদিন বিশ্রাম নেব। তারপর রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে ফেরার পথ ধরব। আশা করি আমি আপনাদের যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারব।'

হেরম্যান পরিকল্পনা শুনে ইদ্‌জেলকে তারিফ করে বললেন, 'বাঃ, খুব ভালো উপায় ভেবেছ। এতে আমাদের একটা দিন নষ্ট হলেও পরিকল্পনাটা বেশ নিরাপদ।'

সুদীপ্ত আর রবার্টও সহমত হল এই প্রস্তাবে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করল তারা চারজন। ঠিক হল হেরম্যানের অসুস্থতার কারণ দেখিয়েই গ্রাম ছাড়বে তারা।

বাইরে অন্ধকার নেমে গেছে। কুমিরটা ঝলসানোর জন্য যে আগুন জ্বালা হয়েছে সে আগুনটাকে খুব উজ্জ্বল মনে হচ্ছে এবার। ইতিমধ্যেই সেই অগ্নিকুণ্ড ঘিরে গ্রামের সবাই জড়ো হতে শুরু করেছে। মহাভোজ শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত বলল, 'যা পরিকল্পনা আমরা করলাম তাতে কোনও বিপদ নেমে আসবে কিনা তা সময় বলবে। কিন্তু আমি এখন একটা বিপদের আশঙ্কা করছি।'

'কী বিপদ?'—একসঙ্গে প্রশ্ন করল হেরম্যান আর রবার্ট।

সুদীপ্ত মৃদু হেসে বলল, 'বাইরে রান্না তো প্রায় শেষ। মকোডোরা যদি আমাদের কুমিরের মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করতে চায় তখনই বিপদ। আফ্রিকার বুরুন্ডিতে আমরা জলহস্তির রোস্ট খেয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু তাতে এমন উৎকট গন্ধ ছিল না।'

রবার্ট বলল, 'গন্ধটাতে আমারও বেশ গা গুলোচ্ছে। কিন্তু কী করা যাবে। ওরা খেতে দিলে ওদের খুশি করার জন্য একটু মাংস তো মুখে তুলতেই হবে।'

ব্যাপারটা ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠল সুদীপ্তর।

তাঁবুর ভিতরে আরও বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল সুদীপ্তরা। কিন্তু তাদের বাইরে বেরোতে হবে। হেরম্যানের অসুস্থতার ব্যাপারটা আগাম জাদুকরকে জানিয়ে রাখবে তারা। যাতে ভোরবেলা সে কথা বলে হঠাৎ তাঁবু ওঠালে গোকো কোনও সন্দেহ প্রকাশ না করে। হেরম্যানকে তাঁবুতে রেখে এক সময় তারা তিনজন বাইরে বেরিয়ে এগোল মাঠের মাঝখানে। মকোডোদের রান্না শেষ হয়ে গেছে ততক্ষণে। বাঁশ থেকে কুমিরটাকে নীচে নামানো হয়েছে। আর তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে গ্রামের সবাই। চারজন নারী আর দুজন শিশুকেও তারা দেখতে পেল সেই ভিড়ের মধ্যে। মকোডোদের কারও হাতে কাঠের পাত্র, কারও হাতে পাতার থালা। একজন লোক বিরাট বড় একটা ছোরা দিয়ে ঝলসানো কুমিরটার লেজ, পা, খণ্ড করে কেটে তুলে দিচ্ছে গ্রামবাসীদের পাতে। সেই দুর্গন্ধযুক্ত মাংস পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে মকোডোরা। চোখে-মুখে তাদের খুশির ভাব। তবে জাদুকর গোকো সেখানে নেই। সম্ভবত সে তার কুঁড়েতেই আছে। অন্য কুঁড়েগুলো নিষ্প্রদীপ হলেও তার কুঁড়ের ভিতর থেকে আলোর রেশ আসছে। সুদীপ্তরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও কেউ কিন্তু তাদের মহাভোজে আপ্যায়িত করল না। মকোডোরা নিজের মনে খাচ্ছে, খাবার শেষ হলে কেউ কেউ আরও ভাগ পাবার জন্য পাত্র এগিয়ে দিচ্ছে সামনের দিকে। যে মাংস বাটোয়ারা করছিল সে এক সময় কুমিরের মাথা থেকে তার চোখ দুটো বার করে এনে একটা কাঠের থালায় রাখল। হাঁসের ডিমের মতো বড় বড় সিদ্ধ হয়ে যাওয়া কুমিরের চোখ। সেটা খাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মকোডোদের মধ্যে। একজন মকোডো পিছন থেকে সবাইকে টপকে এসে থালা থেকে একটা চোখ তুলে নিয়ে খপ করে মুখে পুরে মহানন্দে সেটা চিবুতে শুরু করল। আর দ্বিতীয় চোখটা মুখে পুরল যে সেটা বার করেছিল সে নিজেই।

তা দেখে রবার্ট আর সুদীপ্ত অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

রবার্ট বলল, 'চলো, আমরা বরং গোকোর কুঁড়োর দিকে যাই। আমার প্রচণ্ড গা গুলোচ্ছে। এরপর ওরা নিশ্চয়ই কুমিরটার অন্তঃযন্ত্র খাওয়া শুরু করবে। গন্ধটা তাও কোনওমতে সহ্য করা গেলেও এ দৃশ্য আমার সহ্য হচ্ছে না। এখানে আর এক মিনিট দাঁড়ালে নির্ঘাত বমি হয়ে যাবে আমার।'

সুদীপ্ত বলল, 'প্রায় একই অবস্থা আমারও।'

সুদীপ্তরা এরপর এগোল গোকোর কুঁড়ের দিকে। কিন্তু কুঁড়ে পর্যন্ত এগোতে হল না তাদের। গোকোই তার কুঁড়ে ছেড়ে বেরিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল তাদের কাছে।

রবার্ট তাকে বলল, 'তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম। আমরা হয়তো কাল সকালে গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।'

'কেন?' কাঁধের দানব গিরগিটিটাকে ডান-কাঁধ থেকে বাঁ-কাঁধে রেখে একটু সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল জাদুকর গোকো।

রবার্ট জবাব দিল, 'আমাদের সঙ্গের সাদা চামড়ার লোকটা অসুস্থবোধ করছে। আসলে ওই জলা অঞ্চলের পরিবেশ তার ঠিক সহ্য হচ্ছে না। তাঁবুতে শুয়ে আছে সে। কাল সকালেই তার গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছা।'

'কী উপসর্গ?' জানতে চাইল জাদুকর।

'মাথা ঘুরছে, বমি পাচ্ছে, গা-হাত-পায়েও ব্যাথা শুরু হয়েছে।'—পাশ থেকে জবাব দিল ইদ্‌জেল।

গোকো এবার একটু ভেবে নিয়ে প্রথমে বলল, 'চলে যেতে যখন চাচ্ছ তখন যাও।' তারপর রবার্টকে বলল, 'তুমি আমার কুঁড়েতে এসো। জলা পেরিয়ে তো তোমাদের যেতে হবে। সেখানে সাদা চামড়া আরও অসুস্থ হতে পারে। কিছু জড়ি-বুটি দেব। সে বেশি অসুস্থ হলে খাইয়ে দিও। সুস্থ হয়ে যাবে।' বেশ আন্তরিকতার ঢঙেই কথাগুলো বলল গোকো।

জাদুকরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তার মনে সন্দেহ জাগতে পারে। কাজেই রবার্ট সুদীপ্তদের বলল, 'তোমরা তাঁবুতে যাও আমি ওষুধ নিয়ে আসছি।'

সুদীপ্তরা তাঁবুতে ফিরতেই হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, 'কী হল? রবার্ট কই?'

সুদীপ্ত হেসে বলল, 'আমরা যে চলে যাচ্ছি সে কথা গোকোকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আপনি অসুস্থ শুনে গোকো বলল সে ওষুধ দেবে। সেটা আনতেই তার সঙ্গে তার কুঁড়েতে গেছে রবার্ট।

তাঁবুর ভিতরেই স্টোভ জ্বেলে রাতের খাবারের আয়োজন শুরু করল ইদ্‌জেল। খাবার বলতে নুডুলস আর টিনের কৌটো-বন্দি শুকনো মাছ। দুটো খাবারকেই জলে ফুটিয়ে সিদ্ধ করতে হয়।

ইদ্‌জেলের রান্না শেষ হল একসময়, তারপর তারা অপেক্ষা করতে লাগল রবার্টের জন্য। সুদীপ্তরা তাঁবুতে ফেরার প্রায় একঘণ্টা পর রবার্ট ফিরল।

সুদীপ্ত বলল, 'এতক্ষণ কী করছিলে জাদুকরের সঙ্গে? কোনও খবর সংগ্রহ করলে?'

রবার্ট একটা পাতায় মোড়া কিছু শিকড়-বাকড় হেরম্যানের হাতে দিয়ে হেসে বলল, 'এই যে তোমার ওষুধ।' তারপর বলল, 'না খবর তেমন পাইনি, তবে অনেকক্ষণ গল্প হল। ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হল, 'ওর চেহারা যেমনই হোক, আর বুড়ো মকোডোটা যাই বলুক লোকটা কিন্তু মন্দ নয়। নইলে হেরম্যানকে যেচে ওষুধ দেবার কী প্রয়োজন ছিল। আসলে অরণ্যচারী মানুষরা যুগ যুগ ধরে চলে আসা তাদের সংস্কৃতির প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল হয়। নিজের প্রাণের বিনিময়েও তা রক্ষা করার চেষ্টা করে। হয়তো তা বাইরের সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে না, তাই সভ্য পৃথিবীর মানুষ অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ওদের সম্বন্ধে। ও হ্যাঁ, জঙ্গলে যার সঙ্গে দেখা হল সেই বৃদ্ধ মকোডোর কথা গোকো নিজে থেকেই কথা প্রসঙ্গে বলল। লোকটা নাকি নেশার জন্য জড়িবুটি চুরি করতে ঢুকেছিল গোকোর ঘরে। তখনই গিরগিটির থুতুতে সে অন্ধ হয়ে যায়। তারপর সে কোথায় চলে গেছে বা সে বেঁচে আছে কিনা তা নাকি জানা নেই জাদুকরের।'

হেরম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার কথা অনেকাংশ ঠিক। তবে এইসব জ্ঞানী উপজাতিদের কিছু ব্যাপার, মেক্সিকোর ইগোটা উপজাতিদের বিবাহ

উৎসবে কন্যাপণ দেবার জন্য নরমুণ্ড শিকার, বোর্নিওর জঙ্গলে নরখাদক অধিবাসীদের মানুষ পুড়িয়ে খাওয়া, কিছু উপজাতির নরবলি দেওয়া বা এই মকোডো নারীদের নরখাদক গাছের মুখে ফেলে দেওয়া—এ সব ঘটনা যতই প্রাচীন সংস্কৃতির অঙ্গ হোক না কেন, সভ্য মানুষ কখনওই তা সমর্থন করতে পারে না। করা উচিতও নয়।'

ইদ্‌জেল এরপর নুডুলস-এর প্লেট রবার্টের হাতে তুলে দিতে যেতেই সে বলল, 'না, আমি খাব না। গোকো তার কুঁড়েতে খাওয়াল আমাকে। পেট ভরে গেছে।'

রবার্টের কথা শুনে সুদীপ্ত বিস্মিতভাবে বলল, 'তুমিও কি ওই কুমিরের মাংস খেলে নাকি?'

রবার্ট হেসে বলল, 'কুমিরের মাংস নয়। তবে মশলাদের একটা স্যুপমতো খাবার। মাশরুমের মতো একধরনের কিছু জিনিস, কিছু গাছের মূল আর সম্ভবত মাছ দিয়ে বানানো জিনিসটা। বেশ লাগল খেতে।'

সুদীপ্ত এরপর তাকে কিছু জিগ্যেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সে প্রশ্ন করল, 'কাল তবে কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

হেরম্যান বললেন, 'আমি ভেবে দেখলাম, খুব ভোরে নয়, একটু বেলা করেই বেরোব। তাহলে জলার মধ্যে অল্প সময় কাটাতে হবে।'

রবার্ট হাই তুলে বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। জলাটা কুমির আর সাপের জন্য বিপজ্জনক। তাঁবু ফেলতে না পারলে রোদের মধ্যেই সারাটা দিন কাটাতে হবে। আমি আমার তাঁবুতে শুতে গেলাম, ঘুম পাচ্ছে আর মাথাটাও এখন কেমন যেন ভার-ভার লাগছে। শুভরাত্রি।'—শেষ কথাগুলো কেমন যেন ঈষৎ জড়ানো স্বরে বলে সুদীপ্তদের তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল রবার্ট।

৮

পরদিন পাখির ডাকে ঘুম ভাঙল সুদীপ্তর। বেলা প্রায় সাতটা বাজে। ঘুম ভেঙে সুদীপ্ত দেখল ইতিমধ্যেই হেরম্যান আর ইদ্‌জেল উঠে পড়েছে।

প্রাতঃরাশ তৈরি করতে শুরু করেছে ইদ্‌জেল। হেরম্যান হেসে সুদীপ্তকে বললেন, দীর্ঘ পথশ্রমের আগে ঘুমটা খুব জরুরি কাজ। তাই তোমার ঘুম ভাঙাইনি। তাছাড়া তাঁবু গোটাতে আমাদের বেশ কিছু দেরি আছে।'

কিছু সময়ের মধ্যে সুদীপ্ত নিজেকে তৈরি করে নিল। ইদ্‌জেলের প্রাতঃরাশও তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু রবার্ট তখনও আসেনি।

সুদীপ্ত তাই হেরম্যানকে বলল, দাঁড়ান, আমি রবার্টকে তাঁবু থেকে ডেকে আনি। কাল ও শরীর ভালো লাগছে না বলে গেল। হয়তো এখনও তার ঘুম ভাঙেনি।'

সুদীপ্ত এরপর নিজেদের তাঁবু থেকে গিয়ে ঢুকল রবার্টের তাঁবুতে। কিন্তু রবার্ট সেখানে নেই। তাঁবুর ভিতর এমনিতে সব কিছু ঠিকঠাকই আছে। মাটিতে সিন্থেটিক ম্যাটের ওপর হাওয়া বালিশের পাশে রবার্টের রিভলভারটা রাখা। জিনিসটা এভাবে ফাঁকা তাঁবুতে ফেলে রেখে ঠিক করেনি রবার্ট। কেউ নিয়ে যেতে পারে সেটা। চালাতে না জানলেও 'আগুন-ছেড়া লাঠি'—বন্দুক পিস্তলের ওপর অনেক সময় বেশ লোভ থাকে এইসব উপজাতির। এ ব্যাপারটা আফ্রিকায় অন্য এক অভিযানে প্রত্যক্ষ করেছে সুদীপ্তরা। রিভলভারটা তাই তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজে রবার্ট প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গেছে মনে করে নিজেদের তাঁবুতে সুদীপ্ত ফিরে এল।

প্রাতঃরাশ সাজিয়ে তারা অপেক্ষা করতে লাগল রবার্টের জন্য। কিন্তু আরও আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর রবার্ট যখন ফিরল না তখন হেরম্যান বললেন চলো বাইরে গিয়ে দেখি রবার্ট কোথায় গেল। না জানিয়ে কোথাও তো তার যাবার কথা নয়।'

হেরম্যানের কথা শুনে তিনজন বাইরে বেরোবার পর সুদীপ্ত আরও একবার উঁকি দিল রবার্টের শূন্য তাঁবুতে। গ্রাম জেগে উঠেছে। মকোডোদের কেউ কুঁড়ের সামনেটা পরিষ্কার করছে, কেউ জল আনছে, কেউ বা পাথরের টুকরোতে বর্শার ফলা শান দিচ্ছে। তাঁবুর বাইরে আরও কিছুক্ষণ রবার্টের প্রতীক্ষা করার পর তাকে না দেখতে পেয়ে সুদীপ্তরা এগিয়ে গেল মাঠের মাঝখানে, পরপর দুজন মকোডোকে ইদ্‌জেল জিগ্যেস করল যে রবার্টকে তারা দেখেছে কি না? কিন্তু তারা দুজন 'হ্যাঁ' বা 'না'

কোনও জবাবই দিল না। তৃতীয় একজন মকোডো শুধু সংক্ষেপে জবাব দিল, 'জাদুকরকে জিগ্যেস করো।'

হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, 'হ্যাঁ, গোকোকেই জিগ্যেস করা ভালো। এমনও হতে পারে রবার্ট তার ওখানেই আছে। কাল রবার্টের কথা শুনে মনে হয়েছে যে গোকোর সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছে তার। রবার্ট হয়তো কৌশলে গোকোর কাছ থেকে মানুষখেকো গাছ সম্বন্ধে কোনও খবর সংগ্রহের তালে আছে।'

সুদীপ্তরা পৌঁছে গেল গোকোর কুঁড়ের সামনে। কিন্তু তার কুঁড়ের দরজা বাইরে থেকে গাছের ডালের খিল দিয়ে বন্ধ করা। আর সেই ডালের ওপর প্রহরীর মতো বসে আছে গোকোর কালো রঙের কুৎসিত পোষ্যটা। তার লম্বা ল্যাজটা প্রায় মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে। তাকে দেখেই কিছুটা পিছিয়ে এল সুদীপ্তরা। বলা যায় না প্রাণীটা বিষ ছুড়তে পারে!

হেরম্যান বললেন, 'সত্যিই এমন অদ্ভুত ভয়ংকর পাহারাদারের কথা আমি আগে শুনিনি!'

দাঁড়িয়ে রইল সুদীপ্তরা। সময় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রবার্ট বা গোকো কারও দেখা নেই। ক্রমশ একটা আশঙ্কার মেঘ দানা বাঁধতে শুরু করল তাদের মনে। অবশেষে এক সময় তারা দেখতে পেল ডানদিকের সেই জঙ্গল থেকে একাই বেরিয়ে আসছে গোকো।

জাদুকর সোজা এগিয়ে এসে দাঁড়াল সুদীপ্তদের সামনে। ইদ্‌জেল তাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি রবার্টকে দেখেছ?'

অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটের কোণে।

ইদ্‌জেল বলল, 'কোথায় সে?'

জাদুকর গোকো বলল, 'এখানেই সে আছে। গ্রামের বাইরে যায়নি।'

'এখানে কোথায়?' চারদিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করল ইদ্‌জেল।

গোকো দরজার ওপর থেকে তার পোষা দানব গিরগিটিটা কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, 'চলো আমি তাকে ডেকে দিচ্ছি!'

গোকোর কথা শুনে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়ে সুদীপ্তরা তাকে অনুসরণ করল। কিছুটা এগিয়ে গোকো তাদের নিয়ে থামল একটা কুঁড়ের সামনে। তারা সেখানে উপস্থিত হতেই কুঁড়ের পিছন থেকে দুজন বেশ শক্তসমর্থ

মকোডো বেরিয়ে এসে বর্শা হাতে কুঁড়ের দরজার দুপাশে দাঁড়াল। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

গোকো তার নিজের ভাষায় হাঁক দিল ঘরের ভিতর যারা আছে তাদের উদ্দেশে। ভিতর থেকেও একটা বিজাতীয় ভাষায় সাড়া এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে উঁকি দিল একজন মাঝবয়সি মকোডো নারী। গোকো কী যেন বলল তাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অন্ধকার কুঁড়ের মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল পাঁচজন মকোডো নারী। কিন্তু তাদের দিকে ভালো করে তাকাবার পর সুদীপ্তরা তিনজন চমকে উঠল। আরে তাদের মধ্যে একজন যে রবার্ট! কিন্তু এ কী পোশাক তার পরনে! সভ্য জগতের ইউরোপীয় পোশাক খসে পড়েছে তার দেহ থেকে। এখন তার পরনে মকোডো নারীদের মতোই অঙ্গ আবরণ। নিম্নাঙ্গ ঢাকা সামান্য ক'টি বস্ত্রে, আর ঊর্ধ্বাঙ্গ সজ্জিত নানা ধরনের পাথর আর কাঠের মালায়। রবার্টের মাথার চুল আর গাত্রবর্ণ অন্য মকোডো নারীদের সঙ্গে এতই সাদৃশ্যপূর্ণ যে অন্য যে-কেউ তাকে মকোডো গ্রামের বাসিন্দাই ভাববে। বিস্মিত সুদীপ্তরা তাকিয়ে রইল রবার্টের দিকে। তাদের দেখে এরপর রবার্ট কয়েক-পা এগিয়ে এসে সুদীপ্তকে প্রশ্ন করল, 'আমাকে কেমন লাগছে এ পোশাকে?'

সুদীপ্ত হেসে বলল, 'অন্যদের সঙ্গে একদম মানিয়ে গেছে তোমাকে।'

রবার্ট যেন একটু জড়ানো গলায় বলল, 'মানাবে না কেন? মকোডোদের রক্তই যে আমার শরীর বইছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমার ঠাকুরদা এখানে এসেছিলেন। তিনি মকোডো রমণীকে বিয়ে করেন। আমার বাবা জন্মাবার পর তিনি আমার বাবাকে নিয়ে পালিয়ে গেছিলেন প্রথমে ব্রিটেনে, তারপর আমেরিকায়। এই দুই দেশ সে-যুদ্ধের সময় বন্ধু ছিল। আমার ঠাকুরদা আর বাবাকে উদ্ধার করার জন্য বর্বর ব্রিটিশ সেনারা এ গ্রামের বহু মানুষকে মেশিনগানের মুখে খুন করেছিল...

রবার্টের এ কথা শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল সুদীপ্তরা। রবার্ট এ গল্প আগে তাদের কখনও বলেনি।

তার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সবাই। হেরম্যান তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রবার্টকে বললেন, 'তোমাকে এ পোশাকে ভালো

লাগছে ঠিকই। কিন্তু এবার চলো, আমাদের এবার তাঁবু গুটিয়ে রওনা হতে হবে। জানোই তো এ পরিবেশ আমার সহ্য হচ্ছে না।'

হেরম্যানের কথা শুনে একটা হাসি ফুটে উঠল রবার্টের ঠোঁটের কোণে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে কেমন যেন ঘোলাটে দৃষ্টিতে জড়ানো গলায় সুদীপ্তদের চমকে দিয়ে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে ফিরে যাওয়া মানেই তো তোমাদের তথাকথিক সভ্য পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া। যেখানে মানুষের মনে খালি অর্থলোভ আর হিংসা কাজ করে। তার চেয়ে এ জায়গা অনেক ভালো। তোমরা চলে যাও, আমি আর ফিরব না।'

হেরম্যান তার কথা শুনে তবুও বললেন, 'মজা কোরো না। পোশাক পালটে চলো এবার। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে! অনেক পথ যেতে হবে।'

রবার্ট হেরম্যানের কথায় আরও জড়ানো গলায় যা বলল তাতে হৃৎপিণ্ড প্রায় স্তব্ধ হবার জোগাড় হল সুদীপ্তর। রবার্ট বলল, 'বললাম তো আমি আর ফিরব না। কাল আমাকে বৃক্ষদেবতার কাছে নিয়ে যাবে জাদুকর গোকো। তার কাছে আমি নিজেকে সমর্পণ করে পিতৃপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। তোমরা চলে যাও...'

রবার্টের কথা বলার ভঙ্গি দেখে সে যে মজা করে কথা বলছে না তা বুঝতে অসুবিধা হল না কারও। প্রাথমিক বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে সুদীপ্ত বলল, 'এসব তুমি নেশার ঝোঁকে বলছ, তোমার কথা কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে! তুমি কী বলছ তা বুঝতে পারছ?'

রবার্টের চোখের তারাদুটো কেমন যেন ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেছে এটুকু সময়ের মধ্যেই। তার চোখের সাদা অংশটাই যেন প্রকটভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে মরা মাছের মতো। সে যেন এবার একটু টলতেও শুরু করছে।

সুদীপ্তর কথা শুনে চুপ করে রইল রবার্ট।

সুদীপ্ত আবার বলল, 'রবার্ট তুমি কী বলছ বুঝতে পারছ?'

'তোমরা চলে যাও। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও...।' যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল রবার্টের কণ্ঠস্বর।

নির্ঘাত রবার্টকে কোনও মাদক খাইয়ে ভুল বুঝিয়ে তার চেতনা নষ্ট

করা হয়েছে। তাই তার সম্বিত ফেরানোর জন্য সুদীপ্ত কয়েক পা এগিয়ে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলতে লাগল, 'হুঁসে ফেরো রবার্ট। আমাদের সঙ্গে চলো।' বার কয়েক রবার্টের কাঁধ ধরে ঝাঁকাবার পর রবার্ট ঠিক যেন কলের পুতুলের মতো দু-পা পিছিয়ে গেল, তার তারপরই প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারল সুদীপ্তর নাকে। সুদীপ্ত ছিটকে পড়ল হেরম্যানের ওপর। দুজনেই ভারসাম্য হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল এই আকস্মিক আঘাতে।

তারা যখন উঠে দাঁড়াল তখন চারপাশ থেকে বেশ কয়েকটা বর্শার ফলা ঘিরে ধরেছে তাদের। দরজার সামনে দাঁড়ানো সেই দুজন বর্শাধারী ছাড়াও আর বেশ কয়েকজন মকোডো কখন যেন হাজির হয়েছে সেখানে। সুদীপ্তর দিকে বর্শা উঁচিয়ে জাদুকরের নির্দেশের প্রতীক্ষা করছে তারা।

জাদুকর গোকো এরপর সুদীপ্তদের উদ্দেশে বলল, 'ওকে আর তোমরা বিরক্ত কোরো না। ও আমাদেরই মেয়ে। ও যে স্বেচ্ছায় এখানে থাকতে চাচ্ছে সেটা ওর মুখ থেকে তোমাদের জানাবার জন্য ওকে ডাকলাম। তোমাদের তাঁবু গোটানোর সময় দিচ্ছি। তোমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাও।' তার কথা তর্জমা করে দিলে ইদ্‌জেল।

সুদীপ্ত আর হেরম্যান সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'রবার্টকে না নিয়ে আমরা গ্রাম ছেড়ে যাব না।'

গোকো কী যেন একটা বলল বর্শাধারীদের। সঙ্গে সঙ্গে তারা বর্শার ফলার খোঁচা দিয়ে তাড়িয়ে সুদীপ্তদের নিয়ে চলল তাদের তাঁবুর দিকে। গোকোও চলল সঙ্গে সঙ্গে। সুদীপ্ত পিছনে ফিরে দেখল মকোডো রমণীদের সঙ্গে রবার্ট ঢুকে গেল কুঁড়েঘরের মধ্যে।

সুদীপ্তদের এনে দাঁড় করানো হল তাদের তাঁবুর সামনে। কিছুটা তফাতে একটা গাছের ডালের ছায়া এসে পড়েছে। গোকো একটা বর্শা দিয়ে মাটিতে সেই ছায়ার গা ঘেঁষে একটা দাগ কেটে বলল, 'গাছের ছায়া এই দাগ ছোঁয়ার আগেই তোমাদের এ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। নইলে তোমাদের তিনজনের হাত-পা বেঁধে জলার কুমিরের মুখে ফেলে দেব।'—এ কথা বলে সে দুজন বর্শাধারীকে তাদের পাহারায় রেখে নিজের কুঁড়ের দিকে পা বাড়াল।

বাইরে থেকেই সুদীপ্তর হঠাৎ চোখ পড়ল তাঁবুর ভিতর রাখা ইদ্‌জেলের বন্দুকটার ওপর। নিজের কোমরে রাখা রিভলভারটার অস্তিত্বও এতক্ষণ পর অনুভব করল সে। সুদীপ্ত বলল, 'আমাদের কাছে বন্দুক আছে, রবার্টের রিভলভারও আছে, তা দিয়ে রবার্টকে ছিনিয়ে আনা যাবে না?'

হেরম্যান বললেন, 'বিনা লড়াইতে এরা কিছুতেই রবার্টকে আমাদের হাতে দেবে না। তাতে লাভ হবে না। আমরা হয়তো ওদের কজনকে মারত পারব। কিন্তু আমরাও বাঁচব না। আপাতত আমরা এখন গ্রামের বাইরে যাই।'

ইদ্‌জেল বলল, 'সম্ভবত কাল ওরা রবার্টকে নিয়ে গ্রামের বাইরে যাবে। সারা গ্রাম নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে যাবে না। বনের মধ্যে ওত পেতে থেকে আমাদের ওকে ছিনিয়ে নিতে হবে। এখনই গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে ঘুরপথে ওই বুড়ো মকোডোর কাছে আজ বিকালের মধ্যেই পৌঁছোতে হবে। তারা কোন পথে রবার্টকে ওই রাক্ষুসে গাছের কাছে নিয়ে যাবে তা নিশ্চয়ই বুড়োটার জানা। চটপট তাঁবু খুলে ফেলি এখন। সময় নষ্ট করা যাবে না।'

তিনজনে মিলে তাঁবু গোটানোর কাজে হাত দিল। স্থির হল সঙ্গে শুধু বড় তাঁবুটা আর সামান্য কিছু জিনিস নেবে তারা। কারণ দ্রুত পথ চলতে হবে সবাইকে। জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে সুদীপ্ত বলল, 'রবার্টকে যতই নেশা করানো হোক, কিন্তু এক রাতের মধ্যে সে এতটা পালটে গেল কীভাবে তা আমার মাথায় আসছে না?'

ইদ্‌জেল জবাব দিল, সম্ভবত জাদুকর ওকে 'জোম্বি' বানিয়েছে।

'জোম্বি কী?' প্রশ্ন করল সুদীপ্ত।

ইদ্‌জেল বলল, 'জোম্বি' মানে হল 'জীবন্ত মৃতদেহ'। আফ্রিকার বিভিন্ন অরণ্যপ্রদেশের কিছু জাদুকর মানুষকে 'জোম্বি' বানাতে পারে। ব্যাঙের নির্যাস, পাফিন মাছের চামড়া আর গোপন কিছু গাছের মূল দিয়ে আরক বানিয়ে যাকে জোম্বি বানানো হবে তাকে খাওয়ানো হয়। এরপর সে লোক জোম্বিতে পরিণত হয়। তার যাবতীয় চিন্তাশক্তি লোপ পায়। জাদুকর তার মগজে যা ঢুকিয়ে দেয় বা যা নির্দেশ দেয় তাতেই

পরিচালিত হয় তারা। জাদুকর নির্দেশ দিলে সে নিজের সন্তানকেও হত্যা করতে পারে। মুহূর্তের মধ্যে সে নিজেকে প্রভুর নির্দেশে অগ্নিকুণ্ডে সঁপে দিতে পারে। সেই জাদুকরই এখন তার একমাত্র প্রভু। এমনকী জোম্বি হবার পর মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতিও নাকি চলে যায়। সে এখন জীবন্ত মড়া।'

হেরম্যান কাজ করতে করতে বললেন, 'হ্যাঁ, অমন কিছুই খাওয়ানো হয়েছে রবার্টকে। এবং সেটা সম্ভবত কাল রাতেই স্যুপের সঙ্গে। জোম্বির ব্যাপারটা আমিও একটা আর্টিকেলে পড়েছিলাম। বহু বছর ধরে এ ব্যাপারটা চলে আসছে।'

সুদীপ্ত বলল, 'এই ঘোর কাটে কীভাবে?'

হেরম্যান বললেন, 'সেটাও লেখা হয়েছিল কাগজে। এখন ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একবার যাদের জোম্বি বানানো হয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাদের ঘোর কাটানো হয় না। জাদুকররা তাদের ওই ওষুধ খাইয়েই চলে। তাছাড়া দীর্ঘদিন ওই অবস্থায় থাকলে যে-কোনও মানুষের চিন্তা ভাবনা এমনিতেই লোপ পেয়ে যাবে। আমরা ধারণা এখানকার মেয়েদের এমন ওষুধ খাইয়েই মানুষখেকো গাছের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই তারা আপত্তি করে না। তবে পুরো ঘটনায় একটা ব্যাপার কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, মানুষখেকো গাছ এখানে আছে। তার মুখে ফেলার জন্যই অমন অবস্থা করা হল রবার্টকে। কারণ আমাদের মধ্যে সে-ই একমাত্র মহিলা। আর মহিলাদেরই শুধু বলি দেয় মকোডোরা।'

তাঁবু গোটানো হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। গ্রাম ছাড়ার আগে সুদীপ্তরা একবার তাকাল সেই ঘরটার দিকে। যেখানে রবার্ট রয়েছে। কে জানে তাকে কোনওদিন আর দেখতে পাওয়া যাবে কিনা? রবার্টকে তারা শেষ দেখা দেখতে না পেলেও জাদুকর গোকোকে কিন্তু তারা দেখতে পেল। নিজের ঘরের সামনে গিরগিটিটাকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে সে সুদীপ্তদের চলে যেতে দেখে হাসছে। সুদীপ্তর মনে হচ্ছিল যে ইদ্‌জেলের কাঁধ থেকে বন্দুকটা খুলে নিয়ে গুলি চালিয়ে দেয় লোকটাকে। কী কুৎসিত সেই হাসি! সে হাসি ব্যঙ্গ করছে সুদীপ্তকে, সভ্য পৃথিবীকে। সুদীপ্তর কাঁধে হাত রেখে হেরম্যান বললেন 'চলো এবার রওনা দেওয়া যাক।

জাদুকরের সঙ্গে নিশ্চয়ই আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে। তখন ওকে দেখে নেব।'

গোকোর প্রতি রাগে-ঘৃণায় হেরম্যানের মুখও লাল হয়ে উঠেছে।

গ্রাম থেকে বাইরে বেরোবার পর চারজন বর্শাধারী পিছু নিল তাদের। সুদীপ্তরা বনে ঢুকল। তারাও ঢুকল। জঙ্গলটা পেরোতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। তারাও পিছু পিছু এল তাদের। এরপর সুদীপ্তরা জলা-জমিতে প্রবেশ করল, কিন্তু জলার পাড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মকোডোরা। একজন মকোডো যেন কী বলল সুদীপ্তদের উদ্দেশে। ইদ্‌জেল বলল, 'ও বলল, আর এদিকে এসো না। তবে আর বেঁচে ফিরবে না।' বন্দুক দিয়ে এখনই ওদের হুমকি থামিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু তাতে কোনও লাভ হবে না।'

সুদীপ্তরা জলার ভিতর দিয়ে এগোতে থাকল। মকোডোরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সুদীপ্তদের যাত্রাপথ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে একসময় বনের ভিতর ঢুকে গেল। রবার্টকে একলা গ্রামে ছেড়ে রেখে জলা ধরে এগিয়ে চলল।

৯

আরও ঘণ্টাখানেক চলার পর তারা কর্দমাক্ত অবস্থায় পৌঁছোল জলার ভিতর সেই জায়গাতে যেখানে অন্য একটা জলা বরাবর আর একটা পথ ফিরে গেছে মকোডোদের গ্রামের সেই জঙ্গলের দিকে। রাতের জন্য অপেক্ষা করার মতো পরিস্থিতি আর নেই, সময় নষ্ট করা যাবে না। কাজেই সুদীপ্তরা নতুন পথ ধরল আবার পিছনে ফিরে যাবার জন্য। তার আগে জলার এক জায়গাতে একটা উঁচু জমিতে তাঁবু আর অন্য জিনিস নামিয়ে রাখল তারা। আরও দ্রুত এগোতে হবে তাদের। তাছাড়া মালপত্র নিয়ে জঙ্গলে ঢুকলে দূর থেকেই মকোডোদের চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

মাথার ওপর প্রচণ্ড রোদ, পায়ের তলায় প্যাচপেচে কাদা। কখনও তাদের নেমে পড়তে হচ্ছে নোংরা জলাতে। প্রায় কোমর পর্যন্ত ডুবে

যাচ্ছে কাদামাখা জলে। ওপরে ওঠার পর সে জল আবার গায়েতেই শুকোচ্ছে। দেহে জমা হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত কাদা মাটির আস্তরণ। আর সেই পূতিগন্ধে সুদীপ্তদের সঙ্গে চলছে মাছির ঝাঁক। এই অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যেই একবারও না থেমে ইদ্‌জেলকে অনুসরণ করে চলেছে সুদীপ্ত আর হেরম্যান। এক সময় তারা এমন এক জায়গাতে এসে উপস্থিত হল যেখানে রাস্তা খুব সরু হয়ে গেছে। তার দুপাশেই জলা। ভেজা রাস্তাটা খুব পিছল, আর তার দুপাশের জলাতে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য গাছের গুঁড়ি। সুদীপ্তরা ভালো করে দেখার পর বুঝতে পারল, ভাসমান জিনিসগুলো গাছের গুঁড়ি নয়, কুমির। একসঙ্গে কোথাও এত কুমির এর আগে দেখেনি সুদীপ্তরা, লেক টাঙ্গানিকাতেও নয়। রাস্তা থেকে কোনওরকমে জলে পড়লেই কুমিরের ফলার হতে হবে। তবুও সে-রাস্তা ধরেই এগোল তারা। রবার্টকে বাঁচাবার জন্য পরদিন সকাল পর্যন্ত শুধু সময় আছে তাদের কাছে। জঙ্গলে ঢুকে অন্ধ মকোডোকে খুঁজে বার করে রবার্টকে বাঁচাবার পরিকল্পনা করতে হবে। যে কারণে সুদীপ্ত-হেরম্যান এত দূর থেকে এই জলা-জঙ্গলের দেশে ছুটে এসেছে সেই মানুষখেকো গাছকে খুঁজে বার করতে, তার চেয়েও রবার্টকে মকোডোদের কবল থেকে মুক্ত করা অনেক বেশি প্রয়োজন। যদিও ওই মানুষখেকো গাছটা সম্ভবত এ সময় জড়িয়ে গেছে রবার্টের জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে।

শেষ দুপুরে দিকচক্রবালে একটা কালো রেখা দেখা গেল। তা দেখে ইদ্‌জেল বলল, 'ওই দেখুন আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।'

মকোডো গ্রাম কাছে চলে এসেছে। সুদীপ্তরা আরও সতর্কভাবে চলতে লাগল। অবশেষে বিকাল নাগাদ জলা পার হয়ে তারা প্রবেশ করল আগের দিনের বিকালের সেই জঙ্গলে। রবার্ট তখন তাদের সঙ্গিনী ছিল।

জঙ্গলে ঢুকে হেরম্যান বললেন, 'তুমি চিনতে পারবে তো সেই জায়গা? যেখানে বুড়ো মকোডোর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল।'

ইদ্‌জেল জবাব দিল, হ্যাঁ, পারব। বাজে পুড়ে যাওয়া ওই একটা গাছই আমার চোখে পড়েছে এ জঙ্গলে!'

কিছুটা আন্দাজের ভিত্তিতেই সূর্যের সাহায্যে দিক-নির্ণয় করে জঙ্গলের ভিতর প্রথমে এগোল তারা। এক সময় তারা উপস্থিত হল সেই ছোট

ছোট ডোবা যেখানে আছে সে জায়গাতে। এরপর আর সুদীপ্তদের পথ চিনতে অসুবিধা হল না। খুব সন্তর্পণে তারা এগোতে লাগল গ্রামের দিকে জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বাজে পুড়ে যাওয়া সেই গাছের খোঁজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীপ্তদের চোখে পড়ল। ঝোপের আড়ালে উঁকি দিয়ে সুদীপ্তরা দেখল, সেই গর্তের মধ্যে গুটিশুটি দিয়ে ঘুমোচ্ছে গতকালের সেই লোকটা। ইদ্‌জেল তার উদ্দেশে সেদেশীয় ভাষায় ডাক দিল, 'উঠে পড়ো, আমরা এসেছি, ওঠো ওঠো।'

সে বারকয়েক হাঁক দিতেই ধড়মড় করে উঠে বসল লোকটা। তার মুখে ফুটে উঠল স্পষ্ট আতঙ্কের চিহ্ন। দৃষ্টিহীন চোখে সে অসহায়ভাবে চারপাশে ঘাড় ঘোরাতে লাগল শব্দের উৎস অনুসন্ধান করার জন্য। ইদ্‌জেল এরপর বলল, 'তোমার কোনও ভয় নেই, উঠে এসো। আমরা কাল এসেছিলাম। আজ তোমার জন্য খাবার এনেছি।'

এ কথা শুনে ভয় কেটে গিয়ে হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। হামাগুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল। হেরম্যান তৈরি হয়েই ছিলেন, সে ওপরে উঠতেই তিনি মাছের কৌটোর মুখ খুলে সেটা ধরিয়ে দিলেন লোকটার হাতে। আর তার সঙ্গে বেশ বড় একটা রুটি। একা লোকের পক্ষে সে খাবার যথেষ্ট। খাবার হাতে নিয়ে একবার গন্ধ শুঁকে সেগুলো গোগ্রাসে গিলতে লাগল লোকটা। এমনভাবে সে খেতে লাগল যে সুদীপ্তদের ভয় লাগল যে লোকটার গলায় খাবার আটকে না যায়। খাবার শেষে এক বোতল জল ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে সে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বিষণ্ণ হেসে বলল, 'মরার আগে শেষ খাবার খেয়ে নিলাম। তোমরা তো আর রোজ রোজ আমাকে খেতে দেবে না। বলো, তোমাদের জন্য কী করতে হবে?'

ইদ্‌জেল বলল, 'আমাদের সঙ্গে যে মেয়েটা ছিল, গতবার যে মেয়েটা তোমার মেয়েকে মালা দিয়েছিল তাকে জাদুকর ওষুধ খাইয়ে আটকে রেখেছে তোমাদের বৃক্ষদেবতার কাছে সম্ভবত কাল বলি দেবার জন্য। মেয়েটাও ফিরতে চাচ্ছে না ওষুধের প্রভাবে। আমাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই মানুষখেকো গাছের কাছে বা যে পথ ধরে তারা সেদিকে এগোবে সেখানে তোমাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে।'

বৃদ্ধ মকোড়ো বলল, 'কাল মেয়েটার ব্যাপারে আমার এমন আশঙ্কা হয়েছিল। আমাদের গ্রামের মেয়েরা শেষ হয়ে যেতে বসেছে। আর তাদের বলি দিলে তো আমাদের জাত শেষ হয়ে যাবে। তাই বাইরে থেকে কোনও মেয়ে এলে তাকে দেবতার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' কিছুদিন আগে সাদা চামড়ার একজন মেয়ে একজন ছেলে এসেছিল গ্রামে। ছেলেটাকে কুমিরের মুখে ফেলা হল, আর মেয়েটাকে দেবতার কাছে দেওয়া হল। তখনই তো আমি দেখে ফেলেছিলাম কীভাবে জাগানো হয় দেবতাকে; তোমাদের মেয়েটাকে জোম্বি বানানো হয়েছে। সে আর তোমাদের সঙ্গে ফিরবে না।'

ইদ্‌জেলের মাধ্যমে সুদীপ্ত জানতে চাইল, মেয়েটার ঘোর কি আর কাটবে না?'

বুড়ো মকোড়ো বলল, 'হ্যাঁ, এখন হয়তো কাটানো যায়, বেশিদিন হয়ে গেলে ঘোর কাটে না, দু-তিন দিনের মধ্যে যদি নুন খাওয়ানো যায় বেশি করে অথবা কুমিরের রক্ত। ও রক্ত বেশ নোনতা হয়।'

তার কথা শুনে হেরম্যান বললেন, 'এবার বুঝলাম নুনের কৌটো খোয়া যাবার রহস্য কী। গোকো আমাদের কৌশলে গ্রাম থেকে বাইরে পাঠিয়ে নুনের কৌটো হাতিয়ে নিয়েছিল যাতে আমরা কোনওভাবে নুন খাইয়ে তার নেশার প্রভাব কাটাতে না পারি সেজন্য।'

বুড়ো মকোড়ো এরপর বলল, 'হ্যাঁ, তোমাদের আমি নিয়ে যাব সে পথে। দেবতার কাছে গ্রামের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় না। জাদুকর আর মাত্র তিনজন লোক যায় সেখানে। পরবর্তীকালে ওই তিনজনের মধ্যেই আবার কেউ নতুন জাদুকর হয়, পুরোনো জাদুকর যদি মারা যায়। যুগ যুগ ধরে এ প্রথা চলে আসছে। ওদের কাছ থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিতে তোমাদের সুবিধা হবে ঠিকই। কিন্তু সঙ্গে নুন রাখতে হবে বা কুমিরের রক্ত। সেটা না খাওয়ালে মেয়েটা তোমাদের সঙ্গে কিছুতেই ভস্মবে না। ভোরের আলো ফুটলে আমি তোমাদের নিয়ে রওনা হব। আরও কিছুটা এগোলে এক জায়গাতে জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট ক'টা ডোবা আছে। সেখানে একটা বড় গাছের গুঁড়ির গায়ে একটা ফোকর আছে। গুঁড়িটাকে দেখলে মনে হয় একটা মানুষ 'হাঁ' করে আছে। তার

পিছন দিয়ে রাস্তা সে জায়গাতে যাবার। যেখানে যেতে চাইছ তোমরা।'

হেরম্যান ইদ্‌জেলের মাধ্যমে বললেন, 'হ্যাঁ, সে জায়গা আমরা চিনি। কাছাকাছি এখানে কুমির কোথায় আছে?'

বুড়ো মকোডো বলল, 'এখানে বাজে পুড়ে যাওয়া যে গাছটা আছে তার যে ডালটা আঙুলসমেত মানুষের হাতের মতো, সে হাত যেদিকে দিক-নির্দেশ করছে সেদিকে গেলে একটা ছোট জলা আছে। সেখানে কুমির পাবে। ঘাড়ের কাছে ফুটো করবে। তাহলে রক্ত বেরিয়ে আসবে।'

হেরম্যান আর বুড়ো মকোডোটার কথা শুনে সুদীপ্ত চমকে উঠে বলল, 'আপনি কি কুমির শিকার করবেন?'

হেরম্যান রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সূর্য ডুবতে ঘণ্টাখানেক সময় আছে। চলো একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।'

'কিন্তু কীভাবে?' বিস্মিতভাবে জানতে চাইল সুদীপ্ত।

হেরম্যান জবাব দিলেন, 'অনেকটা মকোডোদের পন্থাতেই। তবে কাজটা আরও কঠিন ও বিপজ্জনক। আমি মাটিতে শুয়ে টোপ হব।' এই বলে তিনি সুদীপ্তকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে এগোলেন বুড়ো মকোডোর নির্দেশিত পথে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা হাজির হল জলাটার ধারে। পানা ভর্তি জলা। চারপাশে বড় বড় গাছ, তার নীচে কোমর সমান উঁচু ঝোপ জঙ্গল। হেরম্যান তার কর্মপন্থা বুঝিয়ে দিল সুদীপ্ত আর ইদ্‌জেলকে। সুদীপ্ত তার কথা শুনে বলল, 'আপনি কী করতে চলেছেন সেটা শেষ একবার ভেবে দেখুন?'

হেরম্যান বললেন, 'আর ভাবার সময় নেই। কাজ শুরু করো। আমার আর তোমার স্নায়ুতন্ত্র কতটা শক্তিশালী তার পরীক্ষা হবে আজ।'

কাজ শুরু হল। একটা গাছ নির্বাচন করা হল। সুদীপ্তদের সঙ্গের একটা নাইলনের দড়ির ফাঁস গাছে উঠে ওপর থেকে জলার পাড়ের মাটিতে ফেলল ইদ্‌জেল। তারপর সে নীচে নেমে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধল তার প্রান্তভাগ। দড়িটা ধরে রইল ইদ্‌জেল। দড়ি ধরে টানলেই ফাঁসটা মাটি থেকে ওপরে উঠে যাবে। সুদীপ্ত তার কোমর থেকে রিভলভার বার করল। বন্দুক ব্যবহার করা যাবে না। তার শব্দ অনেক

দুর যায়। চারটে গুলি আছে। ইতিমধ্যে দুটো গুলি খরচ করে ফেলেছে রবার্ট। হেরম্যান সুদীপ্তর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'মাথা ঠান্ডা রাখো। তোমার হাতেই এখন আমাদের অভিযানের যাবতীয় সফলতা নির্ভর করছে। এ কথা বলে হেরম্যান বড় ছুরিটা নিয়ে সটান শুয়ে পড়লেন ফাঁসটা যেখানে শোয়ানো আছে তার কয়েক হাত তফাতে। মকোডোদের মতো টোপ হলেও তাকে কুমিরের মুখ থেকে গাছের ওপরে টেনে তোলার লোক নেই। অথবা কুমির যদি জল থেকে উঠে ফাঁস এড়িয়ে ঘুরপথে আসে তবেও হেরম্যানের কিছু করণীয় নেই। সবচেয়ে বড় কথা, সুদীপ্ত যদি ঠিকভাবে গুলি চালাতে না পারে অথবা ইদ্‌জেল ফাঁস টানতে না পারে তবে হেরম্যানের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতোর মধ্যে ঝুলছে হেরম্যানের জীবন। শুয়ে পড়ার পর চোখের ইশারায় সুদীপ্তকে আসল কাজ শুরু করার ইঙ্গিত দিলেন তিনি। সুদীপ্ত কাছেই একটা গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে একটা ছোট ডাল দিয়ে গুঁড়িতে বাড়ি মেরে মকোডোদের মতোই শব্দ করার চেষ্টা করতে লাগল।

মুহূর্তর পর মুহূর্ত কেটে যেতে লাগল। অবশেষে সুদীপ্তদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জল থেকে মাথা তুলল একজন। ড্যাবড্যাবে চোখ, চোয়ালের সামনে দুটো দাঁত বাইরে বেরিয়ে আছে। তাকে দেখামাত্রই সুদীপ্ত আরও জোরে শব্দ করতে লাগল। হেরম্যান মরা কাঠের মতো মাটিতে শুয়ে আছেন। প্রথমে মাথা, তারপর সামনের ডান পা, তারপর বাঁ পা, সরীসৃপের নিজস্ব ঢঙে হেরম্যানকে লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল, প্রাণীটা। ওপরে উঠে কিছুক্ষণ সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করতে লাগল কোথাও কোনও বিপদ ওঁত পেতে আছে কিনা তার জন্য। তারপর খুব সন্তর্পণে এগোতে লাগল কুমিরটা। মাঝে মাঝে সে চলতে চলতে হাঁ করছে। চোয়ালে সাজানো করাতের মতো দাঁত প্রতীক্ষা করছে হেরম্যানকে ছিঁড়ে ফেলার জন্য। এগিয়ে আসছে সে, এক-একটা মুহূর্ত যেন এক-একটা ঘণ্টা মনে হচ্ছে সুদীপ্তর কাছে। এক সময় সে ফাঁসের ওপর এসে দাঁড়াল। হেরম্যানের সঙ্গে তার কয়েক হাত মাত্র ব্যবধান। লেজটা একবার নাড়িয়ে সে মুখটা ফাঁক করল হেরম্যানের ওপর ঝাঁপাবার জন্য। ঠিক তখনই বাজনা থামিয়ে প্রাণীটার

টাগড়া লক্ষ্য করে গুলি চালাল সুদীপ্ত। আর তার পর মুহূর্তেই ইদ্‌জেলের কাছে ছুটে গিয়ে তার সঙ্গে দড়ি টেনে ধরল। শূন্যে পাক খেয়ে ছটফট করতে লাগল প্রাণীটা। হেরম্যানও ততক্ষণে লাফিয়ে উঠে পড়েছেন। লেজের ঝাপট এড়িয়ে তিনি ছুরি দিয়ে লম্বালম্বিভাবে কুমিরটার পেট চিরে দিলেন। আরও কিছুক্ষণ ছটফট করে নিস্তেজ হয়ে গেল প্রাণীটা। মাটিতে নামিয়ে আনা হল তাকে।

হেরম্যান সুদীপ্তকে জড়িয়ে ধরলেন। উত্তেজনায় দুজনেই ঘেমে উঠেছে। বুড়ো মকোডোর কথামতো ইদ্‌জেল মৃত কুমিরটার ঘাড়ের পাশে আঘাত করতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। ইদ্‌জেল একটা বোতলে ভরে দিল সেই রক্ত। রবার্টের ঘোর কাটাবার ওষুধ।

সুদীপ্তরা যখন আবার সেই পোড়ো গাছের কাছে ফিরে এল তখন সূর্য ডুবে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে বনে। কালো একটা পর্দা যেন নিঃশব্দে নেমে আসছে চারপাশে।

কুমিরের রক্ত জোগাড় হয়েছে শুনে বুড়ো মকোডো বলল, 'ওটা যেভাবেই হোক খাইয়ে দিতে হবে মেয়েটাকে, তাহলেই ওর হুঁশ ফিরবে।'

কিছু সময়ের মধ্যেই পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এল অরণ্যে। একটু রাত নামতেই গ্রামের দিক থেকে ভেসে আসা শুরু হল অদ্ভুত এক সম্মিলিত সঙ্গীতধ্বনি। সে সুর যেন অনেকটা বিলাপের মতো।

বুড়ো মকোডোটা সেই শব্দ শুনে বলল, তোমাদের কথাই ঠিক। কালই মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া হবে বৃক্ষদেবতাকে সমর্পণ করার জন্য। ওই দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আগের রাতে ওই গান গাওয়া হয়।'

সুদীপ্তর ইচ্ছা হচ্ছিল যে একবার গ্রামের দিকে গিয়ে জঙ্গলের আড়াল থেকে দেখার চেষ্টা করে যে রবার্টকে দূর থেকে দেখা যায় কিনা? কিন্তু ব্যাপারটা বড্ড বেশি ঝুঁকিপূর্ণ বলে সুদীপ্ত সে পরিকল্পনা ত্যাগ করল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মকোডোর গানের সুরও আরও চড়া হতে থাকল। সুদীপ্তরা শুনতে লাগল সেই শব্দ।

হেরম্যান হঠাৎ সুদীপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'আরে দেখো, ওপাশের আকাশে কেমন যেন একটা আলোর আভা দেখা যাচ্ছে। ও কীসের আলো?'

ইদ্‌জেল সেদিকের আকাশের দিকে তাকিয়ে চটপট মরা গাছের গুঁড়ি বেয়ে বেশ ওপরে উঠে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সে চেয়ে রইল আকাশের সেই অংশের দিকে। ঠিক যেমন সূর্যাস্তের পর দিকচক্রবালে একটা লাল আভা জেগে থাকে তেমনই সেই আভা। বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর ইদ্‌জেল গাছ থেকে নেমে বলল, 'যা অনুমান করেছিলাম তাই। ওটা দাবানলের আলো। বৃত্তাকার পথ পরিভ্রমণ করতে করতে সে এবার এদিকে আসছে।'

হেরম্যান জানতে চাইলেন, 'আগুনের এদিকে আসতে কত সময় লাগবে?'

ইদ্‌জেল বলল, দেখে মনে হচ্ছে মাইল পাঁচেক দূরে আছে আগুনটা। কাল রাতের মধ্যে সম্ভবত এ অঞ্চলে এসে পড়বে। বাতাস যদি জোরে বয়, তবে আরও তাড়াতাড়ি আসবে। তবে আজ রাতে আগুন থেকে তেমন কোনও বিপদের সম্ভাবনা আমাদের নেই।'

সুদীপ্তরা ঠিক করল তারা পালা করে রাত জাগবে। প্রথম রাত জাগল সুদীপ্ত, তারপর হেরম্যান ও শেষ রাত ইদ্‌জেল। মাঝরাত পর্যন্ত তারা শুনতে পেল মকোডোদের গানের শব্দ। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু থেমে গেল। ইদ্‌জেলের ডাকে সুদীপ্তর যখন ঘুম ভাঙল তখন আলো ফুটতে শুরু করেছে সবেমাত্র। ইদ্‌জেলের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সেই মকোডো। আবছা অন্ধকারের মধ্যেই তারা এগোল সেই জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট ডোবাগুলো যেদিকে আছে সেখানে। তারা যখন সেখানে পৌঁছোল তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। অন্য জঙ্গল হলে নিশ্চয়ই এ সময় পাখির কল-কাকলিতে ভরে উঠত চারপাশ। কিন্তু এ জঙ্গলে কোনও পাখি নেই। ভোরের আলো ফুটলেও কেমন যেন থমকে আছে চারদিক। মকোডো বুড়োর কথামতো সেই গাছটা খুঁজে বার করল সুদীপ্তরা। তার গুঁড়িতে একটা গহ্বর আছে, তা যেন ঠিক একটা ফোকলা মানুষের মুখ। গুঁড়ির ঠিক পিছনেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে একটা সুড়ঙ্গের মতো পথ এগিয়েছে। সম্ভবত মানুষের চলাচলেই সে পথ সৃষ্টি হয়েছে। তার অনুমান যে সত্য তা সেপথে ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল সুদীপ্ত। পথের পাশেই একটা ঝোপের গায়ে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া

কাঠের মালা আটকে আছে দেখতে পেল সে। মকোডো রমণীরা এ মালা গলায় পরে। কোনও হতভাগা মকোডো রমণীকে এ পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় হয়তো মালাটা খুলে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল ঝোপের ওপর।

কখনও ইদ্‌জেল, কখনও হেরম্যান, কখনও বা সুদীপ্ত কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল বৃদ্ধ মকোডোকে তার নির্দেশমতো পথ ধরে। পথের দু-পাশে কখনও ঝোপঝাড়, কখনও বড় বড় গাছের জঙ্গল। আবার তারই মাঝে কোথাও কোথাও টুকরো টুকরো ফাঁকা জমি। সেই জমিতে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য কলসপত্র উদ্ভিদ, ছোট হলেও তারাও মাংসাশী। তারা যতই বনের গভীরে প্রবেশ করতে লাগল ততই চারপাশের গাছগুলো অচেনা মনে হতে লাগল। গাছগুলোর গুঁড়ি, পাতা, ফুল, ফল সবই যেন অন্যরকমের। সুদীপ্তরা এর আগে আফ্রিকার প্রত্যন্ত প্রদেশে জঙ্গলে ঘুরেছে, ইন্দোনেশিয়ার গহীনেও গেছে, কিন্তু এ ধরনের অদ্ভুত উদ্ভিদবেষ্টিত জঙ্গল আগে তারা দেখেনি। বুড়ো মকোডো লোকটাকে বহন করে নিয়ে যেতে হচ্ছে বলে একটু শ্লথ গতিতেই এগোতে হচ্ছে তাদের। মাঝে মাঝে থামতেও হচ্ছে বুড়োটার কথামতো কোন দিকে তারা যাবে তা ঠিক করার জন্য। ইদ্‌জেল চলতে চলতে পথের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছে বুড়োটাকে, সেইমতো যাত্রপথ নির্দেশ করছে সে। এক সময় মৃদু গরম অনুভব করতে লাগল সুদীপ্তরা। আর তার সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু বাতাসও যেন সুদীপ্তদের পিছন থেকে তারা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে অদ্ভুত এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। ইদ্‌জেল বলল, 'আমরা যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে দাবানল দ্রুত এগিয়ে আসছে বলে মনে হয়। আর মাইলখানেকের মধ্যেই সে আছে। আগুনের তাপে বাতাস হালকা হয়ে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। আর বনের অন্য অংশ থেকে সেই শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য বাতাস ধেয়ে চলেছে সেইদিকে। এই পরিবেশ দেখার অভিজ্ঞতা এর আগে আমার বেশ কয়েকবার হয়েছে।'

সুদীপ্তরা যত এগোতে লাগল ততই যেন গরম আর সেই বায়ুপ্রবাহ ক্রমশ বাড়তে থাকল। ঘণ্টাখানেক চলার পর তারা বুড়োটার নির্দেশে এক জায়গাতে এসে থামল। তাদের সামনে একটা উন্মুক্ত ছোট্ট জায়গা। তার তিনদিকে বড় বড় ঘনসন্নিবিষ্ট গাছের জঙ্গল, আর একদিকে

ঝোপঝাড়। একটু নীচু ফাঁকা জমিটা থেকে একটা সুড়িপথ চলে গেছে বড় বড় গাছের আড়ালে। হাত পঞ্চাশেক লম্বা ফাঁকা জমিটার ঠিক মাঝখানে অনেকটা ম্যানহোলের ঢাকার মতো কিন্তু তার চেয়ে বড় একটা বৃত্তাকার পাটাতন পড়ে আছে মাটির ওপর। তার ওপর একটা ভারী কাঠের গুঁড়ি চাপা দেওয়া। আর কাছেই ঢিপি করে রাখা আছে শুকনো পাতার রাশি। বোঝাই যাচ্ছে সেটা মানুষের কাজ। অন্ধ মকোড়ো বলল, 'যে পথটা ফাঁকা জমি থেকে গাছের প্রাচীরের দিকে গেছে সে পথটা নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ? ওই প্রাচীরের ওপাশেই তিনদিক ঘেরা জঙ্গলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের সেই দেবতা। তোমাদের মানুষখেকো গাছ। তবে ওখানে আগে না গিয়ে এখানেই লুকিয়ে থাকো। এ পথেই ওরা মেয়েটাকে দেবতার কাছে নিয়ে যাবে। তাছাড়া এখানে থাকলে অন্য একটা ব্যাপার বুঝতে পারবে।'

'কী ব্যাপার? জানতে চাইলেন হেরম্যান।

বুড়ো মকোড়ো জবাব দিল, 'দেখবে কীভাবে জাগানো হয় দেবতাকে। আগে তাকে জাগানোর দরকার হত না। নিজে থেকেই ছুড়ে ফেলামাত্রই নিজের কাছে মেয়েগুলোকে টেনে নিতেন তিনি। কিন্তু বছরখানেক আগে এখানে বড় দাবানল হল, আর তারপর থেকেই দেবতা আর নিজে জাগে না। তাকে পুরোহিত জাদুকর গোকো জাগায় তার জাদু দিয়ে। আমি ব্যাপারটা ধরে ফেললাম বলেই তো আমাকে অন্ধ করা হল।'

হেরম্যান বললেন, 'কী বলছ স্পষ্ট করে বলো?'

বুড়ো মকোড়ো অদ্ভুত হেসে জবাব দিল, 'আর একটু অপেক্ষা করো তাহলে সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা রওনা হবার পর কিছু সময় পরই নিশ্চয়ই এদিকে রওনা হয়েছে তারা। তারা মেয়েটাকে নিয়ে এসে পড়ল বলে!'

বুড়ো মকোড়োর কথা ঠিক। সুদীপ্তদের থেকে ঘণ্টাখানেক পর আলো ভালো ফুটলে তারা রওনা দিলেও নিশ্চয়ই সুদীপ্তদের থেকে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে তারা। কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যিই রবার্টকে নিয়ে পৌঁছে যাবে। কাজেই সুদীপ্তরা পথটা ছেড়ে দিয়ে কিছুটা তফাতে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে আত্মগোপন করে প্রতীক্ষা করতে লাগল তাদের

জন্য। প্রচণ্ড গরম, কিন্তু বাতাস বইছে। গাছের পাতাগুলো মৃদু মৃদু কাঁপছে বাতাসে, চোখের সামনে বায়ুস্তর যেন নাচছে। হালকা একটা পোড়া গন্ধও যেন নাচছে। ইদ্‌জেল চাপা স্বরে বলল, 'দাবানল খুব কাছে চলে এসেছে, নইলে এত গরম লাগত না, আর বাতাসও এত কাঁপত না। হয়তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তাকে দেখতে পাব। ওই দেখুন বনের একপাশে গাছের প্রাচীরের আড়ালে দিনের আলোতেও বড় বড় গাছের মাথার আকাশ কেমন লাল হয়ে উঠছে। ধোঁয়াও বেরোচ্ছে।

সুদীপ্তরা তাকিয়ে দেখল ইদ্‌জেলের কথা সত্যি। সেদিকের গাছগুলোর মাথার ওপরের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে, ধোঁয়াও দেখা যাচ্ছে। হেরম্যান ইদ্‌জেলকে বললেন, 'আগুন যদি এদিকে আসে তবে কোন পথে পালাব আমরা?'

ইদ্‌জেল কোনও জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই তারা যে পথ ধরে এসেছে সে পথে মানুষের গলার শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে কথা থামিয়ে দিল সবাই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বনপথে আত্মপ্রকাশ করল তারা। প্রথমে জাদুকর গোকো। তারপর দুজন বর্শাধারী মকোডোর মাঝে রবার্ট আর সবশেষে আরও একজন বর্শাধারী। ক্রমশ দলটা সুদীপ্তদের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

১০

ঝোপের আড়ালে বসে থাকা সুদীপ্তদের মাত্র হাত দশেক তফাত দিয়ে গিয়ে রবার্টকে নিয়ে ফাঁকা জমিটার মধ্যে প্রথমে থামল মকোডোরা। জাদুকর গোকো চারদিক বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, বিশেষ করে সে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল গাছের গুঁড়ি চাপা দেওয়া পাটাতনের দিকে। আর সুদীপ্তরা তাকাল রবার্টের দিকে। তার খালি পা, পরনে নামমাত্র লজ্জাবস্ত্র, ভাবলেশহীন মুখমণ্ডলে মরা মাছের মতো চোখের মণির সাদা অংশটাই যেন শুধু দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় টলছে সে। তাকে দেখে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল যে জাদুকরের দেওয়া ওষুধের প্রভাব এখন

তার দেহে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। টলতে টলতে একসময় সে সম্ভবত আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে একজন মকোডোর কাঁধে ভর দিয়ে কোনও অজ্ঞাত যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। তাই দেখে জাদুকর গোকো তার উদ্দেশে বলল, 'আর বেশিক্ষণ কষ্ট করতে হবে না তোমাকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃক্ষদেবতা তোমাকে গ্রহণ করবেন। পৃথিবীর সব যন্ত্রণা থেকে তুমি মুক্তি পাবে।'

রবার্ট তার কথা শুনে জড়ানো গলায় বলল, 'হ্যাঁ, তার কাছে আমাকে নিয়ে চলো তোমরা। তোমাদের কাছে আমি অসীম কৃতজ্ঞ আমাকে তার কাছে সমর্পণ করতে এনেছ বলে।'

তাদের দুজনের কথোপকথন ফিসফিস করে সুদীপ্তদের অনুবাদ করে দিতে থাকল ইদ্‌জেল। রবার্ট এখন সত্যিই জাদুকরের অনুগত 'জ্যান্ত মড়া'—'জোম্বি!' জাদুকর গোকো রবার্টের প্রত্যুত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, এখনই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে'—এই বলে সে ইশারা করল তার সঙ্গী মকোডোদের। তারা এরপর সুড়িপথ ধরে সেই ফাঁকা জমি ছেড়ে এগোল সেই গাছের প্রাচীরের দিকে। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে রবার্ট অদৃশ্য হয়ে গেল গাছগুলোর আড়ালে।

তারা চলে যাবার পর জাদুকর গোকো এগিয়ে গেল পাটাতনের দিকে। তার ওপর রাখা গাছের গুঁড়িটাকে সরিয়ে খুব সাবধানে সন্তর্পণে কাঠের পাটাতনটা সরিয়ে ফেলল। তার নীচ থেকে উন্মোচিত হল বেশ বড় একটা গহ্বর। গোকো ভালো করে দেখল সেই গর্তটা। তারপর পাশে রাখা পাতার ঢিপি থেকে পাতা এনে ফেলতে লাগল সে গর্তে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাতার নীচে চাপা পড়ে গেল গর্তটা। এরপর পোশাকের ভিতর থেকে চক্‌মকি পাথর বার করে জাদুকর আগুন লাগিয়ে দিল গর্তের মুখে রাখা পাতার স্তূপে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। তার সঙ্গে প্রচণ্ড ধোঁয়া। হাসি ফুটে উঠল গোকোর মুখে। এ কাজ শেষ করে গোকো রওনা হল তার সঙ্গীরা রবার্টকে নিয়ে যেদিকে গেছে সেদিকে। জাদুকর গোকো তাদের চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হতেই উঠে দাঁড়াল সুদীপ্তরা। তারপর অন্ধ লোকটার নিরাপত্তার কারণেই তাকে সেখানেই রেখে ঝোপের আড়াল

বেয়ে সেই ফাঁকা জমিটাকে বেড় দিয়ে পেরিয়ে ছুটল সেই গাছের প্রাচীরের দিকে। সেদিকে যেতে যেতে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল দাবানল একদম কাছে এগিয়ে এসেছে। প্রচণ্ড গরম বাতাস ভেসে আসছে একপাশে জঙ্গলের ভিতর থেকে, শোনা যাচ্ছে আগুনে পুড়ে বড় বড় গাছের ডাল ভেঙে পড়ার মড়মড় শব্দ। তবু এ সবের মধ্যে দিয়ে তারা উপস্থিত হল সেই গাছের প্রাচীরের মতোই ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে সেখানে। তার ফাঁক গলে কয়েক পা এগোতেই সুদীপ্তদের চোখে পড়ল ওপাশের দৃশ্য। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা।

বেশ বড় একটা ফাঁকা জমি। তার মাটিটা ভেজা স্যাঁতসেঁতে। তার চারদিকেই ঘন গাছের জঙ্গল। গাছের প্রাচীর যেন পৃথিবী থেকে আলাদা করে রেখেছে জায়গাটাকে। আর সেই ফাঁকা জমির মাঝখানে একাকী দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত গাছ। সে গাছ আগে কোনওদিন দেখেনি সুদীপ্তরা। তবে স্পেনসর বা লিচের বর্ণনার সঙ্গে বেশ মিল আছে গাছটার। দুজন মানুষ হাতের বেড় দিয়ে তবে জাপটে ধরতে পারবে গাছটাকে। গুঁড়ির মাথায় কোনও ডাল নেই, তার পরিবর্তে তার মাথায় পাতার জঙ্গল। আনারস গাছের মতোই লম্বা লম্বা পাতা। তার কয়েকটা দীর্ঘ হয়ে নেমে এসেছে গুঁড়ি বেয়ে মাটিতে। দেখে মনে হচ্ছে যে গাছের গুঁড়িটা যেন মানুষের লম্বাটে মাথা, আর মাথার ওপর থেকে নেমে আসা পাতাগুলো তার চুল। আগে এ-গাছ তারা না দেখলেও সুদীপ্তরা বুঝতে পারল এই সেই বহুশ্রুত মাদাগাস্কারের মানুষখেকো গাছ। যুগ যুগ ধরে যে গাছের গল্প শুনেছে লোকে। যার বর্ণনা দিয়ে গেছেন স্পেনসর, লিচে, পাদ্রি ও ভূপর্যটকরা। লোকচক্ষুর আড়ালে যার সন্ধান জানে শুধু মকোডোরা।

অদ্ভুত গাছটার ফুট দশেক তফাতে গাছটার দিকে তাকিয়ে রবার্টকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গোকো আর তার তিন সঙ্গী। সুদীপ্তদের সঙ্গে তাদের দূরত্ব পঞ্চাশ ফুট মতো। গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তরা লক্ষ করতে লাগল তাদের। এরই মধ্যে হেরম্যান পকেট থেকে ক্যামেরা বার করে নিঃশব্দে দ্রুত বেশ কিছু ছবি তুলে নিলেন গাছটার। ইদ্‌জেল তার বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিল। সুদীপ্তও তার রিভলভার বার

করল। যে-কোনও সময়েই চরম মুহূর্ত ঘনিয়ে আসতে পারে। হেরম্যান ক্যামেরা রেখে ইদ্‌জেলের হাত থেকে বন্দুকটা নিলেন। ইদ্‌জেলের হাতে উঠে এল একটা লম্বা ছুরি। ইচ্ছে করলেই সুদীপ্তরা মকোড়োদের শুইয়ে দিতে পারে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে। কিন্তু তারা অপেক্ষা করতে লাগল বিশেষ মুহূর্তের। মকোড়োরাও যেন গাছটার দিকে চেয়ে কীসের প্রতীক্ষা করছে। আর রবার্ট তাদের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে সে টলছে। ওদিকে একপাশের জঙ্গল থেকে ভেসে আসা আগুনের হলকা ক্রমশ বাড়ছে। সেদিক থেকে ধোঁয়াও বেরোতে শুরু করেছে ফাঁকা জমিটায়। কোথায় যেন মড়মড় করে বেশ বড় একটা গাছ ভেঙে পড়ল। কিন্তু সে সবে মকোড়োদের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে তাদের দেবতার দিকে। সুদীপ্তরাও তাকিয়ে রইল সেদিকে।

মুহূর্ত কেটে যেতে লাগল। হঠাৎই সুদীপ্তদের মনে হল সেই গাছের গুঁড়িটা যেন কাঁপতে শুরু করেছে। হ্যাঁ, সত্যিই কাঁপছে গুঁড়িটা। এই মুহূর্তের জন্যই যেন মকোড়োরা অপেক্ষা করছিল। জেগে উঠছে তাদের দেবতা। মাদাগাস্কারের মানুষখেকো গাছ! একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল মকোড়োদের মধ্যে। গাছের দিকে চেয়ে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াতে লাগল তারা। আর তাদের দেখাদেখি রবার্টও।

আরও বাড়ল কাঁপন। থরথর করে কাঁপছে গুঁড়িটা। মাথার পাতাগুলোর মধ্যে একটা আলোড়ন তৈরি হচ্ছে! গাছ জ্যান্ত হয়ে উঠছে প্রাণীদের মতো। নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সুদীপ্ত।

মকোড়োররা এবার তাদের দেবতাকে খাদ্য সমর্পণের জন্য প্রস্তুত হল। তিনজন মকোড়ো তাদের হাতের বর্শা নামিয়ে রাখল মাটিতে। গোকোও এগিয়ে গেল রবার্টের দিকে। রবার্ট টলছে। চারজন মকোড়ো রবার্টকে নিয়ে গাছটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাত-পাঁচেক দূরে থামল। প্রবলভাবে আন্দোলিত হচ্ছে গাছের গুঁড়িটা। বিশেষত, গাছের মাথার লম্বা পাতাগুলো। চরম মুহূর্ত উপস্থিত। চারপাশ থেকে চারজন মকোড়ো রবার্টকে ঘিরে ধরে একটু নীচু হল রবার্টকে তুলে ধরে জ্যাভলিনের মতো তাকে গাছের মাথায় তুলে ধরার জন্য। ঠিক সেই সময় হেরম্যান গাছের

আড়াল থেকে বেরিয়ে শূন্যে প্রথম গুলিটা চালালেন। চারদিক গুলির শব্দে কেঁপে উঠল। হেরম্যানের পিছনে সেই ফাঁকা জমিতে বেরিয়ে এল সুদীপ্ত আর ইদ্‌জেলও।

রবার্টকে তারা ধরে শূন্যে তুলতে গিয়েও গুলির শব্দে চমকে উঠে পিছনে ফিরে তাকাল। রবার্টকে ছেড়ে দেওয়ায় সে মাটিতে পড়ে গেল। সুদীপ্তদের দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল মকোডোদের চোখে-মুখে। গোকো আর দুজন মকোডো আবার মাটি থেকে তোলার চেষ্টা করতে লাগল রবার্টকে। আর একজন মকোডো ছুটে এসে মাটি থেকে বর্শা তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তা ছুড়ল সুদীপ্তদের লক্ষ্য করে। সুদীপ্ত আর হেরম্যানের মধ্যে দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল বর্শা। আর তার পরমুহূর্তেই পিছন থেকে একটা প্রচণ্ড আত্মচিৎকার কানে এল। হামাগুঁড়ি দিয়ে কখন যেন তাদের পিছন পিছন সেই বৃদ্ধ উপস্থিত হয়েছিল সেখানে। মকোডো রক্ষীর বর্শা সুদীপ্তদের বিদ্ধ করতে না পারলেও আমূল বিদ্ধ হয়েছে হতভাগ্য অন্ধ মকোডোর পাঁজরে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় একজন মকোডোও ছুটে এল তার বর্শা তুলে নেবার জন্য। কাউকে প্রাণে মারার ইচ্ছা সুদীপ্তদের ছিল না কিন্তু বাঁচার জন্য সুদীপ্ত গুলি চালিয়ে দিল ছুটে আসা মকোডোকে লক্ষ্য করে। বর্শা যেখানে রাখা আছে সে পর্যন্ত আর পৌঁছোতে পারল না সে। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল। মকোডোরা এরপর সম্ভবত ভয় পেয়ে গেল। যে প্রথমে বর্শা ছুড়েছিল এবং গোকো আর রবার্টের সঙ্গে যে দাঁড়িয়েছিল সে দুজন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল জঙ্গলের একদিকে। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধু গোকো আর রবার্ট আর কিছুটা তফাতে পড়ে সেই গুলিবিদ্ধ মকোডো। আর এরপরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। রবার্ট হঠাৎ যেন তন্দ্রা ভেঙে চিৎকার করে উঠল, 'তোমরা এসেছ? তোমরা এসেছ?' তারপর সে টলমল পায়ে এগোতে লাগল সুদীপ্তদের দিকে। কিন্তু দু-পা এগিয়েই সে মাটিতে পড়ে গেল। সুদীপ্ত চিৎকার করে উঠল, 'আমরা এসেছি, এসেছি, বলে রবার্টকে মাটি থেকে তুলে নেবার জন্য ছুটল তার দিকে। ঠিক সেই সময় বিস্ফোরণের মতো একটা শব্দ করে আগুনের উত্তাপ আর ধোঁয়া ছুটে এল ফাঁকা জমিতে। যেন মুহূর্তের মধ্যে পাতলা কুয়াশার চাদরে মুড়ে

দিল সে জায়গা। রবার্টের কাছে পৌঁছে গেল সুদীপ্ত। হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে রবার্ট। চোখ বন্ধ, বিড়বিড় করে কী যেন বলছে সে। সুদীপ্ত বসে পড়ে রবার্টের মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, 'উঠে পড়ো! উঠে পড়ো! আমরা এসে গেছি। আর তোমার ভয় নেই। চলো এখান থেকে পালাতে হবে।'

কয়েকবার তাকে ঝাঁকুনি দেবার পর সে চোখ খুলল। তার চোখ তখনও ঘোলাটে। সুদীপ্তকে দেখে একটা আবছা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সুদীপ্ত তাই দেখে বলল, 'ওঠার চেষ্টা করো। পালাতে হবে। আমি তোমাকে সাহায্য করছি।'—এই বলে সে আরও ঝুঁকে পড়ে তুলতে যেতেই রবার্টের হাত দুটো হঠাৎ সাপের ফণার মতো লাফিয়ে উঠে চেপে ধরল সুদীপ্তর গলা। কী কঠিন, ভয়ংকর সেই নিষ্পেষণ! সুদীপ্তর হাত থেকে রিভলভার খসে পড়ল। হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল সুদীপ্ত। কিন্তু সে হাত ছাড়াতে পারছে না। রবার্ট আর সুদীপ্ত দুজনেই ঝটাপটি করে গড়াতে শুরু করল মাটির মধ্যে। দাবানলের ধোঁয়ায় ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ। হেরম্যান তার ইদ্‌জেল সেদিকে এগোলেও ধোঁয়ার পর্দার আড়ালে কী ঘটছে তারা ঠাহর করতে পারছে না। গড়াতে গড়াতে ধোঁয়া আর গলার চাপে এক সময় দমবন্ধ হয়ে এল সুদীপ্তর। নিজের অজান্তেই যেন বাঁচবার জন্য সুদীপ্ত প্রচণ্ড জোরে হাতের মুঠি দিয়ে আঘাত করল রবার্টের কপালে। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে সুদীপ্তর গলা থেকে খসে পড়ল রবার্টের হাত। সে হাত খসে গেলেও কয়েক মুহূর্তের জন্য চেতনা লোপ পেয়েছিল সুদীপ্তর। তারপর সে কাশতে কাশতে উঠে বসল ধোঁয়ার পর্দার আড়ালে হেরম্যান কোথায় তা দেখার জন্য। হেরম্যানকে সে দেখতে পেল না। কিন্তু সে দেখল তার ঠিক হাতের কাছেই মাটিতে পড়ে আছে জাদুকর গোকোর সেই সরীসৃপটা। সম্ভবত সে কোনওভাবে মাটিতে খসে পড়েছে গোকোর কাঁধ থেকে। আগুন আর ধোঁয়ায় বিভ্রান্ত ভীত দানব গিরগিটিটা সুদীপ্তর দিকে পিছন ফিরে ঘাড় উঁচিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার মালিককে খুঁজছে।

আর এরপরই ধোঁয়ার পর্দার আড়াল থেকে আবির্ভাব হল একটা অবয়বের। সে, সুদীপ্ত উঠে দাঁড়াবার আগেই আরও কাছে এগিয়ে এল।

দৃশ্যমান হল লোকটার মুখ। সে জাদুকর গোকো। আদিম বন্য হিংস্রতা ফুটে উঠেছে তার মুখে। সে মুখ থেকে ঘৃণা বর্ষিত হচ্ছে সভ্য মানুষদের প্রতি। তার হাতে ধরা আছে একটা লম্বা কিরিচ বা ছোরা। যা দিয়ে কুমির শিকারের সময় তার পেট চেরে মকোডোরা। সে কিরিচ দিয়ে এখন গোকো সুদীপ্তর পেট চিরতে উদ্যত। সুদীপ্ত খেয়াল না করলেও হেরম্যান ইতিমধ্যে তাদের কাছাকাছি চলে এসেছেন। বন্দুক তাগ করলেও তিনি গুলি চালাতে পারছেন না। গোকো আর সুদীপ্ত দুজনেই মাঝে মাঝে ঢেকে যাচ্ছে ধোঁয়ার আড়ালে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সুদীপ্তরও গায়ে লেগে যেতে পারে। বন্দুকের বুলেটও নল থেকে বেরিয়ে বাতাসে ফেটে ছররার সৃষ্টি করে। হেরম্যান তাই এরপর বন্দুকটাকে লাঠির মতো বাগিয়ে ধরে তার কুঁদো দিয়ে গোকোকে আঘাত করার জন্য এগোতে লাগলেন তার দিকে। কিন্তু ততক্ষণে গোকো মাটিতে পড়ে থাকা সুদীপ্তর আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। মাত্র হাত সাতেক দূরত্ব তাদের মধ্যে। কিরিচটা ছুড়ে মারার জন্য ধীরে ধীরে হাতটা ওপরে তুলছে। গোকো। তার ঠোঁটে ফুটে উঠেছে জান্তব হাসি। সুদীপ্ত নিরস্ত্র। বাঁচার জন্য শেষ একটা চেষ্টা করল সে। মাটিতে বসা অবস্থাতেই সুদীপ্ত গোকোর আক্রমণ প্রতিরোধ করার একটা শেষ চেষ্টা করল। গিরগিটিটার লেজ ধরে সে ছুড়ে দিল গোকোর দিকে। সেটা গিয়ে পড়ল গোকোর বুকের ওপর। নখ দিয়ে সে কয়েক মুহূর্ত চেষ্টা করল গোকোর গায়ে ঝুলে থাকার জন্য। কিন্তু গোকো তখন প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য। দেবতার মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে ভিনদেশী এই লোকগুলো। এদের শাস্তি দিতেই হবে তাকে। গোকো নিজেই যেন তার গা থেকে ঝেড়ে ফেলল তার পোষ্যকে। মাটিতে ঠিকরে পড়ল প্রাণীটা। গোকো তার হাতটা আবার ওঠাল কিরিচটা সুদীপ্তকে ছুড়ে মারার জন্য। কিন্তু তার হাতটা ওপরে উঠেও যেন নেমে এল। অস্ত্রটা খসে পড়ল তার হাত থেকে। সুদীপ্ত দেখল গোকো প্রথমে চোখ চেপে বসে পড়ল একটা অদ্ভুত আর্তনাদ করে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো ছুটতে শুরু করল এদিক-ওদিক। একদিকের জঙ্গলে তখন পুরোপুরি আগুন লেগে গেছে। একের পর এক গাছকে গ্রাস করে নিচ্ছে লেলিহান অগ্নিশিখা। মড়মড় করে ভেঙে পড়ছে গাছের ডাল। গোকো সুদীপ্তর কাছ থেকে

সরে যেতেই হেরম্যান আর ইদ্‌জেল ছুটে গিয়ে হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল সুদীপ্তকে। গোকো তখন ছোটাছুটি করছে মাঠের মধ্যে। কখনও সে ধোঁয়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে, কখনও বা হারিয়ে যাচ্ছে ধোঁয়ার আড়ালে। হঠাৎ গোকো মাঠ ছেড়ে তিরবেগে ছুটতে লাগল বনের যেপাশে আগুন লেগেছে সেদিকে। ফাঁকা জমি ছেড়ে সে গিয়ে পড়ল দাবানলের ভিতর। ঠিক সেই সময় একটা গাছ প্রবল দহনে শিকড়সুদ্ধ বিকট শব্দ করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। একটা বীভৎস আর্তনাদ করে গোকো হারিয়ে গেল তার নীচে। মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিবলয় গ্রাস করল সে জায়গা। গোকো কেন অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিল তা অনুমান করতে পারল সুদীপ্তরা। গোকো যখন তার পোষ্যকে তার গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল ঠিক সে মুহূর্তে ভীত দানব গিরগিটিটা বিষ ছুড়ে দিয়েছিল তার চোখে। বুড়ো মকোডোর মতো বিষের প্রকোপে মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধ হয়ে গেছে জাদুকর গোকো। ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, দিকভ্রষ্ট হয়ে ছুটে পালাতে গিয়েই সে দাবানলের কবলে পড়েছে।

অতবড় গাছটা মাটিতে পড়ার ফলে বাতাসে যে কম্পন হল, সে কারণেই হোক, অথবা বাতাসের হঠাৎ গতি পরিবর্তনের জন্যই হোক সুদীপ্তদের সামনের ধোঁয়ার আস্তরণটা হঠাৎ এরপর একটু ফিকে হয়ে এল। সুদীপ্তরা দেখতে পেল নিজেদের অলক্ষে তারা গাছটার বেশ কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আর যে মকোডোকে লক্ষ্য করে সুদীপ্ত গুলি চালিয়েছিল সে মরেনি। আহত অবস্থায় সে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আতঙ্কমিশ্রিত বিস্ময়ের ছাপ। সুদীপ্তদের দেখে ভয় পেয়ে পিছোতে শুরু করল সে গাছটার দিকে। থরথর করে কাঁপছে গুঁড়িটা। সেই মকোডোটাকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখিয়ে তাড়াবার জন্য হেরম্যান তার বন্দুকের নলটা একটু ওপরে তুললেন। তাই দেখে আতঙ্কিত মকোডো ভাবল হেরম্যান হয়তো 'আগুন লাঠি' থেকে গুলি চালাতে যাচ্ছেন তাকে। আরও ভয় পেয়ে গাছটার দিকে পিছিয়ে গেল সেই মকোডো। আর এরপরই যে ঘটনা ঘটল তাতে বিস্মিত হয়ে গেল সুদীপ্তরা। হঠাৎ প্রচণ্ড কেঁপে উঠল মাথায় পাতাসহ গাছের গুঁড়িটা। আর তারপরই গাছটার মাথা ফুঁড়ে গুঁড়ির ভিতর থেকে বেরিয় এল

বিরাট একটা সবুজ রঙের বাহু। সেটাও গাছের গুঁড়িটার মতোই প্রায় মোটা! না, গাছের বাহু নয়, সেটা বিশাল এক অজগর! গুঁড়ির ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এল তার বেশ কিছুটা দেহ। ভয়ংকর কুৎসিত থ্যাবড়া মুখমণ্ডলের ভিতর থেকে সে তার চেরা জিভটা একবার বাতাসে ছুড়ল তারপর সে ওপর থেকে বাজপাখির মতো নেমে এসে সেই মকোড়োর মাথাটা ঢুকিয়ে নিল তার মুখগহ্বরে। লোকটার শরীরটা পেঁচিয়ে ধরে শূন্যে একবার পাক খেয়ে সেই মৃত্যুদূত এরপর লোকটাকে নিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল সেই গুঁড়ির ভিতর। পুরো ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে হেরম্যান গুলি চালাবার কোনও সুযোগই পেলেন না। হেরম্যান একটু হতাশভাবে বললেন, 'ব্যাপারটা এবার বুঝলাম। গর্তের মুখে আগুন জ্বেলে সাপটাকে এদিকে তাড়িয়ে এনেছিল জাদুকর গোকো। গাছের গুঁড়িটা আসলে ফাঁকা। মাটির নীচের গর্তের এটা আর একটা মুখ।' গাছের গুঁড়ির কাঁপুনিটা ধীরে ধীরে থেমে গেল। লোকটাকে গলাধঃকরণ করে সম্ভবত মাটির নীচে চলে গেল সাপটা।

ফাঁকা জমিটার চারপাশেই আগুন লেগে গেছে। অগ্নিবলয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে জমিটা। সুদীপ্তরা আর দেরি করলে এ জায়গা ছেড়ে বেরোতে পারবে না। এরপর তারা ছুটল মাটিতে পড়ে থাকা রবার্টের কাছে। মাটিতে পড়ে আছে অবসন্ন রবার্ট, চোখ বন্ধ। ইদ্‌জেল নীচু হয়ে বসে, তার মুখ ফাঁক করে বোতল থেকে কুমিরের রক্তটা ঢেলে দিল তার মুখে। কিছুটা চেতনা ফিরল তার। কাশতে কাশতে সে চোখ খুলল। তবে সে তখনও স্বাভাবিক নয়, দাঁড়াবার শক্তি তার নেই, শরীর কাঁপছে। শুধু চোখের ঘোলাটে ভাবটা সামান্য কেটেছে। চারদিক থেকে আগুন যেন ঘিরে ধরতে চাচ্ছে, পালাতে হবে। ইদ্‌জেল মাটি থেকে রবার্টের দেহটা তার কাঁধে তুলে নিল। সবাই মিলে ছুটতে শুরু করল সেই অগ্নিব্যূহর বাইরে যাবার জন্য। ঠিক যে পথে তারা জমিটাতে ঢুকেছিল সে পথেই। কিন্তু জায়গাটা ছেড়ে বেরোবার মুখেই আবার তাদের থামতে হল। সেই হতভাগ্য বৃদ্ধ মকোড়ো তখনও মরেনি। দুর্বোধ্য ভাষায় সে কী যেন বলে চলেছে। তবে তাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার শেষ মুহূর্ত আসন্ন। তাকে উঠিয়ে নিয়ে আর কোনও লাভ নেই। হেরম্যান ইদ্‌জেলকে

বলল, 'ওকে জিগ্যেস করো, মানুষখেকো গাছ বলে কি তবে সত্যিই কিছু নেই?'

ইদ্‌জেল প্রশ্নটা করল, অতিকষ্টে সে জবাব দিল, 'ও গাছ সত্যিই ছিল। গতবার দাবানলে পুড়ে গেছিল গাছটা। এখন গুঁড়িটাই শুধু আছে। নিজের ক্ষমতা দেখাবার জন্য সবাইকে এখন বোকা বানাচ্ছে শয়তান গোকো। সাপ পুষছে সে। আমাকে জল দাও জল...হাপরের মতো ওঠা-নামা করতে শুরু করেছে লোকটার বর্শাবিদ্ধ বুকটা। সুদীপ্ত তাড়াতাড়ি লোকটার মুখে বোতল থেকে জল ঢেলে দিল। ঢোক গিলল লোকটা। তারপর তার শেষ কথা বলল, 'আছে, আছে এ জঙ্গলে সত্যি ওগাছ আরও আছে। আমি দেখেছি...' একটা হেঁচকি তুলে এরপর থেমে গেল সেই মকোডো বৃদ্ধর কথা। হেরম্যান হাত দিয়ে তার চোখের পাতা বুজিয়ে দিলেন। সুদীপ্তরা আবার এগোতে লাগল।

কিন্তু গাছের প্রাচীরের ওপাশেও যে পথ ধরে তারা এসেছে, সেদিকেও যে দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে। কোনদিকে যাবে তারা? একদিকে একটা অংশে শুধু আগুন লাগেনি। চেনা পথ ছেড়ে সেদিকেই জঙ্গলের মধ্যে এগোল তারা। বেশি দ্রুত ছোটা যাচ্ছে না। ইদ্‌জেলের কাঁধে রবার্ট। কিছুক্ষণের মধ্যে সে বনেও আগুন লাগল। দাবানল অনুসরণ করল সুদীপ্তদের। বাতাস বইছে, দ্রুত এগিয়ে আসছে আগুন। সবদিকেই দূর থেকে দেখা যাচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখা, মাথার ওপরের আকাশ ঢেকে যাচ্ছে ঘন কালো ধোঁয়ায়। এরই মধ্যে দিয়ে দিক্‌ভ্রান্ত সুদীপ্তরা অনেকটা পথ অতিক্রম করলেও আগুন তাদের পিছু ছাড়ছে না। এক সময় তাদের মনে হতে লাগল, তারা আর জঙ্গল থেকে বেরোতে পারবে না, গোকোর মতো তাদেরও একই পরিণতি হবে! ঠিক এই সময় হঠাৎ একটা বেশ বড় লেমুর দেখতে পেল সুদীপ্তরা। একটু শ্লথভাবেই কখনও গাছের এক গুঁড়ি থেকে অন্য গুঁড়িতে লাফিয়ে, কখনও বা লতা ধরে এগোচ্ছে প্রাণীটা। দাবানল নিয়ে যেন খুব বেশি ভীত নয় প্রাণীটা। তাকে দেখামাত্রই ইদ্‌জেল বলল, 'লেমুরটাকেই অনুসরণ করতে হবে। ও নিশ্চয়ই আগুন থেকে মুক্তির রাস্তা জানে। লেমুররা নিজেদের দাবানল থেকে বাঁচাতে পারে।'

বনের ব্যাপারে ইদ্‌জেলের অভিজ্ঞতা সুদীপ্তদের থেকে বেশি। তাই তার নির্দেশই পালন করল তারা। লেমুরটাকে অনুসরণ করা শুরু হল এরপর। আগুন সুদীপ্তদের পিছু না ছাড়লেও সত্যিই প্রাণীটা চারপাশে আগুনের ভিতর দিয়ে পথ খুঁজে তাদের এগিয়ে নিয়ে চলল। ঘণ্টাখানেক চলার পর আগুনকে বেশ কিছুটা পিছনে ফেলে জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে এল তারা। তাদের সামনে হাত পঞ্চাশেক ফাঁকা জমি তারপর একটা নদী। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হচ্ছে নদীটা। নদীর চরে পড়ে আছে অসংখ্য কাঠের গুঁড়ি, গাছের ডাল। বর্ষার সময় সেগুলো সম্ভবত ভেসে এসে নদীর এই বাঁকের মতো জায়গার চরাতে জমা হয়েছে। তাদের কোনওটা মাটিতে শুয়ে অথবা কোনওটা মাটিতে গাঁথা অবস্থায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গুঁড়িগুলোর মাথায়, গায়ে ছোটখাটো উদ্ভিদ জন্মেছে। সম্ভবত বর্ষার সময় নদীর এই চরটা জলের তলায় চলে যায়। ইদ্‌জেল বলল, 'এটা ম্যাঙ্গকি নদীর কোনও শাখানদী হবে।' এরপর সে মাটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবে এখানে কুমির নেই। থাকলে নদীর চরে ভেজা মাটিতে ওদের বুক ঘসটানোর দাগ থাকত।' কথাগুলো বলে সে মাটিতে নামাল রবার্টকে। উঠে বসল রবার্ট, তারপর সুদীপ্তর হাত ধরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার চোখের দৃষ্টি আর ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠা হাসি বুঝিয়ে দিল দুর্বল হলেও হুশ ফিরে পেয়েছে সে। কুমিরের লবণাক্ত রক্তে জাদুকর গোকোর ওষুধের প্রভাব কেটে গেছে। সুদীপ্ত হেসে তাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি তোমার মকোডো গ্রামে ফিরে যাবে নাকি?'

রবার্ট এবার তার নিজের পোশাকের দিকে খেয়াল করে লজ্জিতভাবে বলল, 'না, যাব না।'

হেরম্যান ইদ্‌জেলকে বললেন, 'এবার আমার ফিরব কীভাবে?'

ইদ্‌জেল একটা লম্বা লাঠির মতো গাছের ডাল কুড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে নদীতে নামল। কিছুক্ষণ পর উঠে এসে যে বলল, 'নদীটা বেশি গভীর না হলেও বেশ স্রোত আছে। এখানে অনেক কাঠ পড়ে আছে, আমাদের সঙ্গে নাইলনের লম্বা দড়ি আর ছুরিও আছে। ভেলা বানাতে হবে। স্রোত আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এসব নদীর ধারে ছোট ছোট

গ্রাম থাকে। মকোডোর মতো গ্রাম নয়, মোটামুটি সভ্য গ্রাম, আমাদের গ্রামের মতো। তারই কোনও একটাতে থামব আমরা। সেখান থেকে নিশ্চয়ই ফেরার পথ পাওয়া যাবে।'

ইদ্‌জেলের কথামতো অশক্ত রবার্টকে নদীর চরে আরও বিশ্রাম নেবার জন্য বসিয়ে সুদীপ্তরা তিনজন গাছের ডাল, গুঁড়ি সংগ্রহ করে ভেলা বানাবার কাজে মন দিল। ঘণ্টাখানেক সময় লাগল সে কাজ শেষ হতে।

ভেলা যখন জলে নামানো হল তখন বিকেল হয়ে গেছে। দিনশেষের আলো এসে পড়েছে নদীর চরে, সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, শুয়ে থাকা, জলে ভেসে আসা গাছের গুড়িগুলোর ওপর। দূরে সুদীপ্তদের ফেলে আসা জঙ্গলের মাথায় কালো মেঘ। দাবানল ছারখার করে চলেছে একের পর এক জঙ্গল। তবে মকোডো গ্রামের অবস্থান কোন দিকে তা ঠিক অনুমান নেই সুদীপ্তদের। তার অবস্থান হারিয়ে গেছে তাদের কাছে।

সেই অগ্নিবলয়, সেই অভিশপ্ত জঙ্গল, সেই নদীচরকে বিদায় জানিয়ে এক সময় ভেলায় উঠে পড়ল সুদীপ্ত, হেরম্যান আর রবার্ট। কোমরজলে নেমে নদীর পাড় বরাবর ভেলাটাকে স্রোতের অভিমুখে ঠেলতে শুরু করল ইদ্‌জেল। ভেলা স্রোতে পড়লেই সে উঠে পড়বে তাতে। ভেলা ঠেলতে ঠেলতেই ইদ্‌জেল হঠাৎ বলল, 'আরে ওই দেখুন সেই লেমুরটা। ও মনে হয় জঙ্গল থেকে আমাদের শেষ বিদায় দেবার জন্য বেরিয়ে এল।'

সুদীপ্তরাও দেখতে পেল তাকে। হ্যাঁ, সেই লেমুরটাই। নদীর চরে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির একটার থেকে আর একটায় সে লাফিয়ে যাচ্ছে। সম্ভবত গুঁড়িগুলোর গায়ে, মাথায় যে উদ্ভিদ জন্মেছে সেখানে খাবারের সন্ধান করছে প্রাণীটা। সুদীপ্তরা তখন প্রায় স্রোতের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। লেমুরটা ঠিক তখন গিয়ে বসল নদীর চরে জঙ্গলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা ফুট পাঁচেক লম্বা গুঁড়ির ওপর। মাটিতে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গুঁড়িটার মাথা থেকে পাতা নেমে এসেছে নীচের দিকে। লেমুরটা গুঁড়িটার মাথায় বসতেই এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটল। নিরীহ পাতাগুলো হঠাৎই যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। লম্বা লম্বা পাতাগুলো নাগপাশে জড়িয়ে

ধরল লেমুরটাকে। ছটফট করলেও প্রাণীটা নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছে না সেই মৃত্যুবন্ধন থেকে। মাদাগাস্কারের নরখাদক গাছের কবলে আটকে পড়েছে অসহায় লেমুর। হেরম্যান বলতে যাচ্ছিলেন 'ভেলা থামাও'। কিন্তু তার আগেই ভেলাটা প্রচণ্ড দুলে উঠল। স্রোতে এসে পড়েছে ভেলা। আর থামার উপায় নেই। ইদ্‌জেল লাফিয়ে উঠে বসল ভেলাতে। সুদীপ্তরা শেষমুহূর্তে দেখতে পেল লেমুরটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে গাছটার ভিতর। তারপরই সুদীপ্তদের ভেলাটা বাঁক নিয়ে তীব্রগতিতে ছুটে চলল স্রোতের অভিমুখে। বাঁকের আড়ালে হারিয়ে গেল অজানা নদীচরে দাঁড়িয়ে থাকা মাদাগাস্কারের সেই নরখাদক গাছ। স্রোতে ভাসতে ভাসতে হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, আবার একবার কোনও সময় আমরা আসব এখানে। দাবানল যতই হোক কোনও একটা গাছ কি তখনও বেঁচে থাকবে না? কী আসবে তো?'

সুদীপ্ত জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আসব।'

আর সুদীপ্ত, হেরম্যানকে একটু অবাক করে দিয়ে রবার্ট তার বিহ্বলতা কাটিয়ে বলে উঠল, 'আমাকে কিন্তু তোমরা সঙ্গী করতে ভুলো না।'





নেকড়ে খামার

গাড়িতে বসে খাড়া পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতেই অনীশ 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ' অরগানাইজেশনের দেওয়া ফাইলটাতে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিল। 'হিমালয়ান উল্‌ফ রিহ্যাবিলেটেশন ক্যাম্প' বা 'নেকড়ে খামার'-টার সম্বন্ধে নানা তথ্য দেওয়া আছে এই ফাইলটাতে। এমনকী প্রাণীগুলোর ছবি, খামার মালিক ভন ভাইমার ও তাঁর কর্মচারীদের ছবি, সরকারি চিঠিপত্র সবই সংযোজিত আছে তার মধ্যে।

মিস্টার ভাইমার আর সরকারের মধ্যে যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছে তা দেখে অনীশ একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে সরকার মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে প্রাণীগুলোকে মারার। তাই মিস্টার ভাইমার একটা শেষ চেষ্টা করেছেন 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ'কে একটা চিঠি দিয়ে প্রাণীগুলোকে বাঁচাবার। আর এই চিঠিটার জন্যই কিছুটা হলেও থমকেছে সরকার। তারাও তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগে প্রাণীগুলোর সম্বন্ধে 'বিশ্ব বন্য প্রাণ' সংস্থার মতামত জানতে চেয়েছেন। সংস্থা তাই এদেশে তাদের সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে অনীশকে নেকড়ে খামারটাতে পাঠাচ্ছে সরেজমিনে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবার জন্য।

সরকার পক্ষকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না তেমন। হিমালয়ান মাউন্টেন উল্‌ফ বা তুষার নেকড়ে যদি মানুষ মারে তবে সে যত দুষ্প্রাপ্য প্রাণী হোক না কেন তার জীবনের দাম গ্রামবাসীদের জীবনের চেয়ে বেশি নয়। তবে সরকারি তরফে নেকড়েগুলোকে মারতে চাওয়ার পিছনে নাকি আসল কারণ অন্য। সেটা অবশ্য এ ফাইলে লেখা নেই, থাকার কথাও নয়। অনীশেরই ওয়াইল্ড লাইফ নিয়ে কাজ করা এক সহকর্মী খবরটা কীভাবে যেন সংগ্রহ করেছে স্থানীয় এক সেনা অফিসারের কাছ থেকে। সেই সহকর্মী অনীশকে জানিয়েছে যে ওই তুষার নেকড়েগুলোকে

নিয়ে নাকি সীমান্তরক্ষীদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আসলে সরকার এ ব্যাপারটা নিয়েই বেশি ভাবিত। কিন্তু মুখে প্রকাশ করতে পারছে না ব্যাপারটা। এ অঞ্চল দেশের অন্যতম দুর্গম ও উত্তেজনা প্রবণ সীমান্ত অঞ্চল। তাই সরকার কোনও অবস্থাতেই চায় না যে-কোনও কারণেই এখানকার সীমান্তরক্ষীদের কাজের সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটুক।

ফাইলটা দেখছিল অনীশ। তার চিন্তাজাল ছিন্ন হল ড্রাইভার পবন বাহাদুরের কথায়—'স্যার, আমরা এখন নাথুলাপাসে। প্রায় চোদ্দ হাজার ফিট ওপরে উঠে এসেছি আমরা।'

ফাইল থেকে মুখ তুলে বাইরের দিকে তাকাল অনীশ। সত্যিই অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে অনীশ। নীল আকাশের বুকে উঠে গেছে উত্তুঙ্গ পর্বতশ্রেণি। তাদের বরফমোড়া কিরীটগুলো সূর্যালোকে ঝলমল করছে। নীচের ধাপের পাহাড়গুলোর মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে গিরিবর্ত। যে জায়গাতে গাড়িটা এসে পৌঁছেছে সে জায়গা একটু সমতল। অনেক লোকজন, ট্যুরিস্ট গাড়ির ভিড় সেখানে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে চলেছে। গাড়িগুলো সব মুখ ঘুরিয়ে নীচে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ড্রাইভার আঙুল তুলে কিছুটা দূরে একটা ছোট পাহাড়ের মাথা দেখিয়ে বলল, 'ওটাই হল, টিবেট, চায়না। ওখানে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা যে সব লোকজনকে দেখতে পাচ্ছেন তারা হল-'পিপিলস্ লিবারেশন আর্মি থব চায়না' অর্থাৎ চীনা সেনাবাহিনী। আর তার উলটোদিকের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ভারতীয় সেনারা।'

অনীশ জানতে চাইল 'আমরা যে জায়গাটাতে যাব সে জায়গাটা এখান থেকে কতদূর?'

পবন বলল, 'ও জায়গাটা রেশমপথের ভিতর। আরও ওপরে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার ভিতরে। স্থানীয় লোক ছাড়া ট্যুরিস্টদের ওখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। রাস্তার এক পাশে চায়না, অন্য পাশে ইন্ডিয়া। ওই নেকড়ে খামারটা আর একটাই ছোট গ্রাম আছে সেখানে।'

কথা বলতে বলতে ট্যুরিস্ট গাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে অনীশদের গাড়িটা গিয়ে থামল একটা চেকপোস্টের সামনে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা।

গাড়ি থেকে নামতে হল অনীশদের। তাদের গাড়ির উইন্ড শিল্ডে আটকানো ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ অরগানাইজেশনের লোগো দেখে সেটা চিনতে পেরে এক অফিসার এগিয়ে এলেন। সরকারের পক্ষ থেকে অনীশদের সে জায়গাতে যাবার খবর আগাম তাদের কাছেও ছিল। অনীশের কাগজপত্র আর তাদের কাগজ মিলিয়ে দেখে আশ্বস্ত হবার পর চেকপোস্ট খুলে দিল তারা। অনীশদের গাড়ি প্রবেশ করল ভিতরে।

রেশমপথ! সিল্করুট! নামটা শুনলেই কেমন যেন রোমাঞ্চ হয় মনের ভিতর। কত হাজার বছরের প্রাচীন এই বাণিজ্যপথ। হাজার হাজার বছর ধরে এ পথ বেয়েই দু-দেশের মধ্যে বাণিজ্য আর সংস্কৃতির লেনদেন হয়েছে। কত ইতিহাস জড়িয়ে আছে এ পথের সঙ্গে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাং-ও একদিন এ পথে হেঁটেছিলেন।

অনীশও বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করল প্রথম এ পথে প্রবেশ করে। সর্পিল গিরিবর্ত এঁকে বেঁকে উঠেছে ওপর দিকে। কখনও রাস্তার দু-পাশেই পাহাড় আবার কখনও অতলান্ত খাদ।

পাহাড়ের মাথাগুলোতে কিছুটা তফাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আছে দু-দেশের সীমান্তরক্ষীরা। হাতে তাদের স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র, ইস্পাত কঠিন মুখ। ঠিক যেন পাথরের মূর্তি তারা। আর্মির গাড়ি ছাড়া এ পথে অন্য কোনও গাড়ি নেই। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছু লোকজন চোখে পড়ছে। ঘোড়া, খচ্চর বা গাধার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা। স্থানীয় লোকজন সব। ড্রাইভার জানাল ওই সব বস্তায় আর্মির জন্য রেশন যাচ্ছে।

অনীশ জানতে চাইল, 'এই রেশম পথে এখনও বাণিজ্য হয়?'

পবন বলল, 'হ্যা, হয়। উনিশশো বাষট্টির চীন-ভারত যুদ্ধের পর বহুদিনের জন্য এ পথ বন্ধ ছিল। তারপর বছর কুড়ি হল আবার এ পথ খুলেছে। সপ্তাহে এখন দু-দিন এ পথ খোলা থাকে। তবে সীমান্তে উত্তেজনা থাকলে পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়।'

অনীশ প্রশ্ন করল, 'আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানকার গ্রামে কারা

থাকে? কী করে তারা?'

ড্রাইভার বলল, 'ওটা তিব্বতী শরণার্থীদের গ্রাম। যুদ্ধের সময় ওপার থেকে এসেছিল ওরা। যদিও তারা এখন এ দেশেরই নাগরিক। ওরা পশুপালন করে, উল বোনে। পাইন বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে। এভাবেই দিন চলে ওদের।'

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল অনীশদের গাড়ি। রাস্তায় লোকজনের চলাচল, আর্মি গাড়ির যাতায়াতও হারিয়ে যেতে লাগল তার সঙ্গে সঙ্গে। আর তার সঙ্গে বাড়তে লাগল কনকনে ঠান্ডা বাতাসের দাপট। তীব্র শিস-এর মতো শব্দ করে বাতাস বইছে কোথাও কোথাও। গিরিবর্তের গা-গুলোর অধিকাংশ জায়গা নেড়া রুক্ষ হলেও মাঝে মাঝে পাইনবন আছে। ছোট হলেও বনগুলোর ভিতর আলো প্রবেশ করতে পারে না। এত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে সূর্যালোক ভিতরে প্রবেশ করে না। ঝিঁঝি পোকার অবিশ্রান্ত কলতান ভেসে আসছে সেখান থেকে।

ড্রাইভার বলল, 'আমরা যে পথ ধরে যাচ্ছি সে পথ কিন্তু একেবারে তিব্বতের রাজধানী লাসায় গিয়ে মিশেছে। তবে এই মূল রাস্তা ধরে আরও কয়েকটা পথ বেরিয়েছে। সেগুলোও একটু ঘুরপথে তিব্বতের নানা জায়গাতে পৌঁছেছে।

ঘণ্টাখানেক চলার পর এক জায়গাতে পথের বাঁকে মুহূর্তের জন্য গাড়িটা থামাল ড্রাইভার। দুটো পাহাড়ের ফাঁক গলে আরও উঁচুতে একটা জায়গা দেখাল সে। কুয়াশা ঘেরা আবছা একটা কালো জায়গা।

সেটা দেখিয়ে সে বলল, 'ওখানেই যাব আমরা। বনটা দেখা যাচ্ছে। ওই বনের গা বেয়েই বরফের পাহাড় উঠে গেছে। তাই ওখানে সবসময় বেশ ঠান্ডা আর কুয়াশা থাকে। এই রাস্তা ছেড়ে বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকতে হয় ওখানে যেতে হলে।'—এই বলে সে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল।

সময় এগিয়ে চলল। বেলা পড়ে আসছে ক্রমশ। জনশূন্য গিরিবর্ত বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠে চলেছে গাড়ি। মাঝে মাঝে নীচের দিকে তাকালে

চোখে পড়ছে পিছনে ফেলে আসা নীচের পাকদণ্ডীগুলো। যাত্রাপথে আরও এক জায়গাতে থামতে হল অনীশদের। এ জায়গাটাই নাকি এদিকের সীমান্তের শেষ চেকপোস্ট। সেখানে কাগজপত্র পরীক্ষা হবার পর আবার চলতে শুরু করল গাড়ি। বেলা চারটে নাগাদ প্রধান রাস্তা ছেড়ে একটা ছোট শুঁড়ি পথ ধরল গাড়িটা। দু-পাশে পাহাড়ের ঢালে গভীর পাইনবন। মাঝে মাঝে পায়ে চলা পথ উঠে গেছে বনের ভিতরে।

ড্রাইভার বলল, 'আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি স্যার। আমাদের ডানপাশের পাহাড়টা ভারতের আর বাঁ-পাশেরটা চীনের। এ রাস্তাটাকে আপনি 'নো-মেনসল্যান্ড' বলতে পারেন। তিব্বতীদের গ্রামটা রয়েছে আর একটু এগিয়ে জঙ্গলের পিছনে। আর নেকড়ে ফার্মটাও সামনেই।'

ড্রাইভারের কথা কিছুক্ষণের মধ্যেই সত্যি বলে প্রমাণিত হল। পাকদণ্ডী বেয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে দীর্ঘ যাত্রা শেষে থামল অনীশদের গাড়িটা।

গাড়ি থেকে নামল অনীশ। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে একটা সমতল জায়গা। রাস্তার যে পাশে চীনের সীমানা সে দিকের পাহাড়টা এত খাড়া যে ওপরে ওঠার রাস্তা নেই। আর রাস্তার ডানপাশে বেশ অনেকটা জমি ঘন সন্নিবিষ্ট কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। উচ্চতায় অন্তত দশফুট উঁচু হবে সেই বেড়াটা। আর তার মাঝে মাঝে পাইন গাছের খুঁটি। ফাঁকা জমিটার মাঝখানে রয়েছে ঢালু টিনের ছাদঅলা লম্বাটে একটা কাঠের বাড়ি। সেটা দেখতে অনেকটা সেনা বেরাকের মতো। বাড়িটার পিছন থেকেই উঠে গেছে বরফের চাদর মোড়া পাহাড়। অনীশদের যাত্রাপথের পাশের পাইনবনটাও এসে মিশেছে জমিটার গায়ে।

গাড়ি থেকে নামার পর অনীশ জানতে চাইল, 'গ্রামটা দেখা যাচ্ছে না তো! সেটা কোথায়?'

ড্রাইভার বলল, 'সেটা এ জায়গার একটু কোনাকুনি। পাইনবনের পিছনের ঢালে। পায়ে হেঁটে সেখানে যেতে হয়। আপনি আগে সেখানে যাবেন নাকি?'

অনীশ বলল, 'না, না, আমি এখন এই বাড়িটাতেই যাব। তবে কাল গ্রামেও যেতে হবে। লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাই খোঁজ

নিলাম তোমার কাছে। তুমি কি আমার সঙ্গে এখানে রাত কাটাবে?'

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'না স্যার। গ্রামে আমার একজন চেনা লোক আছে। আমি সেখানেই থাকব। ফোন করলে দশ মিনিটের মধ্যেই হাজির হয়ে যাব। গাড়িটা এখানেই থাকবে।'

তার কথাটা শুনে অনীশ মনে মনে ভাবল, ব্যাপারটা ভালোই হবে তাহলে। গ্রামবাসীদের মনোভাবের খবর সংগ্রহ করা যাবে লোকটার থেকে। সঙ্গের ব্যাগপত্র নিয়ে অনীশ এরপর এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা জমিটার প্রবেশমুখে। দরজাটাও কাঁটা তারে ঘেরা। তার একপাশে খুঁটির গায়ে বিপদচিহ্ন আঁকা সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'হিমালয়ান উলফ রিহ্যাবিলেটেশন 'ফার্ম', নাথুলা পাস, সিকিম, ইন্ডিয়া।'

প্রবেশ তোরণের পাশেই কাঠের তৈরি একটা ছোট্ট ঘর। অনীশ তোরণের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই ঘরটা থেকে বাইরে বেরিয়ে এল একজন। তার পরনে একটা লং কোট, মাথায় হ্যাট, পায়ে হাই হিল বুট। তার মুখমণ্ডলের রং লালচে ধরনের। চিবুকে দাঁড়িও রয়েছে। মাঝবয়েসি সুঠাম চেহারার সেই বিদেশি ভদ্রলোককে অনীশ দেখেই চিনতে পারল। লোকটার ছবি রয়েছে ফাইলে। ইনিই নেকড়ে খামারের মালিক ভন ভাইমার।

ভদ্রলোক অনীশকে দেখতে পেয়ে একটু খুঁড়িয়ে হেঁটে এসে পকেট থেকে চাবি বার করে দরজাটা খুললেন। তারপর তার দস্তানা পরা হাতটা করমর্দনের জন্য অনীশের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আসুন, আসুন। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি।'

অনীশ করমর্দন করে ভিতরে প্রবেশ করল। দরজার তালাটা বন্ধ করতে করতে ভদ্রলোক বললেন, 'কীভাবে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব জানি না। কত দূর থেকে কত কষ্ট করে আপনি এখানে ছুটে এলেন। আপনারা যে আমার ডাকে শেষ পর্যন্ত সাড়া দেবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি।'

অনীশ বলল, 'ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই। আমরা বন্যপ্রাণকে ভালোবাসি। তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করি। এটা আমাদের কাজের মধ্যে পড়ে।'

দরজাটা বন্ধ করার পর অনীশকে নিয়ে বাড়িটার দিকে এগোলেন ভাইমার। সেদিকে এগোতে এগোতে অনীশ জানতে চাইল, 'এ বাড়িটা কি আপনি বানিয়েছেন বা কিনেছেন?'

ভাইমার বললেন, 'না। এ বাড়িটা একসময় তিব্বতী শরণার্থী শিবির ছিল। পরে ওরা এ বাড়ি ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। বাড়িটা পরিত্যক্ত ছিল। আমি বাড়িটা মেরামত করে নিই। বাড়িটা নেবার সময় সরকারের সঙ্গে ছোটখাটো একটা চুক্তিও হয়েছিল। তখন সরকার উৎসাহও দিয়েছিল এ কাজে। কিন্তু এখন...। কথাটা শেষ করলেন না ভাইমার।

বাড়িটার সামনে টানা লম্বা বারান্দা। কাঠের মেঝে, কাঠের দেওয়ালঅলা সারবাঁধা ছোট ছোট ঘর। কয়েকটা ঘর তালা বন্ধ, কয়েকটা খোলা। অনীশকে নিয়ে বারান্দায় উঠে তেমনই একটা ঘরে প্রবেশ করলেন ভাইমার।

ঘরটা মনে হয় তার অফিস ঘর। একটা টেবিল ঘিরে বেশ কটা গদি আঁটা চেয়ার। দেওয়ালে ঝুলছে ফ্রেমে বাঁধানো বেশ কয়েকটা ওয়াইল্ড লাইফের ছবি। তার মধ্যে ভাইমারের চেয়ারের ঠিক পিছনের ছবিটা একটা হিমালয়ান উলফের। একটা কাচ ঢাকা আলমারিও আছে ঘরে। সেটাও ওয়াইল্ড লাইফ সংক্রান্ত বইপত্রে ঠাসা।

নিজের চেয়ারে বসলেন ভাইমার। অনীশ তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে। সেখানে বসার পর একটা রাইফেলও চোখে পড়ল অনীশের। যে দরজা দিয়ে সে ভিতরে প্রবেশ করেছে তার গা ঘেঁষেই দেওয়ালের গায়ে টাঙানো আছে সেটা।

বেশ কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসে রইল তারা দু-জন। বাইরে বিকাল নেমে এসেছে। আলো মরে আসছে। আধো অন্ধকার ঘর। মিস্টার ভাইমারই প্রথম মুখ খুললেন। তিনি বললেন, 'আপনি নিশ্চই সব ব্যাপারটাই মোটামুটি জেনেছেন আমার চিঠি আর কাগজপত্রের মাধ্যমে। এখন হয়তো আপনার রিপোর্টের ওপরই নির্ভর করছে প্রাণীগুলোর ভবিষ্যৎ।'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ, মোটামুটি জানি। গ্রামের লোক সরকারের কাছে

অভিযোগ জানিয়েছে আপনার নেকড়েগুলো এ জায়গা থেকে বেরিয়ে মানুষ মারছে বলে। আপনার চিঠি থেকে জেনেছি তারা নাকি একবার কিছুদিন আগে হামলাও চালিয়েছিল এ জায়গাতে। প্রাণীগুলো কোথায় থাকে?'

ভাইমার বললেন, 'ওরা এখানেই থাকে। বাড়ির পিছনে কয়েকটা লোহার গরাদঅলা পাথরের ঘরে। ওরা এ চত্বর ছেড়ে বা খাঁচার বাইরে কোনওদিন যায়নি। কোনও গ্রামবাসীকে মারেনি।'

অনীশ বলল, 'গ্রামবাসীরা কি তবে মিথ্যা কথা বলছে? গত ছয় মাসে নাকি চারটে দেহাবশেষ উদ্ধার করেছে তারা? সরকারের কাছে এমনই রিপোর্ট আছে।'

ভাইমার বললেন, 'যে দেহাবশেষগুলো পাওয়া গেছে তাদের কেউ গ্রামবাসী নয়। তাদের চিহ্নিত করা যায়নি। এমনই ক্ষতবিক্ষত ছিল দেহগুলো। তারা মিথ্যা আতঙ্কিত হচ্ছে। আমার ক্যাম্পের কোনও প্রাণী সে কাণ্ড ঘটায়নি। তারা বাইরে যায় না। খাঁচা ঘরে থাকে।'

অনীশ একটু বিস্মিতভাবে বলল, 'তারা গ্রামবাসী নয় তা আমার জানা ছিল না। তবে মৃত মানুষগুলো কারা? কে মারল সেই লোকগুলোকে?'

ভাইমার পালটা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যখন ওয়াইল্ড লাইফ অরগানাইজেশনের লোক, তখন নিশ্চই এই হিমালয়ান উল্ফ বা টিবেটিয়ান উল্ফের ব্যবহার, খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে কিছুটা জানা আছে আপনার?'

অনীশ জবাব দিল, 'যদিও আমি এদের নিয়ে তেমন কাজ করিনি তবে কিছুটা জানি। দুষ্প্রাপ্য প্রাণী। গায়ে বড় বড় রোম আছে। ধূসর এবং সোনালি রঙের। সাদা রঙেরও হয়। যে কারণে নানা নাম আছে এদের। কেউ বলেন 'টিবেটিয়ান গ্রে উল্ফ', কেউ বলেন 'গোল্ডেন উল্ফ' আবার কেউ বলেন 'স্নো-উল্ফ'। সাধারণত খরগোশ ইত্যাদি ছোটখাটো প্রাণী শিকার করে এই নেকড়েরা। কখনও কখনও দলবদ্ধভাবে হরিণ বা পাহাড়ি ছাগল জাতীয় প্রাণী অর্থাৎ ঘুরালও শিকার করে। অন্য প্রাণীদের মতোই মানুষকেও এড়িয়ে চলে ওরা।'

অনীশের জবাব শুনে ভাইমার একটু খুশি হয়ে বললেন, 'ঠিক তাই। মানুষ ওদের সাধারণ খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে পড়ে না। আত্মরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন না হলে মানুষকে তারা আক্রমণ করে না। এটাই তো গ্রামের মানুষকে বোঝাতে পারছি না।'

অনীশ আবার জানতে চাইল, 'তবে যে মানুষগুলো মরল তারা কারা? কে মারল ওদের? গ্রামের মানুষরাই বা হঠাৎ খেপে গেল কেন?'

ভাইমার একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার ধারণা যে মানুষগুলো মারা গেছে তারা স্মাগলার। যে-কোনও সীমান্তেই চোরা কারবার হয় জানেন তো? সোনা ইত্যাদি অবৈধ পণ্য নিয়ে আসা যাওয়া করে তারা সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে। সব কটা দেহই কিন্তু বনের মধ্যে পাওয়া গেছে। আমার ধারণা কাজটা চিতা বাঘের। মাউন্টেন লেপার্ড। বয়স বা কোনও আঘাত পাবার কারণে সে নরখাদক হয়েছে। তার পায়ের ছাপ দেখেছি আমি। প্রাণীটাকে মারার জন্য সন্ধানও চালাচ্ছি।'

এ কথা বলার পর আবারও একটু চুপ করে থেকে ভাইমার বললেন, 'গ্রামবাসীদের খ্যাপার কারণটা আসলে অন্য। ওদের গ্রামের প্রধান হল নরবু বলে একটা বুড়ো। পশুপালনের ব্যবসা করে সে। একসময় আমি তার কাছ থেকে নেকড়েগুলোর খাবারের জন্য পশু কিনতাম। কিন্তু এখন কিনি সীমান্তের ওপার থেকে আসা তিব্বতীদের কাছ থেকে। তিনভাগ কম দাম। আর এতেই খেপে গেছে বুড়োটা। আর গ্রামের লোককেও সেই খ্যাপাচ্ছে। এটাই হল আসল কারণ।'

অনীশ বলল, 'আপনি তো জার্মানির লোক। এখানে এসে ঘাঁটি গাড়লেন কীভাবে?'

ভাইমার বললেন, 'হ্যাঁ, আমি জার্মানির লোক। বাভারীয় পার্বত্য অঞ্চলে আমার বাড়ি। জার্মানীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জাগস্পিৎজ ওখানেই অবস্থিত। ছোটবেলা থেকেই বন্যপ্রাণীদের প্রতি আমার অসীম মায়া। ওখানকার পার্বত্য অঞ্চলে নেকড়েদের সংরক্ষণের জন্য আমি বেশ কিছু কাজও করেছিলাম আমার নিজস্ব এন.জি.ও-র মাধ্যমে। পাহাড়ি অঞ্চলে

আমার ভ্রমণের শখও প্রবল। এখানে এসেছিলাম পায়ে হেঁটে সিল্করুট অতিক্রম করার জন্য। কিন্তু যাত্রাপথে একদিন চোখে পড়ল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া একটা অর্ধমৃত তুষার নেকড়ে। কোনওভাবে গুলি লেগেছিল প্রাণীটার পিছনের পায়ে। এমন প্রায়শই হয় এখানে। দু-দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলি বিনিময়ে প্রাণ যায় নিরীহ প্রাণীদের। কখনও বা মানুষেরও।

এখন বরফ মোড়া পাহাড়গুলোতেও সীমান্ত সুরক্ষার জন্য ঘাঁটি গাড়ছে দু-দেশের সেনারা। বিশেষত চীন সেনারা তাদের দিকের পাহাড়গুলোতে বহু ঘাঁটি গেড়েছে। বাস্তুচ্যুত হচ্ছে সেখানকার প্রাণীরা। তার মধ্যে টিবেটিয়ান উল্‌ফ অন্যতম। তারা নীচে নেমে আসছে। তারপর মারা পড়ছে গ্রামবাসী বা এ দেশের সীমান্ত রক্ষীদের হাতে।

যাই হোক সেই নেকড়েটাকে আমি তুলে এনে সুস্থ করে তুললাম। তখনই আমার মনে হল আচ্ছা এই দুষ্প্রাপ্য প্রাণীগুলোর জন্য কোনও কাজ করা যায় না? এখানে উপযুক্ত জায়গা পেয়ে আমি খুলে বসলাম এই ক্যাম্পটা। একে একে আমি সংগ্রহ করলাম আরও কিছু নেকড়ে। তাদের অধিকাংশকেই আমি সংগ্রহ করি গ্রামবাসীদের খপ্পর থেকে বা বনের মধ্যে থেকে। তাদের কেউ অনাহারে অথবা আহত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় ছিল। মোট পাঁচটা নেকড়ে আছে আমার এই ক্যাম্পে। ওদের জন্যই দেশ ছেড়ে এতদূরে পড়ে আছি আমি।'

ভাইমারের কথা শুনে অনীশ বলল, 'আপনার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। বুঝতে পারছি প্রাণীগুলোর প্রতি আপনার মমতা অপরিসীম। কিন্তু মুশকিল হল সব মানুষ এ ব্যাপারটা অনুভব করতে পারে না। গ্রামবাসীরা এ ক্যাম্পটা উৎখাত করার জন্য আবেদন জানিয়েছে সরকারের কাছে। এ দেশের বড় চিড়িয়াখানাগুলো অধিকাংশই সমতলে। সেখানে গরমে প্রাণীগুলো বাঁচবে না। পাহাড়ি অঞ্চলের চিড়িয়াখানাগুলো খুব ছোট। সেখানে দু-একটা করে তুষার নেকড়ে আছে। পরিকাঠামোর অভাবে তারা নিতে চাচ্ছে না আপনার প্রাণীগুলোকে। কাজেই...।'

অনীশ তার কথা শেষ না করলেও তার অনুচ্চারিত বক্তব্য বুঝতে

অসুবিধা হল না ভাইমারের। একটু বিষণ্ণভাবে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ জানি। ওরা এই সুন্দর প্রাণীগুলোকে মেরে ফেলতে চায়। দেখুন যদি আপনি কিছু করতে পারেন।'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ এ কথা ঠিকই যে দুষ্প্রাপ্য বন্যপ্রাণীদের মারতে হলে আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ সংস্থার কিছু নিয়মনীতি মানতে হয় সব দেশের সরকারকে। নইলে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক তহবিলের বরাদ্দ অর্থ বন্ধ হয়ে যায়। তবে অনেক দেশ অনেক সময় বিভিন্ন অজুহাতে সে নির্দেশ মানে না। যেমন একবার আফ্রিকার একটা দেশে দশ হাজার হাতি মারার ব্যবস্থা করা হল। আমরা ব্যাপারটা আটকাতে পারিনি। দেখা যাক গ্রামবাসীদের অভিযোগ পত্রটা প্রত্যাহার করানো যায় কিনা? সরকার তো সেটাকেই সামনে রাখছে।'

ভাইমার বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি সে চেষ্টাই করুন। প্রয়োজনে আমি ওদের থেকেই মাংস কিনব। গ্রামের উন্নতির জন্য কিছু অর্থ সাহায্যও করব। এ প্রাণীগুলোকে আমি কিছুতেই মরতে দিতে পারি না।'

বাইরে পাহাড়ের আড়ালে মনে হয় সূর্য ডুবতে বসেছে। দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে বাইরে। ঘরের ভিতরটাও অন্ধকার হয়ে আসছে। নিশ্চুপ হয়ে একটু বিষণ্ণ হয়ে বসে আছেন ভাইমার।

অনীশও বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলল, 'আপনার প্রাণীগুলোকে একটু দেখা যাবে?'

বাইরে দরজার দিকে তাকিয়ে ভাইমার বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। তবে এখন নয়। ওদের ঘরগুলোতে বা এ বাড়িতে আলো নেই। দিনের আলোতে কাল ভালো করে দেখবেন ওদের। অনেকটা পথ এসেছেন, এবার বিশ্রাম নেবেন চলুন। কাল দিনের বেলায় যা করার করবেন।'

কথাটা মিথ্যা বলেননি ভাইমার। গতকাল রাতের ট্রেনে কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল অনীশ। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ও ঘরে চেয়ারে বসার পর বেশ ক্লান্ত লাগছে। ঠান্ডাও লাগছে বেশ।

টেবিলের ওপর একটা সেজ বাতি রাখা ছিল। সেটা জ্বালিয়ে নিয়ে অনীশকে সঙ্গে করে এরপর ঘর ছেড়ে বেরোলেন ভাইমার। বাইরে সূর্য

ডুবে গেছে। দ্রুত অন্ধকারের চাদরে মুড়ে যাচ্ছে চারপাশের পাহাড়, গিরিপথ। বাইরে বেরিয়ে ভাইমারের পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে অনীশ প্রশ্ন করল, 'আপনার অন্য সব লোকজন কোথায়?'

ভাইমার জবাব দিলেন, 'তারা নানা কাজে বাইরে গেছে। এখনই ফিরবে।'

বারান্দা বেয়ে কিছুটা এগিয়ে অনীশকে নিয়ে একটা ঘরে প্রবেশ করলেন ভাইমার। বেশ ছিমছাম সাজানো ঘর। খাট-বিছানা সবই আছে। ঘর সংলগ্ন টয়লেটও আছে। বাতিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে ভাইমার বললেন, 'আপনি বিশ্রাম নিন। আমি এখন যাই। কাল সকালে আবার দেখা হবে। রাতে খাবার দিয়ে যাবে আমার লোক। তবে একটা কথা খেয়াল রাখবেন। রাতে মানুষের গলার শব্দ না শুনলে দরজা খুলবেন না। রাতে আমরা প্রাণীগুলোকে খাঁচার বাইরে বার করে দিই। ওদের সুস্থতার জন্যই এটা প্রয়োজন। যদিও ওরা আমাদের সঙ্গে প্রভুভক্ত কুকুরের মতোই আচরণ করে। আপনাকেও কিছু করবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধানতা অবলম্বন করা ভালো।'

মিস্টার ভাইমার চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে টয়লেটে যাবার পর পোশাক পালটে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল অনীশ। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিল সে। তারপর একসময় কৌতূহলবশত খাট সংলগ্ন জানলার পাল্লাটা খুলল।

পিছনের বরফ পাহাড়টা ধীরে ধীরে আলোকিত হতে শুরু করেছে। অন্ধকার কেটে গিয়ে চাঁদ উঠতে শুরু করেছে। অনীশ তাকিয়ে রইল সেদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদ উঁকি দিল পাহাড়ের আড়ালে। ঠিক সেই মুহূর্তে যেন কেঁপে উঠল বাড়িটা। নেকড়ের ডাক! একযোগে ডেকে উঠল প্রাণীগুলো। চাঁদ ওঠার কারণেই রাত্রিকে আহ্বান জানিয়ে। চাঁদের সঙ্গে একটা আদিমতার সম্পর্ক আছে। নেকড়ে শেয়াল জাতীয় প্রাণীরা চাঁদ উঠলেই সেদিকে তাকিয়ে ডেকে ওঠে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল সে ডাক।

তারপর একসময় থেমে গেল। বেশ ঠান্ডা বাতাস আসছে জানলা

দিয়ে। কাজেই জানলা বন্ধ করে অনীশ আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। রাত আটটা নাগাদ দরজায় টোকা দেবার শব্দ হল। তার সঙ্গে একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'স্যার খাবার এনেছি।'

দরজা খুলল অনীশ। চীনাম্যানের মতো একটা লোক খাবারের পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে। সমতলের লোকদের চোখে অবশ্য চীনা, নেপালি, ভুটিয়া ইত্যাদি পাহাড়ি লোকদের একইরকম দেখতে লাগে। ঘরে ঢুকে টেবিলে খাবারের পাত্রগুলো নামিয়ে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল অনীশ। টেবিলে সে রেখে গেছে রুটি আর ধোঁয়া ওঠা মুরগির মাংস। খাওয়া সেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিছানায় চলে গেল অনীশ। ঘুম নেমে এল তার চোখে। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝেই যেন সে শুনতে লাগল বাইরে থেকে ভেসে আসা নেকড়ের ডাক।

২

অনীশের যখন ঘুম ভাঙল তখনও ভোরের কুয়াশা কাটেনি। জানলাটা একটু ফাঁক করে সে দেখল বাইরেটা পুরো কুয়াশায় মোড়া। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে তার কর্মপন্থা ঠিক করে নিল। তিনটে দিন সে এখানে কাটাতে পারবে। তার মধ্যেই তাকে যা করার করতে হবে। এদিনের কর্মপন্থা হিসাবে সে ঠিক করে নিল আজ প্রথমে সে প্রাণীগুলোকে দেখবে। তারপর গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের বক্তব্য শুনবে। এ জায়গার চারপাশটাও সম্ভব হলে ঘুরে দেখবে সে।

পরিকল্পনা শেষ করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল সে। মিনিট দশেক সময় লাগল তার তৈরি হতে। তার মধ্যেই দরজায় টোকা পড়ল। চা নিয়ে এসেছে একজন। কালকের লোকটা নয়, অন্য একটা লোক। যদিও তার চেহারাও একই রকম। সেও তিব্বতী বা সিকিমিজ হবে। লোকটা চা দিয়ে চলে যাবার পর দরজাটা খোলাই রেখেছিল অনীশ। বাইরের কুয়াশা এবার ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করেছে। অনীশের চা-পানের

কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন ভাইমার। অনীশকে দেখে তিনি বললেন, 'সুপ্রভাত। আশা করি রাতে ঘুম ভালো হয়েছে?'

অনীশও সুপ্রভাত জানিয়ে হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ঘুম ভালো হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে আপনার পোষ্যদের ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম। চলুন এবার তাদের দেখতে যাব। আমি তৈরি হয়েই আছি।'

ভাইমার বললেন, 'হ্যাঁ, চলুন, তাদের দেখাতে নিয়ে যাব বলেই এসেছি আমি।'

ঘর ছেড়ে বেরোল অনীশ। কুয়াশা অনেকটাই কেটে গেছে। প্রভাতি সূর্যকিরণে ঝলমল করছে বরফমোড়া পাহাড়ের শিখরগুলো। শুধু পাশের পাইনবনটা তখনও পাতলা কুয়াশার চাদরে ঢাকা। কিন্তু বাড়িটার সামনে ফাঁকা জমিটার দিকে তাকিয়ে অনীশ বেশ অবাক হয়ে গেল। ছিট ছিট সাদা বিন্দুতে ছেয়ে আছে সারা জমিটা। অনীশ কিছু প্রশ্ন করার আগেই ভাইমার বললেন, 'কাল রাতে তুষারপাত হয়েছে। এ মরশুমের প্রথম তুষারপাত। আর ক'দিনের মধ্যে তুষারে চাদরে মুড়ে যাবে এ অঞ্চল। রেশম পথও তখন চলে যায় চার-পাঁচ ফুট বরফের নীচে। মাসখানেকের জন্য এ পথে বন্ধ হয়ে যায় মানুষের যাওয়া আসা। যতদিন না আবার আর্মির লোকরা ড্রেজিং করে বরফ সরিয়ে রাস্তা বার করে।'

অনীশকে নিয়ে বারান্দা ছেড়ে নীচে নামলেন ভদ্রলোক। তারপর বাড়িটাকে বেড় দিয়ে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে অনীশকে নিয়ে চললেন বাড়িটার পিছন অংশে। ভদ্রলোকের হাঁটার ধরন দেখে অনীশ বুঝতে পারল যে ভাইমারের ডান পায়ে কোনও ত্রুটি আছে।

ভাইমারের সঙ্গে বাড়ির পিছনে পৌঁছে গেল অনীশ। বাড়িটার লাগোয়াই পাথরের তৈরি সার সার বেশ বড় বড় ঘর। তার সামনে লোহার গরাদ বসানো। একটা বোঁটকা গন্ধ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। চিড়িয়াখানার মাংশাসী পশুদের ঘরের সামনে গেলে যেমন গন্ধ পাওয়া যায় তেমনই গন্ধ। ভাইমার অনীশকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন প্রথম খাঁচাটার সামনে।

বাইরে সূর্যালোক কিছুটা ঢুকছে ঘরের ভিতর। ঘরটার এক কোণে

পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে বিরাট একটা রোমশপ্রাণী। অনীশ ভালো করে তাকাল প্রাণীটার দিকে। হ্যাঁ, টিবেটিয়ান উল্‌ফ বা তুষার নেকড়েই বটে। সাদাটে সোনালি বর্ণের প্রাণীটা ঘুমচ্ছে। ঈষৎ ফাঁক করা মুখের ভিতর লাল জিভটা আর শ্বদন্তগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভাইমার বললেন, 'এদের দেহের লোমের বৈশিষ্ট্য জানেন তো?'

অনীশ একবার দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় অন্য একটা কাজে গিয়ে এই টিবেটিয়ান নেকড়ে দেখেছিল। এখানে আসার আগে প্রাণীটার সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনাও করে এসেছে। সে বলল, 'হ্যাঁ, জানি। প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নেকড়েদের উলের রংও পরিবর্তিত হয়। কখনও কালচে, কখনও ধূসর, কখনও সোনালি আবার কখনও ধবধবে সাদা হয়। পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে আত্মগোপন করা, শিকার ধরার কারণে প্রকৃতি এদের এ ক্ষমতা দিয়েছে।'

ভাইমার বললেন, 'ঠিক তাই। দেখুন শীত আসছে বলে ওদের লোমের রং সাদা হতে শুরু করেছে।'

অনীশ বলল, 'আর এও জানি এদের গ্রে উল্‌ফও যে বলা হয় তা কিন্তু এদের গাত্রবর্ণের ধূসরতার জন্য নয়। জন এডোয়ার্ড গ্রে নামের এক ব্রিটিশ প্রকৃতিবিদ ১৮৬৩ সালে সর্বপ্রথম এই টিবেটিয়ান উল্‌ফের সন্ধান পান। তাঁর নাম অনুসারেই এদের বলা হয় 'গ্রে উল্‌ফ'।

ভাইমার তার কথা শুনে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'বাঃ, আপনি অনেক কিছু জানেন দেখছি। আর জানবেনই বা কেন! আপনাদেরও তো কারবার বন্যপ্রাণ নিয়ে। হয়তো বা আপনি আমার চেয়েও বেশি জানেন এদের সম্বন্ধে।' বেশ বিনয়ের সঙ্গেই কথাগুলো বললেন মিস্টার ভাইমার।

প্রথম খাঁচা ছেড়ে দ্বিতীয় খাঁচার সামনে গেল অনীশরা। সেখানেও কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে একটা নেকড়ে। তৃতীয় খাঁচা, চতুর্থ খাঁচাতেও নেকড়ে আছে। অনীশের হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা প্রাণীগুলো সুস্থ তো? অনেক সময় অসুস্থ শ্বাপদেরা অন্য প্রাণীর পিছু ধাওয়া করতে না পেরে মানুষকে আক্রমণ করে।

অনীশ প্রশ্ন করল, 'ওরা সব ঘুমাচ্ছে কেন?'

ভাইমার বললেন, 'এমনিতেই প্রকৃতির নিয়মে যারা রাতে জাগে তারা দিনের বেলা ঘুমায়। সারারাত ছোটাছুটি করে ওরা এখন ক্লান্ত।'

এ কথা বলে হয়তো বা অনীশের মনের বক্তব্য পাঠ করেই ভাইমার বললেন, 'আপনি দেখতে চাচ্ছেন তো ওরা সুস্থ কিনা? দাঁড়ান দেখাচ্ছি। —এই বলে তিনি একটা খাঁচার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দিয়ে টক্‌টক্ শব্দ করলেন। কয়েকবার শব্দ করার পরই চোখ মেলল ঘরের কোণায় শুয়ে থাকা নেকড়েটা। তারপর সে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভেঙে বিশাল একটা হাই তুলল। আধো অন্ধকারে ঝিলিক দিয়ে উঠল তার ধবধবে সাদা শ্বদন্ত বা ক্যানাইনগুলো। ভাইমার এরপর খাঁচার গায়ে শব্দ করে তার উদ্দেশ্যে বললেন—'কাম, কাম।'

ঠিক যেন পোষা কুকুরের মতো অত বড় নেকড়েটা ভাইমারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল খাঁচার গায়ে। গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে প্রাণীটার মাথায় একবার আদর করলেন ভাইমার। ঘড়ঘড় করে একটা আদুরে শব্দ করল নেকড়েটা। তারপর খাঁচার ভিতর চারপাশে একবার পাক খেয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে থাবায় মুখ ঢেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। তাকে দেখে বোঝা গেল প্রাণীটা বেশ সুস্থ সবল।

শেষ খাঁচাটার সামনে গিয়ে এরপর দাঁড়াল অনীশ। কিন্তু তার ভিতর কোনও প্রাণী দেখতে না পেয়ে সে বলল, 'ও খাঁচার নেকড়েটা কোথায় গেল? বাইরে ছাড়া আছে নাকি?'

ভাইমার হেসে বললেন, 'না, দিনের বেলায় ওদের বাইরে ছাড়া হয় না। ও খাঁচাতেই আছে।'

'কোথায়, খাঁচার ভিতর?'

ভাইমার বললেন, 'ওই দেখুন খাঁচার এক কোণে একটা বড় গর্ত আছে। প্রতি খাঁচাতেই ওই গর্ত আছে। নেকড়েরা ঠান্ডা পড়লে বরফের নীচে গর্ত করে ঘুমায়। তাতে ঠান্ডা কম লাগে কারণ বাতাস গায়ে লাগে না বলে। এটা ওদের যুগ যুগ ধরে চলে আসা অভ্যাস। সেজন্য খাঁচার

ভিতরও সেই ব্যবস্থা করা আছে। প্রাণীটা গর্তের ভিতরে আছে। দেখি ওকে বাইরে বের করতে পারি কিনা? এই বলে মুখ দিয়ে টক্‌টক্ শব্দ করতে লাগলেন ভাইমার। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পরও প্রাণীটাকে বাইরে আনতে না পেরে তিনি বললেন, 'ও এখন আরাম ভেঙে বাইরে বেরোবে না। ও বড্ড শীতকাতুরে। যেই বাইরে বরফ পড়তে দেখল অমনি গর্তর ভিতর গিয়ে সেঁদিয়েছে। ওকে নয় পরে দেখবেন।'

অনীশ বলল, 'ঠিক আছে ওকে নয় পরেই দেখব।'

প্রাণীগুলোকে দেখার পর আবার বাড়ির সামনের দিকে ফেরার পথ ধরল অনীশরা। ভাইমার বললেন, 'কেমন দেখলেন প্রাণীগুলোকে? খুব সুন্দর তাই না?'

অনীশ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর প্রাণী।'

ভাইমার আক্ষেপের স্বরে বললেন, 'কেন যে সরকার অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের কথায় এত গুরুত্ব দিচ্ছেন বুঝতে পারছি না। এই সুন্দর প্রাণীগুলোকে গুলি করে মারা হবে সেটা ভাবতে পারছেন!'

অনীশ চিন্তিত ভাবে বলল, 'সত্যিই ওরা এই কাঁটাতারের বেড়ার ওপাশে যায় না তো?'

ভাইমার বললেন, 'আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি ওরা এর বাইরে যায় না। যারা মারা গেছে সেগুলো হয় চিতাবাঘ বা অন্য কোনও নেকড়ের কীর্তি। নেকড়ের তো অভাব নেই এখানে। ভাবছি আমি একটা চেষ্টা করব। যে প্রাণীটা লোক মারছে তাকে ধরা বা মারা যায় কিনা দেখব। তার খোঁজে বন্দুক নিয়ে বনে ঘোরাও শুরু করেছিলাম কিন্তু গ্রামবাসীদের ভয়ে দিনের বেলা আর বাইরে বেরোতে ভরসা পাচ্ছি না। রাতেই না হয় বেরোব তবে। যদিও ব্যাপারটা বিপদজনক। তবুও সে চেষ্টাই করতে হবে। এতে যদি গ্রামবাসীরা সত্যিটা বুঝতে পারে।'

অনীশ বলল, 'আমি এখন গ্রামে যাব কথা বলতে। কীভাবে যাব পথটা দেখিয়ে দিন। দেখি তারা কী বলে?'

ভাইমার বললেন, 'আমি কিন্তু যাব না আপনার সঙ্গে। আমাকে বাগে

পেলে তারা খুনও করতে পারে। তাছাড়া কিছু লোকের আসার কথা এখানে।'

অনীশ বলল, 'আমি একাই যাব। আমার ড্রাইভার পবন বাহাদুর ও গ্রামেই আছে। অসুবিধা হবে না।'

ভাইমার বললেন, 'ঠিক আছে রাস্তাটা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ভাইমারের পিছনে হাঁটতে হাঁটতে মোবাইল ফোনে পবন বাহাদুরকে ধরল অনীশ। সে তাকে বলল গ্রামের লোককে জানিয়ে দাও আমি আসছি। তবে ওয়াইল্ড লাইফের লোক এ ব্যাপারটা তাদের বলার দরকার নেই। হয়তো তারা সেটা বুঝবে না। তাদের বোলো যে সরকারি তরফে আমি খোঁজ নিতে যাচ্ছি তাদের কাছে।'

পবন বাহাদুর জানাল, 'ঠিক আছে স্যার। তবে এরা খুব খেপে আছে সাহেবটার ওপর।'

ফোনটা জ্যাকেটের পকেটে রাখার পর অনীশ ভাইমারকে প্রশ্ন করল, 'কাদের আসার কথা এখানে?'

ভাইমার জবাব দিলেন, 'তিব্বতী চীনাদের একটা দল। সীমান্ত পেরিয়ে ওপার থেকে আসবে ওরা আমাদের জন্য রেশন, পশুগুলোর জন্য মাংস ইত্যাদি নিয়ে। গত তিনমাস ধরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে সব লেনদেন তো বন্ধ। কাজেই ওই চীনারাই ভরসা। তা ছাড়া জিনিসপত্র কমদামেও দেয় ওরা।'

তাঁর কথা শুনে অনীশ মৃদু বিস্মিতভাবে বলল, 'এভাবে সীমান্ত পেরিয়ে আসা যাওয়া করা যায় নাকি?'

ভাইমার বললেন, 'হ্যাঁ, স্থানীয় লোকরা করে। এখানে তো কাঁটাতারের বেড়া নেই। আপনি বুঝতেই পারবেন না কোনটা চীন আর কোনটা ইন্ডিয়া। দু-দেশের সীমান্তরক্ষীরা এ ব্যাপারে খুব একটা বাঁধা দেয় না। তবে যারা ওদেশ থেকে আসে তারা খুব বেশি নীচে নামে না, আর এ দেশের স্থানীয় মানুষরাও ও দেশের ভিতরে ঢোকে না। সীমান্তে উত্তেজনা না থাকলে স্থানীয়ভাবে এ ব্যাপারটা চলে।'

ফাঁকা জমিটার যে দিকটায় বাইরের দিক থেকে পাইনবন কাঁটাতারের

বেড়াকে প্রায় ছুঁয়ে আছে সেদিকটাতে ভাইমারের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াল অনীশ। সেখানেও বাইরে যাবার একটা দরজা আছে। সে দরজার বাইরে থেকেই একটা শুঁড়িপথ প্রবেশ করেছে পাইনবনের ভিতরে। দরজাটা খুলে শুঁড়িপথটা দেখিয়ে ভাইমার বললেন—এ পথটা যেমনভাবে গেছে তেমন তেমন চলে যাবেন। একটু কোনাকুনি গেলেই ঢাল বেয়ে গ্রামে পৌঁছে যাবেন।'

ঘেরা জায়গাটার বাইরে বেরিয়ে পাইনবনে প্রবেশ করল অনীশ। বিরাট বিরাট সব গাছ দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে। তার ঋজু গুড়িগুলো সব সোজা উঠে গেছে ওপরদিকে। গাছগুলো কত প্রাচীন কে জানে! শ্যাওলার পুরু আবরণ জমে রয়েছে গায়ে। কোনও গুঁড়ির গায়ে জন্মেছে থালার মতো বিরাট বিরাট ছত্রাক। একটা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ বিরাজ করছে বনের মধ্যে। কেমন যেন গা-ছমছমে রহস্য ভাবও আছে। ভাইমারের দেখানো শুঁড়িপথ দিয়ে হাঁটতে লাগল অনীশ। মাঝে মাঝে পাতা থেকে মাটিতে জল খসে পড়ার শব্দ অথবা বাতাসের ফিসফিসানি ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই। যে পথ ধরে অনীশ গাড়ি নিয়ে এসেছে তার ডানহাতেই মাইল তিনেক বিস্তৃত এই পাইনবন। তবে শুঁড়িপথটা পাইন বনের একটু ভিতরে ঢুকেই ভাইমারের নেকড়ে খামারের কোনাকুনি ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে। সে পথই ধরল অনীশ।

কিছুক্ষণ চলার পরই বনটা আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে গেল। বনের বাইরে বেরিয়ে এল অনীশ। বনের ঠিক বাইরে পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামটা। পাহাড়ি ছোট ছোট গ্রাম যেমন হয় এ গ্রামটাও তেমনই। পাথরের টুকরো দিয়ে বানানো অনুচ্চ প্রাচীর ঘিরে আছে গ্রামটাকে। সব মিলিয়ে গোটা কুড়ি ঘর হবে গ্রামে। ঘরগুলোর দেওয়াল পাথরের তৈরি। মাথার ওপর নীচু ছাদ। ঘেরা চৌহদ্দির একপাশে একটা খোঁয়াড়ও আছে। পশুর ডাকও ভেসে আসছে সেখান থেকে।

অনীশের আগমনবার্তা ড্রাইভার পবনের মাধ্যমে আগাম পেয়ে তার জন্যই অপেক্ষা করছিল গ্রামের লোকজন। তাদের মধ্যে পবনও ছিল। অনীশ ঢাল বেয়ে নীচে নামতেই তাকে বেশ খাতির করে গ্রামের ভিতর

নিয়ে গেল কয়েকজন। একটা ফাঁকা জায়গাতে একটা পাথরের ওপর অনীশকে বসানোর পর তাকে ঘিরে দাঁড়াল।

গ্রাম্য গরিব পাহাড়ি মানুষ সব। পরনে শতছিন্ন শীতবস্ত্র। মাথায় টুপি। এই শীতেও অধিকাংশেরই খালি পা। বুড়ো বুড়ি, জোয়ান, বাচ্চা কাচ্চা মিলিয়ে একশজন মতো হবে। অনীশ বসার পর ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা বুড়োলোক বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে। পবন তাকে দেখিয়ে বলল, 'স্যার, এ হল নরবু। গ্রামের মাথা। ওই কথা বলবে আপনার সঙ্গে।'

নরবু! এ লোকটার নাম ভাইমারের মুখে শুনেছে অনীশ। লোকটার মাথায় একটা চামড়ার টুপি, গায়ে নোংরা জ্যাকেট। সম্ভবত বয়সের ভারেই একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে লোকটা। তার অসংখ্য বলিরেখাময় মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই তিব্বতী লোকটা এ জীবনে অনেক কিছু দেখেছে, শুনেছে। তবে তার নরুন চেরা ভ্রূহীন চোখের দৃষ্টি এখনও বেশ তীক্ষ্ণ। তার হাতে ছিল একটা কাঠগোলাপের স্তবক। সেটা সে অনীশকে দিল।

লোকটাকে একবার ভালো করে দেখে নেবার পর অনীশ বলল, 'তোমরা তো ওই নেকড়ে খামারটার ব্যাপারে অভিযোগ জানিয়েছ। তাই আমি সরকারের তরফ থেকে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। আমি জানতে চাই আসল কারণটা কী?'

নরবু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ওরা মানুষ মারতে শুরু করেছে। গত ছ'মাসে বেশ ক'জন মানুষের দেহ মিলেছে বনের মধ্যে।'

অনীশ বলল, 'তারা তো গ্রামের লোক নয় বলেই জানি।'

নরবু বলল, 'তারা গ্রামের লোক নয় ঠিকই কিন্তু একবার নেকড়েরা মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে মানুষ মারতে শুরু করে। আমাদের দুজন লোককে নেকড়েগুলো তাড়াও করেছিল। পালিয়ে এসেছে তারা। এই জঙ্গলের ওপরই আমাদের জীবন নির্ভর করে। কাঠ সংগ্রহ, পশুপালন সব বন্ধ হতে বসেছে।'

অনীশ বলল, 'সে তো অন্য নেকড়েও করতে পারে। নেকড়ের তো

অভাব নেই এখানে?’

নরবু বলল, ‘কথাটা ঠিক। কিন্তু মানুষগুলোকে মেরেছে খামারের নেকড়েগুলোই। আমাদের লোক দুজনকে ওরা তাড়া করার পর যখন আমরা নেকড়ে মারার জন্য জঙ্গলে ঢুকি তখন ওই খামারের দুজন লোককে পেয়েছিলাম জঙ্গলের ভিতর।’

অনীশ বলল, ‘তাদেরও তো তোমাদেরই মতো জঙ্গলে ঢুকতে বাধা নেই। তোমরা কি নেকড়ে পেয়েছিলে তাদের সঙ্গে?’

বৃদ্ধ জবাব দিল, ‘না, পাইনি।’

অনীশ বলল, ‘তবে কীভাবে প্রমাণ হল যে খামারের নেকড়েরাই মানুষ মারছে?’

প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বৃদ্ধ বলে উঠল, ‘দুটো নেকড়ে তাড়া করেছিল আমাদের লোকদের। বনের ভিতরও পাওয়া গেছিল খামারের দুজনকে। আসলে ওরাই তাড়া করেছিল আমাদের লোকদের। ওরা আসলে মানুষ নয়, নেকড়ে মানুষ।’

নেকড়ে মানুষ! ওয়ার উল্‌ফ! মৃদু চমকে উঠল অনীশ। এদের আতঙ্কর আসল কারণটা এবার বুঝতে পারল সে। বহু দেশের পাহাড়ি মানুষদের মধ্যে কু-সংস্কার আছে যে যুদ্ধে যারা মারা যায় তারা নেকড়ে হয়ে যায়। বিশেষত দুর্গম, তুষার ঢাকা পার্বত্য অঞ্চলে মৃত মানুষদের দেহ অনেক সময়ই খুঁজে পাওয়া যায় না বা সৎকার করা সম্ভব হয় না। জঙ্গলে, খাদের ভিতর বা তুষার চাপা অবস্থায় পড়ে থাকে মৃতদেহ। ওদের প্রেতাত্মারাই নাকি ওয়ার উল্‌ফের রূপ ধারণ করে। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে বহু সময় মারা হয় এই দুষ্প্রাপ্য প্রাণীগুলোকে।

গ্রামের অশিক্ষিত মানুষদের যুগ যুগ ধরে চলে আসা অন্ধবিশ্বাস চট করে ভাঙা সম্ভব নয়। সে ধারণা এখন ভাঙতে গেলে বরং বিপদ হতে পারে। অনীশ তাই বলল, ‘হ্যাঁ, ওয়ার উলফের ব্যাপারটা আমিও শুনেছি। কিন্তু দুটো নেকড়ে তাড়া করেছিল আর ওই লোকগুলো সংখ্যায় দুজন ছিল বলেই কি ধরে নেওয়া যায় ওরা ওয়ার উল্‌ফ?’

নরবু বলল, 'শুধু সে কারণে নয়, যেখানে যেখানে দেহ মিলেছে সেখানেই তার পাশে পাওয়া গেছে মানুষের পায়ের ছাপ। ঘটনার আগে-পরে খামারের লোকগুলোকে জঙ্গলে ঢুকতে বেরোতেও দেখেছে অনেকে। যখন ওরা প্রথমে খামারটা খুলল তখন ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারিনি। সাহেব আর তার লোকজনের সঙ্গে ভালো সম্পর্কই ছিল আমাদের, তারপর ধীরে ধীরে ওরা কথাবার্তা, কাজ কারবার বন্ধ করে দিল। ওরা মানুষ নয়, প্রেতাত্মা। নেকড়ের রূপ ধরে। এমনকী যে-কোনও মানুষেরও রূপ ধরতে পারে ওরা। আপনি তো ওখানে আছেন শুনলাম। সাবধানে থাকবেন।'

অনীশ বুঝতে পারল, ওয়ার উল্‌ফের ব্যাপারটা বেশ জেকে বসেছে এদের মাথায়। তাই সে তাদের আশ্বস্ত করার জন্য এবার অন্য কৌশল নিল। সে বলল, 'তোমাদের কথা আমি অবিশ্বাস করছি না। ইচ্ছা করলে তো আজকেই তুলে দেওয়া যায় খামারটা। কিন্তু তার জন্য আরও মজবুত প্রমাণ দরকার। ভাইমার সাহেব একটু সময় চাচ্ছেন তোমাদের কাছে। তোমরা যদি আবার সরকারকে চিঠি দিয়ে অভিযোগটা তুলে নাও তবে তিনি আবার মাংস কিনবেন তোমাদের কাছ থেকে। গ্রামের উন্নতির জন্য তিনি অর্থ সাহায্যও করবেন তোমাদের। তার কাছে যদি তোমাদের আরও কোনও দাবি থাকে তবে আমি তা নিয়ে তার সঙ্গে কথাও বলতে পারি। আমি তোমাদের চাপ দিচ্ছি না। শুধু একবার ভেবে দেখতে বলছি। উভয় পক্ষেরই কোথাও কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকতে পারে।'

তার কথা শুনে মাথা নাড়ল নরবু। তারপর বলল, 'ভুল আমাদের হচ্ছে না। তবে আপনি যখন বলছেন তখন ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তবে আপনি সাবধানে থাকবেন। আমার বিশ্বাস ওরা নেকড়েই।'

অনীশ আর কথা বাড়াল না। কাঠগোলাপের পুষ্পস্তবকটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'এবার আমি চলি। কাল আবার আসব।'

পাহাড়ের ঢালের পাইনবনের মুখ পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে এল ড্রাইভার ছেলেটা। অনীশ তাকে বলল, 'গ্রামের তেমন কিছু খবর হলে

সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাকে জানাবে।' 'বনের মধ্যে দিয়ে একটু সাবধানে ফিরবেন।'

পবন বলল, 'আচ্ছা সাহেব। কোনও খবর হলেই জানাব।'

তাকে বিদায় জানিয়ে বনে প্রবেশ করল অনীশ। চারপাশে আবার সেই অদ্ভুত আলো-আঁধারী পরিবেশ। গাছের পাতা থেকে জল খসে পড়ার টুপটাপ শব্দ। হিমেল বাতাস বনের মধ্যে এমনভাবে বয়ে যাচ্ছে যে ঠিক যেন ফিসফাস শব্দে কারা যেন কথা বলছে পাইনগাছের আড়াল থেকে। পবন আর গ্রামবাসীদের কথা মেনে একটু সাবধানেই চলছিল অনীশ। ওয়ার-উল্‌ফের ভয়ে নয়। ওসবে সে বিশ্বাস করে না। তবে সত্যিকারের নেকড়ে বনে থাকতেই পারে। তাই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

হাঁটছিল অনীশ। হঠাৎই পাশেই একটা গাছের আড়াল থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে সে থমকে দাঁড়িয়ে সে দিকে তাকাতেই দেখতে পেল গাছটার আড়ালে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার পোশাকের কিছুটা অংশ গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে আছে।

অনীশ বলে উঠল, 'কে ওখানে? কে?'

প্রশ্ন শুনে গাছের আড়াল থেকে যে বেরিয়ে এল তাকে দেখে অনীশ বেশ অবাক হয়ে গেল।

সে বলল, 'ভাইমার আপনি এখানে?'

ভাইমারের মুখে কেমন যেন একটা অপ্রস্তুত হাসি। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি। ক্যাম্পে থাকতে আর ভালো লাগছিল না, তাই বনে ঢুকেছিলাম। গ্রামবাসীরা কী বলল?'

অনীশ জবাব দিল, 'কথা বললাম ওদের সঙ্গে। আপনি যে ওদের থেকে পশু কিনবেন, অর্থ সাহায্য করবেন সেটা ওদের জানিয়েছি। দেখা যাক ওরা মত পরিবর্তন করে কিনা?'

অনীশের জবাব শুনে চুপ করে কী যেন ভাবলেন ভাইমার। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এখন কোথায় যাবেন? ক্যাম্পে ফিরবেন?'

অনীশ বলল, 'ভাবছি চারপাশটা একবার ভালো করে দেখে নেই।

এই বনের মধ্যে দিয়ে গাড়ি রাস্তায় যাবার অন্য কোনও পথ আছে?'

ভাইমার একটা গাছের গুঁড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'ওর আড়াল থেকে একটা শুঁড়িপথ নেমেছে ওদিকে। ওটা ধরে চলে যান। রাস্তা পাবেন।' 'ঠিক আছে ক্যাম্পে ফিরে আবার দেখা হবে। এই বলে সেদিকে এগোল অনীশ।

৩

ভাইমারের নির্দেশিত শুঁড়িপথ ধরে আধঘণ্টা মতো চলার পর সেই রাস্তা পেয়ে গেল অনীশ। যে রাস্তা দিয়ে ক্যাম্পে এসেছিল সে। নির্জন রাস্তাা একপাশে পাইনবনের ঢাল। অন্যদিকে পাথরের প্রাচীর। ড্রাইভার ছেলেটার কথা অনুযায়ী ওদিকটাই চীন। গত রাতে তুষারপাত হয়েছে। যদিও সূর্যালোকে তা এখন গলতে শুরু করেছে তবুও এখনও রাস্তার খানাখন্দে, পাথরের দেওয়ালের গায়ে তার চিহ্ন লেগে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ ক্যাম্পের উলটোপথে হাঁটার পর রাস্তার পাশে একটা বড় পাথরের ওপর বসল অনীশ। কাছেই বন থেকে ভেসে আসা ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

পাইনবনের দিকে তাকিয়ে অনীশ ভাবতে লাগল গ্রামবাসীরা কি সম্মত হবে তার কথায়। অমন সুন্দর প্রাণীগুলোকে কি শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে। একসময় এ তল্লাটের আদি বাসিন্দাদের অন্যতম ছিল এই টিবেটিয়ান নেকড়েগুলোই। প্রচুর সংখ্যায় ছিল ওরা। কিন্তু কয়েকশো বছর ধরে চামড়ার জন্য নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে ওদের। ওয়ার উলফ ভেবেও স্থানীয় মানুষরা পুড়িয়ে মেরেছে প্রকৃতির এই সন্তানদের। এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফের রিপোর্ট অনুযায়ী এই তিব্বতী নেকড়ের সংখ্যা মাত্র তিনশোতে এসে ঠেকেছে।

আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণ সংস্থার দুষ্প্রাপ্য বণ্যপ্রাণীদের যে তালিকা আছে তাতে একদম প্রথম দিকেই আছে এই প্রাণী। দেশের সরকার শেষ পর্যন্ত

খামারের প্রাণীগুলো সম্বন্ধে যাই সিদ্ধান্ত নিক না কেন অনীশদের সংস্থার তরফ থেকে তাকে অনুরোধ করা হয়েছে যে সে যেন শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে প্রাণীগুলোকে রক্ষা করার। অনীশ সেই চেষ্টাই করবে।

প্রাণীগুলোর সম্বন্ধেই ভাবছিল অনীশ। হঠাৎ একটা জিপের হর্ন শুনতে পেল সে। সামরিক বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে চলন্ত গাড়িটাতে ড্রাইভারের পাশের আসনে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সামরিক বাহিনীর এক জওয়ান। অনীশকে কিছুটা অবাক করে দিয়ে গাড়িটা এসে থামল অনীশের ঠিক সামনে।

ইন্ডিয়ান আর্মির গাড়ি। বেশ কয়েকজন লোক আছে তাতে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল ধোপ-দুরস্থ সামরিক পোশাক পরা ছোটখাটো চেহারার একজন মাঝবয়সি লোক। হাতে একটা ফাইল। সম্ভবত লোকটা পাহাড়ি দেশের মানুষই হবে। অনীশ তার বুকে লাগানো কাপড়ের পট্টিগুলো দেখেই বুঝতে পারল যে লোকটা সামরিক বিভাগের কোনও. উচ্চপদস্থ কর্মচারী হবে। তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল অনীশ।

লোকটা এগিয়ে এসে দাঁড়াল তার সামনে। তারপর ইংরাজিতে জানতে চাইল, 'আপনিই তো মিস্টার অনীশ মুখার্জ্জী? ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফের প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছেন?'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ। আপনি?' এই বলে সে পকেট থেকে তার আইডেন্টিটি কার্ড বার করে সেটা দেখাতে যাচ্ছিল ভদ্রলোককে, কিন্তু তিনি বললেন, 'থাক ওটা দেখাবার প্রয়োজন নেই। আপনার পরিচিতি সম্পর্কে কাগজ আমাদের কাছে সরকারের তরফ থেকে আছে। সেখানে আপনার ছবিও আছে। দেখেই চিনতে পেরেছি। আমি লেফটানেন্ট ছেত্রী। এই সেক্টর, মানে এই অঞ্চলের সামরিক বাহিনীর দায়িত্বে আছি। এখানে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স আর আমরা একসঙ্গে কাজ করি। এই বলে করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

করমর্দন পর্ব মেটার পর অনীশ বলল, 'আপনি কি এখানকারই লোক? আমার সঙ্গে কোনও দরকার আছে?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'না, না, আমি কার্শিয়াং-এর লোক। তবে

বেশ কয়েকবছর ধরে এখানে পোস্টেড।'

এরপর একটু থেমে লেফটানেন্ট বললেন, 'দরকার মানে আপনাকেই খুঁজছিলাম আমি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে আপনার ওপর নজর রাখতে বলা হয়েছে আমাকে।'

অনীশ বিস্মিতভাবে জানতে চাইল, 'নজর রাখতে বলা হয়েছে কেন? আমি অপরাধী, নাকি গুপ্তচর?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'না, না, তেমন ব্যাপার নয়। আপনি এ দেশের নাগরিক হলেও একটা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি। এ জায়গা সীমান্তবর্তী অঞ্চল। এখানে বিপদ ঘটতে বেশি সময় লাগে না। তাই আপনার নিরাপত্তার স্বার্থেই আপনার ওপর নজর রাখার নির্দেশ এসেছে। তাছাড়া আপনি যে জায়গাতে উঠেছেন সে জায়গাটা ভালো নয় বলেই আমাদের ধারণা।'

অনীশ বলে উঠল, 'ও জায়গা ভালো নয় কেন? গ্রামের মানুষদের মতো আপনিও কি 'ওয়ার উল্‌ফের' তত্ত্বে বিশ্বাস করেন? আপনাদেরও কি আপত্তি আছে এই উল্‌ফ রিহ্যাবিলেটেশন ক্যাম্পটা নিয়ে?' তার বন্ধুর মুখে শোনা গোপন খবরটা যাচাই করার চেষ্টা করল অনীশ।

একটু চুপ করে থেকে লেফটানেন্ট ছেত্রী জবাব দিলেন, 'না, আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। আপনি নিশ্চয়ই দেশপ্রেমিক একজন নাগরিক?'

অনীশ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এ বিষয়ে আপনি ভরসা রাখতে পারেন।'

লেফটানেন্ট আবারও একটু চুপ করে থেকে যেন একটু ইতস্তত করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমরাও চাই যে উল্‌ফ রিহ্যাবিলেটেশন ক্যাম্পটা এখান থেকে উঠে যাক। সেটা ওয়ার উল্‌ফের কারণে নয়। আমাদের ধারণা বিদেশি শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ আছে মিস্টার ভাইমারের। একটা সময় পর্যন্ত তিনি যোগাযোগ রাখতেন আমাদের সঙ্গে, কিন্তু বেশ কিছুদিন হল তিনি সব যোগাযোগ ছিন্ন করেছেন আমাদের সঙ্গে।'

অনীশ প্রশ্ন করল, 'যোগাযোগ ছিন্ন করাই কি আপনাদের সন্দেহের কারণ?'

লেফটানেন্ট বললেন, 'না, ওটাই একমাত্র কারণ নয়। আরও কারণ আছে। তবে সামরিক বাহিনীর সব খবর বাইরের লোককে বলা যায় না। ক্ষমা করবেন আমাকে। তা ফার্মটা কেমন দেখলেন? পশুগুলোকে দেখলেন?'

অনীশ জবাব দিল, 'দেখেছি। বেশ সুস্থ সবল সুন্দর প্রাণী সেগুলো।'

'আর মানুষগুলো?' জানতে চাইলেন ছেত্রী।

অনীশ বলল, 'মিস্টার ভাইমার আর তার দু-জন সহকর্মীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে আমার। যদিও ভাইমারের সঙ্গীদের সঙ্গে বাক্যালাপ হয়নি আমার। তবুও বলি তাদের কোনও অস্বাভাবিক আচরণ আমি দেখিনি।'

লেফটানেন্ট এবার তার হাতের ফাইলটা খুলে তার একটা পাতা মেলে ধরলেন অনীশের সামনে। সেখানে রয়েছে বেশ কয়েকজন লোকের রঙিন ফোটোগ্রাফ। তাদের ছবি দেখে অনীশের মনে হল তারা চীনা সামরিক বাহিনীরই কেউ হবে। কারণ, লাল পট্টি অলা, তারকা খচিত এই কালচে সবুজ পোশাক পরা লোকদেরই সে আসার পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল চীন ভূখণ্ডে।

ছবিগুলো দেখিয়ে লেফটানেন্ট তাকে প্রশ্ন করলেন, 'ছবিগুলো ভালো করে দেখে বলুন তো এই ছবিগুলোর মধ্যে কাউকে আপনি ওই উল্‌ফ ক্যাম্পে দেখেছেন কিনা?'

তাঁর কথা শুনে পাঁচটা ছবিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল অনীশ। তার সঙ্গে কল্পনা করল তাকে খাবার দিতে আসা লোক দুজনের মুখ।

তারপর সে বলল, 'আমার কাছে যে ফাইল আছে তাতে বলা আছে ভাইমার সাহেবের চারজন কর্মচারী আছে ওই নেকড়ে ক্যাম্পে। তাদের ছবিও আছে আমার ফাইলে। তাদের মধ্যে আমি দু-জন কর্মচারীকে দেখেছি। আপনার ফাইলের লোকগুলোর মুখের সঙ্গে সে দু-জন লোকের মুখের মিল নেই।'

লেফটানেন্ট এবার তার ফাইলটা বন্ধ করে বললেন, 'যদি বাকি অন্য দু-জনের সঙ্গে এই ছবিগুলোর কারও মিল পান অথবা এদের মধ্যে

কাউকে ওখানে দেখতে পান তবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে এটা প্রয়োজন। আপনার মোবাইল নম্বরটা আমাকে দিন, আর আমারটাও রাখুন আপনার কাছে।'

দুজনের মধ্যে ফোন নম্বর বিনিময়ের পর লেফটানেন্ট ছেত্রী জানতে চাইলেন, 'আপনি এখন কোথা থেকে এলেন? কোথায় যাবেন?'

অনীশ বলল, 'ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে গেছিলাম। আবার এরপর নেকড়ে খামারে ফিরব।'

'গ্রামের মানুষরা কী বলল?' জানতে চাইলেন ছেত্রী।

অনীশ বলল, 'ওদের ধারণা ক্যাম্পের নেকড়েগুলো আসলে ওয়ার উল্‌ফ! ভাইমার বলেছেন যে অভিযোগপত্র তুলে নিলে তিনি তাদের অর্থ সাহায্য করবেন। সেটাও তাদের জানালাম। দেখা যাক...'

লেফটানেন্ট বললেন, 'আমরা এই ওয়ার উল্‌ফের ব্যাপারটা বিশ্বাস না করলেও হয়তো বা ভাইমারই এ ব্যাপারটার জন্য কিছুটা দায়ী। ওই মাস ছয়েক আগেই একবার একদিন রাতে মিস্টার ভাইমার আমাকে উত্তেজিত ভাবে ফোন করে বলেছিলেন, "জানেন আমার ধারণা হচ্ছে যে আমার নেকড়েগুলো সব ওয়ার উল্‌ফ।" তার কথা শুনে আমি হেসে ফেলায় তিনি ফোন রেখে দিলেন। সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা। তিনি আমার ফোন আর ধরেন না। ফোনও করেন না। হয়তো তিনি গ্রামবাসীদেরও কাউকে খেয়ালবশে কোনও কারণে একথা বলেছিলেন। সেটাই প্রচারিত হয়েছে। তবে গ্রামবাসীরা একবার ক্যাম্পটা আক্রমণ করার চেষ্টা করে সফল না হলেও কিন্তু নেকড়ে নিধন যজ্ঞে নেমে পড়েছে।'

অনীশ বলল, 'সেটা কেমন?'

লেফটানেন্ট বললেন, 'এ অঞ্চলে একটা বিশেষ ব্যাপারে তল্লাশি চালাচ্ছিলাম আমরা। জিনিসটার খোঁজে কাছেই এক জায়গায় মাটি খুঁড়েছিলাম আমরা। সেখান থেকে চারটে টিবেটিয়ান উল্‌ফের চামড়া-কঙ্কাল উদ্ধার হয়েছে। আমার ধারণা গ্রামবাসীরা তাদের মেরে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে।'

অনীশ চমকে উঠে বলল, 'এমন দুষ্প্রাপ্য পাঁচটা প্রাণীকে মেরে ফেলল ওরা?'

ছেত্রী বললেন, 'আমার ধারণা তাই। তবে ওদের তেমন দোষ দেওয়া যায় না। যুগ যুগ ধরে চলে আসা ওয়ার উল্ফ সম্বন্ধে কু-সংস্কার কি এত সহজে দূর করা সম্ভব? যদিও ব্যাপারটা ওরা ভয়ে স্বীকার করতে চাচ্ছে না কেউ। কারণ সরকারি তরফ ছাড়া বন্যপ্রাণী হত্যা আইন বিরুদ্ধ।'

অনীশ প্রশ্ন করল, 'কীসের খোঁজে গিয়ে আপনারা নেকড়েগুলোর মৃতদেহর সন্ধান পেলেন?'

লেফটানেন্ট মৃদু হেসে বললেন, 'কীসের খোঁজে আমরা গেছিলাম সেটা বলা যাবে না আপনাকে। এটাও সামরিক বাহিনীর গোপন ব্যাপার।'

অনীশ বলল, 'সরি। ব্যাপারটা জিগ্যেস করা আমার উচিত হয়নি।'

লেফটানেন্ট এরপর আর বেশি কথা বাড়ালেন না। তিনি বললেন, 'এবার আমাকে যেতে হবে। কোনও অসুবিধায় পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে জানিয়ে দেবেন।'—এই বলে অনীশের থেকে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন তিনি। পথের বাঁকে হারিয়ে গেল তার গাড়ি। অনীশও এরপর ক্যাম্পে ফেরার জন্য এগোল।

ক্যাম্পে পৌঁছে গেল অনীশ। বাড়িটার সামনের জমিটায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গতকাল তালা খুলে দিয়েছিলেন ভাইমার। কিন্তু অনীশ খেয়াল করল আজ দরজায় তালা দেওয়া নেই। হয়তো বা তার জন্যই তালাটা খুলে রাখা হয়েছে। গেটের ফাঁক দিয়ে ওপাশে হাত গলিয়ে ওপাশের ছিটকিনি খুলে ভিতরে প্রবেশ করল অনীশ। ঠিক সেই সময় মাথার ওপরের আকাশটাতে কেমন যেন অন্ধকার হয়ে এল। পাহাড়ি অঞ্চলে সারাদিনই এমন মেঘ-রোদ্দুরের লুকোচুরি খেলা চলে। ফাঁকা জমি পেরিয়ে বারান্দায় উঠল অনীশ। সেখানেও কোনও লোকজন নেই।

নিজের ঘরে ঢুকে কিন্তু অনীশ দেখতে পেল তার টেবিলে খাবার রাখা আছে। ধোঁয়া উঠছে তার থেকে। অর্থাৎ কিছুক্ষণ আগেই খাবার দিয়ে গেছে কেউ। ভাইমার কি ফিরেছেন বাইরে থেকে। বেশ বেলা

হয়ে গেছে। এতটা পথ হাঁটার ফলে বেশ খিদেও পেয়েছিল তার। কাজেই খাওয়া সেরে নিয়ে বিছানায় বসল সে।

জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখা যাচ্ছে। কেমন যেন আধো-অন্ধকার ভাব। পিছনের বরফ পাহাড় থেকে ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসছে। সেদিকে তাকিয়ে অনীশ লেফটানেন্ট ছেত্রীর সঙ্গে তার কথোপকথনগুলো ভাবতে লাগল। ছেত্রী কি সন্দেহ করছেন এ বাড়িতে অন্য কেউ ছদ্মবেশে লুকিয়ে আছে? কথাটা মনে হতেই নিজের সঙ্গে আনা ফাইলটা খুলল অনীশ। ভাইমার সহ তার কর্মচারী চারজনের ছবি আর পাঁচটা নেকড়ের ছবি আছে ফাইলটাতে। ভাইমারের যে দুজন সঙ্গীকে অনীশ ইতিমধ্যে দেখেছে তাদের মধ্যে দুজনের ছবি দেখে চিনতে পারল অনীশ। মনে মনে সে ভেবে নিল ভাইমারের কর্মচারীদের মধ্যে বাকি দুজনের চেহারাও মিলিয়ে নিতে হবে ফাইলের ছবির সঙ্গে।

ফাইলটা ঘাটছিল অনীশ। দরজা খোলাই ছিল। হঠাৎ যেন দরজা বেয়ে আসা আলোটা আরও ক্ষীণ হয়ে গেল। অনীশ তাকিয়ে দেখল দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন ভাইমার। তাঁকে দেখে ফাইল বন্ধ করে অনীশ বলল, 'আপনি কখন ফিরলেন?'

ভাইমার বললেন, 'মানে?'

অনীশ বলল, 'পাইনবনে যে আপনার সঙ্গে দেখা হল তারপর কখন ক্যাম্পে ফিরলেন?'

ভাইমার একটু চুপ করে রইলেন। বেশ চিন্তাক্লিষ্ট লাগছে তার মুখ। তিনি বললেন, 'ও, হ্যাঁ, বেশ কিছুক্ষণ হল।'

জবাব দিয়ে ভাইমার ঘরের ভিতর ঢুকতে গিয়েও হঠাৎই থমকে গেলেন। বেশ কয়েকবার নাক টেনে ঘরের ভিতর তাকালেন তিনি। তার নজর গিয়ে থামল অনীশের খাটের ওপর পড়ে থাকা কাঠ গোলাপের বোঁকেটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আঁতকে উঠে বললেন, 'ফেলে দিন বোঁকেটা, এখনই জানলা দিয়ে ফেলে দিন। কারা দিল ওটা?'

বিস্মিতভাবে অনীশ বলল, 'গ্রামবাসীরা। কেন কী হল?'

ভাইমার দ্রুত পকেট থেকে রুমাল বার করে নাক চাপা দিয়ে বলল,

'ওতে আমার ভয়ানক অ্যালার্জি। এখনই আমার হাত মুখ চুলকাতে শুরু করবে। প্লিজ ফেলে দিন ওটা।'

অনীশ ব্যাপারটা এবার বুঝতে পেরে জানলা দিয়ে বোঁকেটা বাইরে ছুড়ে ফেলল।

ঘরে ঢুকলেন ভাইমার। অনীশও খাট ছেড়ে নামল। মুখ থেকে রুমাল সরালেন ভাইমার। এর মধ্যেই তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। বিশেষ বিশেষ ফুলের গন্ধে অনেকেরই অ্যালার্জি হয়। অনীশের এক পরিচিত বন্ধুর কাঁঠালি-চাঁপা ফুলের গন্ধেও এমন অ্যালার্জি হত।

রুমাল সরিয়ে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন ভাইমার। তাই দেখে অনীশ বলল, 'আপনাকে বেশ চিন্তান্বিত লাগছে! কিছু হয়েছে?'

ভাইমার বললেন, 'হ্যাঁ। মাথায় চিন্তা ঘুরছে। ওপার থেকে তিব্বতী চীনাদের দলটার রসদ নিয়ে ভোরবেলাই পৌঁছোনোর কথা। তারা এখনও এল না। এদিকে আকাশের যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে আজ সন্ধ্যা থেকেই ভারী তুষারপাত শুরু হবে। বরফে পাস আটকে গেলে তারা আর আসতে পারবে না। এদিকে রসদও শেষ। আমাদের কথা বাদ দিন প্রাণীগুলোকে তো খাবার দিতে হবে। আমার কর্মচারীরা তো বটেই প্রাণীগুলোও গত দুদিন ধরে না খেয়ে আছে বলা চলে।'

অনীশের বেশ লজ্জা লাগল ভাইমারের কথা শুনে। তাদের নিজেদের খাদ্য সংকট অথচ তারা দু-বেলা অনীশের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন বলে।

সে বলল, 'আমার খাবার নিয়ে কিন্তু আপনি ভাববেন না। সঙ্গে শুকনো খাবার আছে। প্রয়োজনে গ্রাম থেকে খাবার সংগ্রহ করে নেব।'

ভাইমার মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, 'আসলে প্রাণীগুলোর ভবিষ্যতের চিন্তা সবসময় মাথায় ঘুরছে, তার ওপর আবার এই সমস্যা! মাথার ভিতর সব কিছু জট পাকিয়ে যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা কী বলল আমাকে আর একবার বলুন তো?'

অনীশ বলল, 'ওই তো তখন আপনাকে যা বললাম। আপনার প্রস্তাব ওদের বললাম। ওরা ভাববে বলল, দেখা যাক কী হয়?'

ভাইমার মৃদু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'ওদের সঙ্গে কথা বলে আপনার কী মনে হল? আমার ক্যাম্পের ওপর ওদের এত রাগ কেন?'

অনীশ জবাব দিল, 'ওদের ধারণা আপনার ক্যাম্পের নেকড়েরা আসলে ওয়ার উল্‌ফ।'

আবারও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন ভাইমার। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'এই কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে এই সুন্দর প্রাণীগুলোকে যে কত হত্যা করা হয়েছে তার হিসাব নেই। এখন এ সত্ত্বেও যদি সরকার এদেরকে সমর্থন করেন তবে আর কিছু বলার নেই।'

ভাইমারের কথায় অনীশের মনে পড়ে গেল লেফটানেন্টের কথা। সে বলল, 'আপনি কখনও কাউকে মজা করেও বলেননি তো যে আপনার নেকড়েরা "ওয়ার উল্‌ফ?"

ভাইমার বললেন, 'না, বলিনি। তবে আমার নাম করে কেউ যদি সে কথা ছড়িয়ে থাকে তবে তা আমি জানি না।'

অনীশ এরপর আর এ প্রসঙ্গে কথা না বাড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা আপনার তো চারজন কর্মচারী। দু-জনকে দেখলাম। অন্য দুজন কোথায়?'

ভাইমার হেসে বললেন, 'আপনার কি মনে হয় তারা দু-জন ওয়ার উল্‌ফ? গ্রামের লোকরা বলেছে নাকি এ কথা?'

ভাইমারের এ কথা শুনে অনীশ একটু লজ্জিতভাবে বলল, 'না, না, সে কথা নয়। আমি এ সবে বিশ্বাস করি না। আসলে তাদের দেখিনি তাই বললাম।'

ভাইমার বললেন, 'নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকে সবাই। ঠিক আছে আপনার কৌতূহল নিরসনের জন্য ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। এবার চলি তাহলে। বাইরেটা অন্ধকার হয়ে আসছে।'

ভাইমার বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সত্যি দু-জন লোক এসে দাঁড়াল ঘরের সামনে। ভাইমার তাদের পাঠিয়েছেন। তাদের দেখেই অনীশ বুঝতে পারল ভাইমারের আগের দু-জন কর্মচারীর সঙ্গে এ দু-জন লোকেরও ছবি আছে তার ফাইলে। অর্থাৎ চারজন লোককেই দেখা হয়ে গেল তার। সে দুজন লোকের মধ্যে একজন একটু

ইতস্তত করে অনীশের উদ্দেশ্যে বলল, 'স্যার, আমাদের কোনও প্রশ্ন করবেন? সাহেব আমাদের পাঠালেন।'

তার তেমন কিছু প্রশ্ন করার নেই লোকগুলোকে। সে শুধু তাদের দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু লোকগুলো অনীশের কাছে জানতে চাওয়ায় সে প্রশ্ন করল, 'তোমরা এখানে কী কাজ করো?'

একজন লোক জবাব দিল, 'পশুগুলোর যত্ন নিই। তাছাড়া ক্যাম্পের নানা কাজ।'

অনীশ বলল, 'এই ক্যাম্প যদি না থাকে তখন?'

তার কথা শুনে অন্য লোকটা ভয়ার্তভাবে বলল, 'ক্যাম্প না থাকলে আমরা কোথায় যাব স্যার? পেটের ব্যাপার। আমাদের কথা ভাববেন স্যার। ভাইমার সাহেবের দয়ায় এই ক্যাম্পে আমরা খেতে পরতে পারছি।'

বাইরেটা আরও অন্ধকার হয়ে আসছে। খোলা দরজা-জানলা দিয়ে তীক্ষ্ণ কনকনে বাতাস ঢুকছে ভিতরে।

অনীশ লোক দুজনের উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমরা এখন যাও। আমি দেখছি কী করা যায়। আর সাহেবকে বোলো রাতে খাবার লাগবে না। সঙ্গে খাবার আছে সেগুলো খাব।'

অনীশকে সেলাম ঠুকে চলে গেল লোকদুটো। দরজা-জানলা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল অনীশ।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল অনীশ। তার যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকাল গড়িয়ে অনেকক্ষণ হল সন্ধ্যা নেমেছে। জানলার বাইরে থেকে কীসের যেন অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে।

অনীশ জানলা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাতাসের সঙ্গে জানলার গরাদের ফাঁক গলে বিন্দু বিন্দু কী যেন এসে পড়ল তার গায়ে। তুষার! তুষারপাত যেন শুরু হয়েছে কখন। পিছনের পাহাড়ের মাথায় ইতিমধ্যে চাঁদ উঠেছে। তার আলোতে মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাইরেটা। তুষারে ঢেকে গেছে পিছনের জমিটা। নিশ্চয়ই সামনের জমিটাও একইভাবে বরফে ঢেকে গেছে। অনীশ এর আগে কোনওদিন তুষারপাত দেখেনি।

জানলাটা বন্ধ করে খাট থেকে নেমে সে দরজাটা খুলল। হ্যাঁ, সামনের ফাঁকা জমিটা সাদা হয়ে গেছে তুষারে। তারপরই সে দেখতে পেল এক অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য।

বারান্দার বাইরে তুষারপাতের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে পাঁচটা নেকড়ে। ফাঁকা জমিটার মধ্যে উল্লাসে ছোটাছুটি করছে তারা। কখনও বা একে অন্যর পিছু ধাওয়া করছে খেলার ছলে। তাদের পায়ের আঘাতে তুষার উড়ছে বাতাসে। এই নেকড়ের দলের মধ্যেই ধবধবে সাদা বিশালাকার একটা নেকড়ে দেখতে পেল অনীশ। আকারে সেটা অন্য চারটে নেকড়ের থেকে অনেক বড়। অনীশ আগে তাকে দেখেনি। সম্ভবত এটাই সেই পঞ্চম নেকড়ে যেটা খাঁচার গর্তর ভিতর লুকিয়ে ছিল। একমাত্র এই নেকড়েটাই কিন্তু ছোটাছুটিতে অংশ নিচ্ছে না। এক জায়গাতে চুপচাপ বসে অন্যদের ওপর নজর রাখছে সে।

দূর থেকে একবার যেন ঘাড় ফিরিয়ে অনীশের ঘরের দিকে তাকাল সে। তারপর একবার মুখটা হাঁ করল। এত দূর থেকেও যেন তার টকটকে লাল জিভ আর তীক্ষ্ণ দাঁতগুলো দেখতে পেল অনীশ। শ্বাপদের দাঁত! মুহূর্তের জন্য কেমন যেন শিরশির করে উঠল অনীশের গা। এরপর চাঁদের দিকে মুখ তুলে অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠল প্রাণীটা। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্য চারটে নেকড়ে যে যেখানে ছিল থমকে দাঁড়িয়ে গলা মেলাল তার সঙ্গে। তুষারপাতের মধ্যে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে যেন আদিমতা জেগে উঠল প্রাণীগুলোর মধ্যে।

হাজার বছর ধরে, যুগ যুগ ধরে এমনই রাত্রির আহ্বানে সাড়া দিয়ে এসেছে তারা। রাত্রির সন্তানদের অপার্থিব সঙ্গীত মূর্ছনা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল নির্জন পাহাড়ের বুকে। এ অভিজ্ঞতা অনীশের কোনওদিন হয়নি। মাঝে মাঝে একটু থেমে থেমে একইভাবে ডেকে উঠতে লাগল প্রাণীগুলো। সে ডাক শুনে অনীশের কোনও সময় মনে হল তা যেন প্রকৃতির সন্তানদের উল্লাসধ্বনি আবার কোনও কোনও সময় মনে হতে লাগল সেটা তাদের আত্মবিলাপ, ক্রন্দনধ্বনি। অনীশ দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তাদের।

সময় কাটতে লাগল। কিন্তু একসময় প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হল। বাতাসও বইতে লাগল শনশন করে। তার ঝাপটায় তুষার এসে লাগতে লাগল অনীশের মুখে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাও প্রচণ্ড। অনীশ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বালাল সে। তারপর সঙ্গে আনা বিস্কুট, শুকনো খাবার খেয়ে বাতি নিভিয়ে রাত আটটা নাগাদ শুয়ে পড়ল সে।

মাঝরাতে হঠাৎ কীসের যেন একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল তার। দরজার কাছ থেকে শব্দটা আসছে। কেমন যেন একটা অদ্ভুত খসখসে শব্দ! সঙ্গের টর্চটা জ্বালিয়ে দরজার দিকে আলো ফেলল অনীশ। তারপর বলে উঠল, 'কে?'

পুরোনো কাঠের প্যানেলঅলা দরজাটা একবার যেন কেঁপে উঠল। তারপর সব শব্দ থেমে গেল। হয়তো বা বাতাসের আঘাতেই শব্দটা হচ্ছে। দরজা কেঁপে উঠেছে। টর্চ নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়ল অনীশ। কিন্তু ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝেই যেন শব্দটা কানে বাজতে লাগল তার। অদ্ভুত একটা খস্‌খস্‌ শব্দ!

৪

ভোর ছ'টা নাগাদ মোবাইলের রিংটোনের শব্দে ঘুম ভাঙল অনীশের। ওপাশ থেকে ড্রাইভার পবন বলল, 'গুড মর্নিং স্যার। আপনি কি আজ আসছেন?'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ, যাব। কোনও খবর আছে নাকি?'

পবন একটু ইতস্তত করে বলল, 'এখানে তো গ্রামের লোকেরা সন্ধ্যা হলেই ঘুমিয়ে পড়ে। তার ওপর কাল সন্ধ্যা থেকেই তুষারপাত শুরু হয়েছিল। চাঁদ ওঠার কিছু পরে তুষারপাত দেখার জন্য আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি গ্রামপ্রধান নরবু একা তুষারপাতের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে বেরোচ্ছে। কৌতূহলবশত আমি এগোলাম তার পিছনে। সে

আমাকে দেখেনি। নরবু ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে পাইনবনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সেখান থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। সে নরবুকে নিয়ে পাইনবনের ভিতরে ঢুকে গেল। তারপর বেশ কিছু সময় পর বন থেকে বেরিয়ে একলা গ্রামে ফিরে এল সে।

অনীশ প্রশ্ন করল, 'লোকটা কে? কেমন দেখতে।'

পবন মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে বলল, 'সম্ভবত ভাইমার সাহেব।'

ভাইমার সাহেব! বেশ অবাক হয়ে গেল অনীশ। তবে ভাইমার কি গোপনে সন্ধি করতে গেছিলেন গ্রামের মাথা নরবুর সঙ্গে? অনীশ অবশ্য এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলল না পবনকে। শুধু বলল, 'ঠিক আছে। চোখকান খোলা রেখো। তেমন কিছু হলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

বিছানা ছেড়ে উঠে অনীশের কিছুক্ষণ সময় লাগল তৈরি হয়ে নিতে। দরজা খুলেই একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল সে। সামনের চত্বর তো বটেই, এমনকী চারপাশের সবকিছু সাদা হয়ে গেছে তুষারপাতের ফলে। পাইনবনের মাথাটাও পুরো সাদা।

বারান্দাটা পুরো ফাঁকা। ভাইমার বা তার কর্মচারীরা কেউ কোথাও নেই। বারান্দা ছেড়ে নীচে নামল অনীশ। সঙ্গে সঙ্গে তার দু-পা ডুবে গেল তুষারের মধ্যে। জমির ওপর অন্তত এক ফুট তুষার জমেছে। সারা রাত ধরে এতটা তুষারপাত হয়েছে তা ধারণা করতে পারেনি অনীশ। বাড়ির সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে পেঁজা তুলোর মতো তুষার মাড়িয়ে অনীশ এগোল বাড়িটার পিছন দিকে। বাড়িটাকে বেড় দিয়ে বাঁক ফিরতেই অনীশ কিছুটা তফাতেই দেখতে পেল ভাইমার আর তার এক কর্মচারীকে। ভাইমার তার কর্মচারীকে ধমকে বললেন, 'তুমি ওখানে গেছিলে কেন?'

কর্মচারীটা যেন মাথা নীচু করে জবাব দিল, 'এভাবে আর পারছি না স্যার।'

ভাইমার এরপর কিছু একটা যেন বলতে যাচ্ছিলেন তার লোকটাকে। কিন্তু অনীশকে দেখতে পেয়ে থেমে গেলেন। অনীশের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'সুপ্রভাত। ঘুম কেমন হল?'

অনীশ জবাব দিল, 'ভালো'।

ভাইমারের সেই লোকটা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাইমার তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যাও। খাঁচাগুলোর সামনে তেরপলের পরদা টাঙাবার ব্যবস্থা করো যাতে ঠান্ডা বাতাস আটকানো যায়।'

তার কথা শুনে লোকটা ধীরে ধীরে চলে গেল খাঁচাগুলোর দিকে।

সে চলে যাবার পর ভাইমার বললেন, 'এই নেকড়েগুলো বরফের দেশের প্রাণী। বরফ বা তুষারপাতে ওদের কিছু হয় না। কিন্তু ঠান্ডা বাতাসে ওরাও কাবু হয়ে যায়। সহ্য করতে পারে না। বাতাসের থেকে বাঁচার জন্য বরফে গর্ত খুঁড়ে থাকে। দেখেছেন কাল কেমন তুষারপাত হয়েছে। এমন আর দু-তিন দিন হলে সিঙ্করুট, নাথুলাপাস বন্ধ হয়ে যাবে।'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ। দেখলাম। কাল রাতে নেকড়েগুলোকে খেলতেও দেখলাম সামনের চত্বরে। তার মধ্যে একটা নেকড়ে কী বিশাল! সুন্দর! ওই নেকড়েটাই তো কাল খাঁচার গর্তে লুকিয়ে ছিল তাই না?'

ভাইমার হেসে বললেন, 'হ্যাঁ। ধবধবে সাদা বিশাল নেকড়ে। যাদের দেখলেন তাদের মধ্যে প্রথম ওই আসে এই ক্যাম্পে। ওকেই অন্য প্রাণীগুলোর দলপতি বলা যেতে পারে। এত সুন্দর প্রাণীগুলো মারার চেষ্টা হচ্ছে আপনি ভাবতে পারছেন!' বিষণ্নতা নেমে এল ভাইমারের মুখে।

অনীশ বলল, 'আমি এখন গ্রামে যাব কথা বলতে। দেখি ওদের মত পরিবর্তন করা যায় কিনা? তবে সময় তো বেশি নেই। হাতে আজ আর কালকের দিনটা আছে। পরশু ভোরে আমাকে ফিরতে হবে। এ দেশে আমাদের বন্যপ্রাণ সংস্থার প্রধান প্রতিনিধি যিনি, সেই ডক্টর মাধবনও আমাকে বলেছেন যে প্রাণীগুলোকে বাঁচাবার জন্য যেন আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি। একটা কথা আপনাকে বলতে পারি যে আমার পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হবে না।'

বিষণ্ন হেসে ভাইমার বললেন, 'চেষ্টা করে দেখুন ওই নরবু বলে লোকটাকে অভিযোগ ওঠাতে রাজি করাতে পারেন কিনা?' ভাইমার কিন্তু একবারও বললেন না যে গতরাতে নরবুর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল

কিনা? অনীশও তাকে প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করল না। ভাইমার এরপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে তুষারের মধ্যে দিয়ে এগোলেন অনীশকে কাঁটাতারের বাইরে বার করে দেবার জন্য। বেশ চিন্তাক্লিষ্ট দেখাচ্ছে তার মুখ।

অনীশ বাইরে বেরোবার সময় তিনি একবার শুধু বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফেরার চেষ্টা করবেন। দুপুরের পর থেকেই আবার গতকালের মতো প্রকৃতির রূপ বদলাতে শুরু করবে। ধীরে ধীরে তুষার পড়তে শুরু করবে।'

পাইনবনে প্রবেশ করল অনীশ। আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা গাছের পাতাগুলো আজ ধবধবে সাদা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বাতাসে পাইনবনের ডাল-পাতা থেকে টুপটাপ তুষারকণা ঝরে পড়ছে অনীশের গায়ে। বনটাকে যেন আজ আরও বেশি নিঝুম মনে হচ্ছে। অজানা কোনও এক কারণে যেন আজ থমকে আছে সারা বন। ঝিঁঝি পোকার ডাকও শোনা যাচ্ছে না। তারই মধ্যে দিয়ে এগিয়ে একসময় ঢাল বেয়ে নীচে নেমে গ্রামে পৌঁছে গেল অনীশ। গ্রামে নরবু সহ অন্যদের জমায়েত দেখে অনীশের মনে হল লোকগুলো যেন তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। কারণ অনীশ আজও গ্রামে ঢুকতেই নরবু তার হাতে গতদিনের মতোই একটা কাঠ-গোলাপের তোড়া দিয়ে তাকে সম্মান জানাল।

অনীশকে বেশ খাতির করে তারা একটা বাঁশের মাচায় বসাল। একজন একটা কাপে ধূমায়িত চা আর একটা পাত্রে চমরি গাইয়ের জমাট বাঁধা দুধ—'ছুরপি' দিয়ে গেল। একটা ছুরপির টুকরো মুখে ফেলে বার কয়েক চা-য়ে চুমুক দিল অনীশ। গ্রামের ঘরের চালাগুলো সাদা তুষারের চাদরে ঢেকে আছে। প্রথমে আসল প্রশ্নে না গিয়ে ঘরের চালগুলোর দিকে তাকিয়ে অনীশ বলল, 'বেশ তুষারপাত হয়েছে দেখছি!'

নরবু বলল, 'হ্যাঁ, এবার শুরু হল। আর দু-তিনদিনের মধ্যে পথঘাট কিছুই চিনতে পারবেন না। সবই বরফের তলায় চলে যাবে। এই কটা মাস আমাদের খুব কষ্টে কাটে। বাইরে বেরোনো যায় না, চারপাশে শুধু বরফ আর বরফ! খাবার দাবারেরও খুব কষ্ট। আর্মির লোকেরা কিছু

খাবার দিয়ে যায় তাতেই চলে যায়। পশুপাখিদের আরও কষ্ট। তাদের তো আর খাবার দেয় না কেউ। জানেন এ সময় খিদের জ্বালায় নেকড়েরা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। অনেক সময় ছাগল-ভেড়ার লোভে তারা গ্রামেও হানা দেয়।'

চা-পান শেষ হবার পর অনীশ এবার প্রশ্ন করল, 'কাল যা বললাম সে ব্যাপারে কী ঠিক করলে তোমরা?'

তার প্রশ্ন শুনে নরবু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি সরকারি লোক তাই তুমি অনুরোধ করায় ব্যাপারটা নিয়ে আমরা ভেবেছি। আপাতত আমরা তিনমাস সময় দিতে রাজি তাকে। তবে কিছু শর্ত আছে। আমাদের কাছ থেকেই তাকে মাংস কিনতে হবে। শীতের এই তিনমাস আমাদের গ্রামের রুটির ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। বেশি কিছু নয় চল্লিশ বস্তা আটা। পয়সা দিলে আমরাই সেগুলো সংগ্রহ করে আনব।

আমাদের গ্রামে কোনও স্কুল নেই। স্কুল খুলব। সেই স্কুলের একজন মাস্টারের বেতন দিতে হবে সাহেবকে। আমার নাতি মাস্টার হবে। আমার নাতি গ্যাংটক থেকে মাস্টারি পাশ করে ফিরছে। আজই তার গ্রামে ফেরার কথা। সেই চালাবে স্কুলটা। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা নেকড়েগুলোকে সামলাতে হবে সাহেবকে। ওই খামারের বাইরে তাদের বার করা চলবে না। যদি গ্রামের একটা মানুষেরও কোনও ক্ষতি হয় তবে আমরা খামারে আগুন লাগিয়ে দেব।'

অনীশ নরবুর কথা শুনে বুঝতে পারল যে ব্যাপারটা আপাতত মেনে নিতে রাজি হয়ে গেছে নরবু। হয়তো গতরাতে ভাইমারের সঙ্গে আরও কিছু বোঝাপড়া হয়ে গেছে নরবুর। সেটা অর্থনৈতিক লেনদেনও হতে পারে। নরবুর কথাই গ্রামের মানুষের কাছে শেষ কথা এখানে।

অনীশ বলল, 'ভাইমার সাহেব যদি তোমাদের শর্ত মেনে নেন তবে তোমরা সরকারকে জানাবে তো যে নেকড়ে খামারটা আপাতত এখানে থাকুক? চিঠি দিয়ে জানাতে হবে কিন্তু। সেটা আমি নিয়ে যাব। সরকারের ঘরে জমা দেব।'

নরবু বলল, 'আমরা কেউ লিখতে পড়তে জানি না। গতবার আমার

নাতিই চিঠিটা লিখে সরকারের ঘরে জমা দিয়েছিল। আমরা শুধু টিপসই দিয়েছিলাম। তুমি কাগজ তৈরি করো। নাতি ফিরলে সেটা দেখাব। সব ঠিক থাকলে টিপ সই দিয়ে দেব।'

পাহাড়ি লোকরা একবার কথা দিলে সেটা রাখে এটা শুনেছে অনীশ। যদিও নরবুর নাতির ওপর ব্যাপারটা কিছুটা ঝুলে রইল তবে সে শিক্ষিত ছেলে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাকে অনীশ বোঝাতে সক্ষম হবে। এই ভেবে অনীশ বলল, 'ঠিক আছে আমি কাগজ তৈরি করছি। নাতি এলে তাকে দেখিয়ে তবে সই কোরো। কিন্তু সে ঠিক আসবে তো? আমার হাতে শুধু কালকের দিনটাই আছে।'

নরবু বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। সে আজ রাতেই বা কাল ভোরে চলে আসবে।'

এরপর নরবুর সঙ্গে আরও কিছু টুকটাক কথা বলে অনীশ উঠে পড়ল। ড্রাইভার পবন তাকে ঢাল বেয়ে পাইনবনের মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে পবন বলল, 'একটা কথা আপনাকে বলা হয়নি স্যার। এই বোকেটা দেখে মনে পড়ল। কাল যখন নরবু গ্রাম ছেড়ে বেরিয়েছিল তখন তার হাতে কিছু ছিল না। কিন্তু যখন সে বন ছেড়ে বেরোল তখন তার হাতে এই কাঠগোলাপের বোকেটা ছিল। হয়তো বা এটা ভাইমার সাহেবই তাকে দিয়েছেন?'

অনীশ কথাটা শুনে হেসে বলল, 'না, ভাইমার সাহেবের এ ফুলে অ্যালার্জি আছে। যে কারণে গতকাল ফুলের বোকেটা ফেলে দিতে হল আমাকে। নরবু ওটা অন্য কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে। আমার ধারণা নরবুর সঙ্গে সাহেবের কোনও গোপন চুক্তি বা লেনদেন হয়েছে। যা নরবু অন্যদের বলতে চাচ্ছে না। ও কারণেই নরবু সাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। যাই হোক, যে ভাবেই হোক ব্যাপারটা ভালো হল। প্রাণীগুলো আপাতত কিছুদিনের জন্য বিপদমুক্ত হল।' কথাগুলো বলে পবনের থেকে বিদায় নিয়ে পাইনবনে ঢুকল অনীশ।

ক্যাম্পে ফিরে কোনও কাজ নেই। কাজেই গতদিনের মতো জঙ্গল ভেঙে উলটোদিকের ঢাল বেয়ে গাড়ির রাস্তায় নেমে এল অনীশ। আজ

রাস্তা তুষারে ঢাকা। মনটা বেশ খুশি লাগছে অনীশের। যে কাজের জন্য সে এসেছিল সে কাজে সম্ভবত সে সফল হতে চলেছে। প্রাণীগুলোকে আপাতত রক্ষা করার পথ পাওয়া গেছে। সরকার এখন আর গ্রামবাসীদের অজুহাত দিতে পারবে না প্রাণীগুলোকে মারার ক্ষেত্রে। তুষার মাড়িয়ে আগের দিনের মতোই হাঁটতে লাগল সে।

আগের দিন অনীশ যেখানে গিয়ে বসেছিল তার কাছাকাছি গিয়ে অনীশ দেখতে পেল গতদিনের সেই সাঁজোয়া আর্মি জিপটা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই পাথরটার ওপর বসে চুরুট খাচ্ছেন লেফটানেন্ট ছেত্রী।

অনীশ তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাবলাম হয়তো আপনার সঙ্গে এখানে এলে দেখা পাব। দেখা না হলে ফোন করতাম।'—একথা বলে তিনি পকেট থেকে একটা চুরুটের বাক্স বার করে অনীশের হাতে ধরিয়ে বললেন, 'এটা আমার উপহার। খাঁটি হাভানা চুরুট। আপনি রাখুন।'

অনীশ খুব বেশি ধূমপান না করলেও বাক্সটা নিল। তার থেকে একটা চুরুট বার করে মুখে দিয়ে লেফটানেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাক্সটা ওভারকোটের পকেটে রাখল।

লেফটানেন্ট ছেত্রীই তার লাইটার দিয়ে অনীশের চুরুটটা জ্বালিয়ে দিলেন। বেশ কয়েক মুহূর্ত দুজনে নিঃশব্দে ধূম্র উদ্‌গিরণের পর ছেত্রী জানতে চাইলেন, 'গ্রামে গেছিলেন? কী বলল ওরা?'

অনীশ সতর্ক হয়ে গেল। ছেত্রীরা চাচ্ছেন না ক্যাম্পটা এখানে থাকুক। হয়তো দু-পক্ষের মিটমাট হতে চলেছে শুনলে ব্যাপারটায় তারা বাগড়া দিতে পারে। তাই সে কৌশলে বলল, 'তেমন কিছু নয়। ওদের বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করছি আর কী।'

লেফটানেন্ট এরপর জানতে চাইলেন, 'ক্যাম্পের সব কর্মচারীকে দেখেছেন আপনি? আমার ফাইলে দেখা ছবির সঙ্গে কারও মিল পেলেন?'

অনীশ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সবাইকে দেখেছি। তবে আপনার ফাইলের

ছবির সঙ্গে কারো মিল নেই।'

অনীশের মনে হল যে উত্তরটা শুনে ঠিক যেন খুশি হলেন না ছেত্রী। কী যেন একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, 'আর নেকড়েগুলোকে দেখেছেন?'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ, সব কটাকে দেখেছি। কাল চাঁদের আলোতে তুষারপাতের মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছিল ওরা। খুব সুন্দর প্রাণী। কিন্তু ওরাতো মানুষ নয়, ওরাও ওয়ান্টেড নাকি?'

অনীশ হেসে কথা শেষ করলেও মৃদু খোঁচা ছিল তার শেষ কথায়। কিন্তু লেফটানেন্ট সেটা গায়ে মাখলেন না। তিনি বললেন, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার! ওপারের সেনারা মানে চীন সেনারাও নেকড়েগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী! সীমান্তে দু-দেশের সেনাদের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং হয় জানেন নিশ্চয়ই? কাল তেমনই একটা মিটিং ছিল। ওদের সেনাদের কাছে কীভাবে খবর গেছে যে গ্রামবাসী আর সরকার ক্যাম্পটা তুলে দিতে চায়। ওরা বলছে ওরা নেকড়েগুলোকে নিতে চায়। নেকড়েগুলোতো ওদেশ থেকেই এদেশে ঢুকেছিল তাই ওরা প্রাণীগুলোর দাবিদার। কয়েকজন ভারতীয় নাগরিক পথ ভুলে ওদেশে ঢুকে কিছুদিন হল ওদের সেনাদের হাতে আটকে আছে। নেকড়েগুলোকে পেলে তাদেরও মুক্তি দেবার প্রস্তাব দিচ্ছে ওরা। অথচ যে সব নির্দোষ ভারতীয় নাগরিককে ওরা বন্দি করে রেখেছে তাদের কিছুতেই আগে মুক্তি দিতে রাজি হচ্ছিল না ওরা। খালি বলছিল যে ওই নিরীহ ভারতীয় নাগরিকরা নাকি আসলে গুপ্তচরবৃত্তি করতে ঢুকেছিল ওদেশে। তাই তাদের হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। হঠাৎ চীনা সৈনিকরা এত বন্যপ্রাণপ্রেমী হয়ে উঠল কেন বুঝতে পারছি না।'

অনীশ বেশ আশ্চর্য হল তার কথা শুনে। একইসঙ্গে তার ভালোও লাগল কথাটা জেনে। সে বলল, 'প্রস্তাবটা তো ভালোই। প্রাণীগুলো তাহলে তাদের দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেই তো সবদিক বজায় থাকে। ক্যাম্পও থাকল না আবার প্রাণীগুলোও বাঁচল।'

অনীশের কথা শুনে লেফটানেন্ট বললেন, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়।

প্রাণীগুলো আমরা এভাবে তুলে দিতে পারি না ওদের হাতে। একথা ঠিক যে ক্যাম্পের নেকড়েগুলো ওদেশ থেকেই এদেশে এসেছে। কিন্তু ওরা এখন আমাদের সম্পত্তি। সুন্দরবনের বাঘও তো সীমানা মানে না। ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত করে। যখন যে দেশে বাঘ ধরা পড়ে তখন সেটা তারই সম্পত্তি হয়। এক্ষেত্রেও তেমনই ব্যাপার। ওভাবে নেকড়েগুলোর হস্তান্তর করা যাবে না। নেকড়েগুলোকে আমরা বাঁচিয়ে রাখব না মারব সেটা এখন একান্তই আমাদের দেশের সরকারের ব্যাপার।'

কথাটা শুনে অনীশ চুপ করে গেল। সামান্য কটা নিরিহ প্রাণীর দামের চেয়েও, এমনকী মানুষের জীবনের চেয়েও দু-দেশের সরকারি ফাইলের লাল ফিতের ক্ষমতা অনেক বেশি।

কিন্তু এরপরই চারপাশে হঠাৎ কেমন যেন অন্ধকার নেমে এল। ঘড়িতে সবে মাত্র বেলা দশটা বাজে। আকাশের দিকে তাকিয়ে লেফটানেন্ট বললেন, 'আজ দুপুরের আগে থেকেই তুষারপাত হবে মনে হয়। চলুন আপনাকে নেকড়ে ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে আসি। গাড়িতে উঠে বসুন।'

সত্যি চারপাশের প্রকৃতি কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন অন্য রূপ ধারণ করেছে। ব্যাপারটা অনুধাবন করে অনীশ লেফটানেন্টের সঙ্গে চড়ে বসল তার গাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এসে থামল ক্যাম্পের কাছাকাছি জায়গাতে। গাড়ি থেকে নামার সময় ছেত্রী সাহেব শুধু বললেন, 'কোনও প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবেন আমাকে।'

গাড়ি থেকে নেমে অনীশ এগোল ক্যাম্পের দিকে। আজও ক্যাম্পের সামনের চত্বরে কোনও লোকজন নেই। অনীশ গেট খুলে ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হল। তার সঙ্গে তীক্ষ্ণ বাতাস সোঁ-সোঁ শব্দে ধেয়ে আসতে লাগল পাহাড়ের দিক থেকে। কোনওরকমে মাথার টুপিটাকে সামলে তুষারের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে অনীশ বারান্দায় উঠে প্রবেশ করল তার ঘরে। হঠাৎ তার খেয়াল হল যে হাতের পুষ্পস্তবকটা তার সঙ্গে আনা উচিত হয়নি। সে সেটা জানলা গলিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিল।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরে প্রবেশ করলেন ভাইমার। তিনি প্রথমে বললেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত যে দ্বিপ্রহরে আপনার খাবারের ব্যবস্থা সম্ভব হল না বলে। ভাঁড়ারে একদানাও খাবার নেই।' ভাইমারের মুখমণ্ডল বেশ থমথমে, চিন্তান্বিত।

অনীশ বলল, 'আপনি বিব্রত হবেন না। দুটো দিন চালিয়ে নেবার মতো শুকনো খাবার আমার কাছে আছে।'

ভাইমার এরপর বললেন, 'কী বলল গ্রামবাসীরা?'

অনীশ উৎফুল্লভাবে ব্যাপারটা জানাল ভাইমারকে। কিন্তু ভাইমারের মুখমণ্ডলের তেমন কিছু পরিবর্তন হল না।

তা দেখে অনীশ বলল, 'আপনি কি ওদের প্রস্তাবে সম্মত নন? আপনি এত চিন্তান্বিত কেন?'

ভাইমার বললেন, 'আমি সম্মত। আপনি চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করুন। আসলে আমি খুব মানসিক চাপে আছি। ওপার থেকে রসদ নিয়ে দলটা আজও, এখনও এল না। আমাদের কথা বাদ দিন। কিন্তু দু-দিন হল পশুগুলোর মুখে একটুকরো খাবার তুলে দিতে পারিনি।'

অনীশ বলল, 'আপনি আজকের রাতটা দেখুন। যদি রসদ না আসে তবে কাল সকালে গ্রামে গিয়ে অন্তত পশুগুলোর জন্য মাংস সংগ্রহ করে আনব। আশা করি তারা আপত্তি করবে না।'

ভাইমার শুধু বললেন, 'দেখা যাক কী হয়?' একথা বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। ভাইমার চলে যাবার পর দরজা-জানলা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল অনীশ। বাইরে থেকে ভেসে আসতে লাগল বাতাসের শব্দ। বাতাসের ধাক্কায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠতে লাগল দরজা-জানলাগুলো।

শেষ বিকালে বিছানা থেকে উঠল অনীশ। দরজাটা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল অনীশ। তুষারপাত হয়েই চলেছে। পেঁজা তুলোর মতো তুষার ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে আকাশ থেকে। এত ঠান্ডা যে বাইরে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না অনীশ। পিছু ফিরে সে যখন ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে ঠিক তখন একটা জিনিসের উপর নজর পড়ল তার।

কাঠের প্যানেল অলা দরজার পাল্লার নীচের দিকে কেমন যেন লম্বা লম্বা দাগ! কাঠের চিলকা উঠেছে সেখান থেকে। এই আঁচড়ের দাগগুলো কি আগেই ছিল? কে জানে?

ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে সেজবাতিটা জ্বালাল অনীশ। ঠিক তারপরই বাইরে ঝুপ করে অন্ধকার নামল। অনীশ কাগজকলম বার করে চুক্তিপত্রটা আর গ্রামবাসীরা যে চিঠি সরকারকে দেবে তার খসড়া তৈরি করতে বসল। লিখতে লিখতেই অনীশ বুঝতে পারল বাইরে বাতাসের দাপট আবার শুরু হয়েছে। দরজা-জানলার পাল্লাগুলো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। আর এরপরই হঠাৎ একসময় বাড়ির পিছন দিক থেকে হঠাৎ ভেসে আসতে লাগল নেকড়েগুলোর ডাক। না, ঠিক গর্জন নয়, যেন করুণ স্বরে আত্মবিলাপ করে চলেছে প্রাণীগুলো।

ভাইমারের কথাটা মনে পড়ল অনীশের। প্রাণীগুলো দু-দিন খায়নি। সম্ভবত অন্ধকার নামার পর ঘুম ভেঙে খিদের জ্বালায় কাঁদছে ওরা। কী করুণ সেই ডাক! লেখা থামিয়ে কিছুক্ষণ সেই ক্ষুধার্ত প্রাণীগুলোর কান্না শুনল অনীশ। তারপর আবার নিজের কাজে মন দিল। রাত আটটা নাগাদ লেখার কাজ শেষ হল অনীশের। ততক্ষণে অবশ্য নেকড়ের কান্না থেমে গেছে। বিস্কুট আর জল খেয়ে বাতি নিভিয়ে বিছানায় চলে গেল অনীশ।

বেশ অনেকক্ষণ ঘুমাবার পর হঠাৎ কীসের একটা শব্দে যেন ঘুম ভেঙে গেল অনীশের। তার রেডিয়াম লাগানো ঘড়িতে রাত আড়াইটে বাজে। শব্দটা বুঝতে পারল সে। দরজাটা মাঝে মাঝে কাঁপছে। তাতেই শব্দ হচ্ছে। বাতাসের ঝাপটা নাকি? কিন্তু তাতে তো এতটা শব্দ হবার কথা নয়। ঠিক যেন কেউ ঘা দিচ্ছে দরজায়। অনীশকে কেউ ডাকছে নাকি? সে একবার বলল, 'কে?' তার গলার আওয়াজে মুহূর্তের জন্য শব্দটা যেন থামল। তারপর আবার হতে শুরু করল।

অনীশ কম্বল ছেড়ে উঠে বসে টর্চের আলো ফেলল দরজার ওপর। আলোটা ওপর থেকে নামতে নামতে স্থির হয়ে গেল কাঁপতে থাকা দরজার নীচের দিকে। চমকে উঠল অনীশ। দরজার একটা পাল্লার নীচের

দিকে একটা ছোট ছিদ্র তৈরি হয়েছে। আর তার মধ্যে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে তীক্ষ্ণ নখর যুক্ত একটা থাবা! নেকড়ের থাবা। হিংস্র থাবাটা একবার ফুটো দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকছে, আবার বেরোচ্ছে! প্রাণীটা যেন পাল্লার নীচের প্যানেলটা ভেঙে ঘরের ভিতর ঢোকার চেষ্টা করছে! ব্যাপারটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অনীশ খাট ছেড়ে লাফিয়ে নেমে টেবিলের বাতিটা জ্বালিয়ে নিল। হ্যাঁ, সে এবার আরও স্পষ্ট দেখতে পেল সেই থাবাটা। সেটা ঘরে ঢুকে বাইরে বেরোবার সময় প্রচণ্ড আক্রোশে যেন ফালা ফালা করে দিচ্ছে পাল্লা সংলগ্ন কাঠের মেঝেটাকে। ভাইমার আর তার সঙ্গীরা এখন কোথায়? অনীশ একবার চিৎকার করার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রচণ্ড উত্তেজনায় তার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। আর এরপরই আরও ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল।

পাল্লার নীচের ফুট দুই চওড়া কাঠের প্যানেলটা হঠাৎই পাল্লা থেকে খসে ছিটকে পড়ল ঘরের ভিতর। কয়েক মুহূর্তর নিস্তব্ধতা। আর তারপরই সেই ফোকর দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল একটা বিশাল নেকড়ের মাথা! বাতির আলোতে দেখা যাচ্ছে প্রাণীটার চোয়ালে সার সার হিংস্র দাঁতের পাটি, টকটকে লাল জিভ। লোলুপ দৃষ্টিতে অনীশের দিকে তাকিয়ে আছে প্রাণীটা। তার চোয়ালের দু-পাশ বেয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে।

হিম হয়ে গেল অনীশের শরীর। সম্মোহিতর মতো বেশ কিছুক্ষণ তারা চেয়ে রইল পরস্পরের দিকে। প্রাণীটা এবার মাথা দিয়ে চাপ দিতে লাগল পাল্লার ওপরের প্যানেলটাকে ভেঙে ফেলার জন্য। একটা মৃদু মড়মড় শব্দ হতে লাগল সেই কাঠের প্যানেল থেকে। এবার হুঁশ ফিরল অনীশের। ওই কাঠের প্যানেলটা ভেঙে দিতে পারলেই হিংস্র প্রাণীটা তুড়ি মেরে ঘরের ভিতরে ঢুকে যেতে পারবে। অনীশের কাছে কোনও অস্ত্র নেই ক্ষুধার্ত নেকড়েটাকে রোখার মতো। মুহূর্তর মধ্যে কর্তব্য স্থির করে নিল অনীশ। এতে যা হবার তা হবে। অনীশ টেবিল থেকে তুলে নিল তেলভর্তি কাচের বাতিটা। তারপর দু-পা এগিয়ে নেকড়ের মাথাটা লক্ষ্য করে বাতিটা প্রচণ্ড জোরে ছুড়ে মারল। চৌকাঠের কাছে নেকড়ের মাথার

ওপর আছড়ে পড়ে জোর শব্দে চুরমার হয়ে গেল বাতিটা। একটা রক্ত জল করা বীভৎস আর্তনাদ করে মাথাটা দরজার বাইরে বার করে নিল শ্বাপদটা। সব কিছু নিস্তব্ধ হয়ে গেল এরপর।

অন্ধকার ঘর। অনীশের হঠাৎ মনে হল, প্রাণীটা যদি আবার ফিরে আসে তখন? জানলাটা খুলে দিল সে। আবছা আলোতে ভরে উঠল ঘর। বাইরে তখনও তুষারপাত হয়েই চলেছে। বাকি রাতটা সেই আঁধো অন্ধকার ঘরে বসে দরজার দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিল অনীশ। তবে নেকড়েটা আর ফিরে এল না। শেষ রাতে তুষারপাত যেন কিছুটা কমে এল। আবছা আলো ফুটে উঠল বরফ পাহাড়ের মাথায়।

৫

ভোর হলেও দরজা খুলে বাইরে বেরোতে ঠিক সাহস পেল না অনীশ। বলা যায় না প্রাণীটা হয়তো এখনও খোলা আছে। দরজার বাইরেই হয়তো বা সে ঘাপটি মেরে বসে আছে অনীশের জন্য। ঘরের ভিতর থেকে অনীশ বার কয়েক ডাকল ভাইমারের নাম ধরে। কিন্তু বাইরে থেকে কোনও সাড়া মিলল না। বন্ধ ঘরে বসে তার কী করা উচিত তা ভাবতে লাগল অনীশ।

সময় এগোতে লাগল। বেলা আটটা নাগাদ তখন বাইরে বেশ একটু রোদ উঠেছে, সে সময় অনীশ বাইরের চত্বর থেকে যেন বেশ কিছু লোকজনের গলার শব্দ, ঘোড়ার ডাক এ সব শুনতে পেল। সাহস করে এবার সে দরজা খুলে ফেলল। সে দেখতে পেল চত্বরের ওপাশে কাটাতারের বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একদল লোক। কিছু পশুও আছে তাদের সঙ্গে। ভাইমারকেও দেখতে পেল অনীশ। বাড়ির পিছন থেকে বেরিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তিনি এগোচ্ছেন দরজা খোলার জন্য।

দরজা খুলে দিলেন ভাইমার। হুড়মুড় করে পশুদের নিয়ে বরফ ঢাকা

চত্বরে প্রবেশ করল লোকগুলো। জনা সাতেক ছোটখাটো চেহারার লোক। তাদের পরনে লম্বা ঝুলের নোংরা পোশাক, পায়ে লোহার বেড়ি লাগানো হাই হিল বুট, মাথায় চামড়ার টুপি। তাদের সঙ্গে পাঁচটা পশু। তবে তারা ঘোড়া নয়, ছোটখাটো চেহারার ভারবাহী খচ্চর। তাদের পিঠে চাপানো পেট ফোলা চটের বস্তা। রসদ এসে গেছে সম্ভবত। চত্বরের ভিতরে ঢুকে এক জায়গাতে জটলা বেঁধে দাঁড়াল তারা। ভাইমার তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। অনীশ এবার বারান্দা থেকে নেমে বরফের মধ্যে দিয়ে গিয়ে উপস্থিত হল তাদের সামনে।

লোকগুলোর সঙ্গে অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছিলেন ভাইমার। ভাষাটা হয়তো বা চাইনিজ হবে। কারণ লোকগুলোর গড়নে, মুখমণ্ডলের মধ্যে লিয়ান ছাপ স্পষ্ট। ভাইমারও বলেছিলেন রসদবাহী লোকেরা ওপারের।

অনীশ তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই কথা থামিয়ে তার দিকে তাকালেন ভাইমার। তার মুখ গম্ভীর, চোখে-মুখে রাত্রি জাগরণের স্পষ্ট ছাপ। অনেকটা শুষ্কভাবেই তিনি বললেন 'সুপ্রভাত'।

অনীশ গতকালের ব্যাপারটা এ লোকগুলোর সামনে বলা ঠিক হবে কিনা ভেবে একটু চুপ করে রইল। সম্ভবত ভাইমার তার মনের ভাব পাঠ করে বলে উঠলেন, 'কথা বলতে পারেন। এরা চীনা ভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা বোঝে না।'

অনীশ বলল, 'কাল রাতে একটা নেকড়ে আমার ঘরে হানা দিয়েছিল। দরজার কাঠের প্যানেল ভেঙে ঘরের ভিতর মাথাও গলিয়ে ফেলেছিল। আমি বাতিটা ছুড়ে কোনওরকমে তাকে আটকাই। আর একটু হলেই...

তার কথা শুনে ভাইমার বললেন, 'তাই নাকি! তবে সেই বড় ধূসর নেকড়েটা। কাল কীভাবে যেন খিদের জ্বালায় খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল সে। শেষ রাতে তাকে খাঁচায় ফেরানো হয়। ঠান্ডা ও খিদের জ্বালায় হিংস্র হয়ে উঠে সম্ভবত সে ও কাণ্ড ঘটিয়েছে। এই লোকগুলো যদি গতকাল বিকালে আসতে পারত তবে গত রাতে কোনও দুর্ঘটনাই ঘটত না। এখন অবশ্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

অনীশ এরপর বলল, 'গ্রামবাসীদের চিঠিটা আর আপনার সঙ্গে তাদের

চুক্তিপত্র দুটোই তৈরি করে ফেলেছি। একবার দেখে নেবেন নাকি?'

তার কথা শুনে ভাইমার কেন জানি মৃদু চমকে উঠে বললেন, 'আপনি এখন গ্রামে যাবেন নাকি?'

অনীশ বলল, 'কেন? তেমনই তো কথা ছিল। নরবুর নাতির ফিরে আসার কথা। সেটা সে দেখার পর গ্রামের লোকেরা সেটায় স্বাক্ষর করবে। চুক্তিপত্রটাও আপনাদের উভয়পক্ষকে দিয়ে স্বাক্ষর করাতে হবে।'

ভাইমার আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রথমে বললেন, 'যে-কোনও সময় কিন্তু আবার আকাশের গতিপ্রকৃতি বদলে যেতে পারে, আবার তুষারপাত শুরু হতে পারে। তাই বলছিলাম আর কী।'

একথা বলার পর তিনি কেমন যেন নিস্পৃহভাবে বললেন, 'আমাকে এখন কাগজগুলো দেখাবার দরকার নেই। আগে গ্রামে যান, দেখুন ওরা কী বলে? ওরা সই করে দিলে আমিও সই করে দেব। আপনি তো এখানে ফিরবেনই।'

এরপর আর কথা বাড়ালেন না ভাইমার। তিনি এগোলেন বাড়ির পিছন দিকে যাবার জন্য। পশুদের নিয়ে তাকে অনুসরণ করল সেই চীনাদের দলটা। অনীশ ঘরে ফিরে এল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল তার কাগজপত্র নিয়ে। বাড়ির পিছন দিক থেকে লোকজনের গলার শব্দ ভেসে আসছে। দরজা খুলে কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে এসে পাইনবনের ভিতর দিয়ে সে রওনা হল গ্রামের দিকে। হাঁটতে একটু কষ্ট হচ্ছিল তার। পাইনবনের ভিতরেও তুষার জমা হয়েছে। কোথাও কোথাও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে বরফে। কিন্তু সেই বরফ ভেঙেই একসময় সে পৌঁছে গেল গ্রামে।

গ্রামটা যেন ধীরে ধীরে বরফের তলাতেই চলে যাচ্ছে। অনেক বাড়ির অর্ধেক দরজা বরফে ঢেকে গেছে। ঘরের বাইরে ভিড়ও তেমন নেই। গ্রাম প্রধান নরবু আর কিছু পুরুষ মানুষ সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল অনীশের জন্য। তাদের সঙ্গে ড্রাইভার পবনও ছিল। অনীশ গ্রামে ঢুকতেই এদিনও নরবু তার হাতে কাঠগোলাপের স্তবক তুলে দিল। তবে তার চোখে-মুখে কেমন যেন একটা চাপা উৎকণ্ঠার ভাব। ফুলটা সে

অনীশকে দিল ঠিকই কিন্তু তাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে বসাল না। অনীশ নরবুর উদ্দেশ্যে বলল, 'কাগজ তৈরি করে এনেছি। তোমার নাতি কোথায়? তাকে ডাকো?'

নরবু জবাব দিল, 'সে এখনও ফেরেনি। তার জন্যই অপেক্ষা করছি আমরা।'

'ফেরেনি!' বিস্মিত ভাবে বলল অনীশ।

নরবু বলল, 'না, এখনও ফেরেনি। গতকাল সন্ধ্যার আগেই তার ফেরার কথা ছিল। পায়ে হেঁটেই ফেরার কথা তার। গ্যাংটক থেকে গাড়ি তাকে ওপরে পাসের মুখে পৌঁছে দিয়েছিল। সে যে পাসে ঢুকেছিল সে খবরও পেয়েছি। কিন্তু তারপর আর তার কোনও খবর নেই। সে না এলে কিছু হবে না।'

এর জবাবে অনীশ বলল, 'তোমরা চাইলে লেখাটা আমি পড়ে শোনাতে পারি।'

নরবু প্রত্যুত্তরে স্পষ্টভাবে বলল, 'আপনি এখন ফিরে যান। নাতিটার না ফেরা নিয়ে আমরা সকলে খুব চিন্তায় আছি। সে ফিরে এলে আমরা আপনাকে খবর দেব।'

সমস্যায় পড়ে গেল অনীশ। পরদিনই তো তাকে ফেরার পথ ধরতে হবে। তার মধ্যে যদি নরবুর নাতি না ফেরে? অনীশ পবনকে বলল, 'তুমি একটা কাজ করো। আমাদের সঙ্গে তো গাড়ি আছে, সেটা নিয়ে তুমি পাসে গিয়ে, সম্ভব হলে পাসের একটু ভিতরে গিয়ে তার সন্ধান নিতে পারো। কিন্তু মুশকিল হল তুমি তাকে চিনবে কীভাবে?'

পবন বলল, 'আমি তাকে চিনি স্যার। এর আগে যখন গ্রামে এসেছিলাম তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।'

অনীশ আর তার ড্রাইভারের কথোপকথন শুনে নরবু ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, দেখো তাকে খুঁজে পাও কিনা। এমনও হতে পারে কোথাও সে তুষারপাতে আটকে পড়েছে। তোমরা তাকে খুঁজে না পেলে আমরা গ্রামের লোকরা মিলে আশেপাশের জায়গাগুলোতে তাকে খুঁজতে বেরোব।'

অনীশ এরপর আর সেখানে দাঁড়াল না। পবনকে নিয়ে সে গ্রাম

ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পবন বলল, 'ছেলেটা না ফেরায় এখন ওদের মনে অন্য ভয় কাজ করতে শুরু করেছে।'

অনীশ প্রশ্ন করল, 'কী ভয়?'

পবন বলল, 'গতকাল সন্ধ্যায় খামার থেকে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ডাক ভেসে আসছিল গ্রামে। ওদের মনে একটা আশঙ্কা দানা বাঁধছে যে...

পবন তার কথা শেষ না করলেও তার সম্পূর্ণ বক্তব্য বুঝতে কোনও অসুবিধা হল না অনীশের। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য। সেজ বাতির আলোতে দরজার ফোকর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেই নেকড়েটা। তার সেই লোলুপ ক্ষুধার্ত দৃষ্টি, লাল জিভ, চোয়ালের তীক্ষ্ণ দাঁত। সেই নেকড়েটাই কোনওভাবে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটায়নি তো?'

অনীশের ভিতরটা কেঁপে উঠল। মুখে সে শুধু বলল, 'তেমন কিছু ঘটলে ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর হবে।'

পবন বলল, 'হ্যাঁ, সাহেব, নেকড়ে সবসুদ্ধ খামারে আগুন লাগিয়ে দেবে ওরা।'

বাকিটা পথ তারা দু-জন কেউ কোনও কথা বলল না। আশঙ্কা দানা বাঁধছে দুজনের মনেই। বন পেরিয়ে ঢাল বেয়ে বড় রাস্তায় নামল তারা। ক্যাম্পের দিকে কিছুটা এগোতেই পিছন থেকে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। আর্মি গাড়িটা তাদের পাশে এসেই দাঁড়াল। চালকের পাশের আসনেই বসে আছেন লেফটানেন্ট ছেত্রী। পবনকে একবার ভালো করে দেখে নিয়ে তিনি অনীশকে প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন এখন?'

অনীশ বলল, 'আমি এখন ক্যাম্পেই ফিরছি। তবে আমার ড্রাইভারকে পাঠাচ্ছি পাসের মুখটাতে। শহর থেকে একটা ছেলের ও পথ ধরেই গতকাল গ্রামে ফেরার কথা ছিল। সে ফেরেনি। তাই আমার ড্রাইভার তার খোঁজে ওদিকে যাচ্ছে।'

ছেত্রী এরপর বললেন, 'শুনলাম আপনি নাকি কিছুদিনের জন্য ওই ক্যাম্পেই থাকছেন? এখন ফিরছেন না?'

অনীশ বিস্মিতভাবে বলল, 'আমার তো কালই ফিরে যাবার কথা।

এ খবর আপনাকে কে দিল?'

লেফটানেন্ট বললেন, 'আমাকে নয়, আমার এক সৈনিককে কথাটা বলেছেন ভাইমার। গতকাল সন্ধ্যায় যখন তুষারপাত হচ্ছিল তখন টহল দিয়ে ফিরছিল আমার এক সৈনিক। ক্যাম্পের গেটের মুখে তার সঙ্গে ভাইমারের দেখা হয়। গত কয়েকমাস ধরে আমাদের কারও সঙ্গে কথা বলতেন না তিনি। কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় তিনি নিজেই সেই সৈনিককে ডাকেন। তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। কথা প্রসঙ্গে তিনিই তাকে ব্যাপারটা বলেন।'

অনীশ বলল, 'না না, আমার তেমন কোনও কথা হয়নি ভাইমারের সঙ্গে।'

অনীশের জবাব শুনে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল লেফটানেন্টের মুখ। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'থাকুন বা নাই থাকুন আপনি কিন্তু গতরাতের মতো বাইরে ঘোরাঘুরি করবেন না। সীমান্ত অঞ্চল। রাস্তা চিনতে না পেরে ওদেশে ঢুকে পড়লেই পিপিলস্ আর্মির হাতে গুপ্তচর সন্দেহে বলি হবেন। এভাবে অনেক নিরীহ মানুষ বন্দি হয়েছে ওদের কাছে।'

এবার তার কথা শুনে আরও অবাক হয়ে গেল অনীশ। সে বলল, 'আমি কাল ঘরে ঢোকার পর বাইরে বেরোইনি তো!'

লেফটানেন্ট ছেত্রী বলল, 'কিন্তু আমাদের এক গার্ড নাইট ভিশন ফিল্ড গ্লাসে আপনাকে দেখতে পেয়েছিল বলল। তার তো ভুল দেখার কথা নয়!'

অনীশ এবার বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, 'হ্যাঁ, সে ভুল দেখেছে। আমি বাইরে যাইনি।'

দু-পাশে মাথা নাড়লেন ছেত্রী। যেন তিনি বুঝতে পারছেন না সেই গার্ড নাকি অনীশকে সত্যি বলছে। এরপর তিনি আর কথা বাড়ালেন না। তার ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করলেন গাড়ি এগোবার জন্য।

লেফটানেন্ট চলে যাবার পর ক্যাম্পের দিকে এগোল তারা দু-জন। গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল তারা। পবনকে অনীশ বলল, 'ছেলেটার খোঁজ

জেনে সঙ্গে সঙ্গে জানিও আমাকে।'

পবন বলল, 'আচ্ছা স্যার।'

সে গাড়ি নিয়ে চলে যাবার পর কিছুটা হেঁটে তার কাঁটা ঘেরা ক্যাম্পের ভিতর প্রবেশ করল অনীশ। বরফ ঢাকা চত্বরটার ঠিক মাঝখানে তাঁবু খাটাচ্ছে চীনাগুলো। তাদের ভারবাহী পশুগুলো অবশ্য সেখানে নেই। হয়তো তারা বাড়ির পিছনের দিকেই রয়ে গেছে। ভাইমারকেও দেখতে পেল না অনীশ। ঘরে ঢুকে হঠাৎ তার খেয়াল হল ফুলের বোকেটা বাইরে ফেলা হয়নি। জানলাটা বন্ধ। একটু পরে সেটা ফেলে দিলেও চলবে। সেটা টেবিলের ওপর রেখে জিরিয়ে নেবার জন্য খাটের ওপর বসল অনীশ।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল দরজাটার সেই ভাঙা জায়গার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল গত রাতের ভয়ঙ্কর স্মৃতি। খুব জোর বেঁচে গেছে সে। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই তার খেয়াল হল ঘরে বাতি নেই। নেকড়ে আর আসবে না ঠিকই কিন্তু বাতি ছাড়া চলবে কীভাবে? ভাইমারের কাছ থেকে একটা বাতি জোগাড় করার জন্য খাট ছেড়ে নেমে ঘরের বাইরে বেরোল অনীশ। বাইরে বেরিয়েই সে দেখতে পেল বারান্দার অন্যপ্রান্ত থেকে এগিয়ে আসছেন ভাইমার। অনীশও এগোল তার দিকে।

ভাইমার তাকে মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, 'কখন ফিরলেন?'

অনীশ বলল, 'এই মাত্র। তবে কাজ এগোয়নি। নরবুর নাতির গ্রামে ফেরার কথা ছিল, সে ফেরেনি। সে না ফিরলে কী হবে বুঝতে পারছি না। কাল তো আমাকে ফিরতে হবে।'

অনীশের কথা শুনে এ ব্যাপারে ভাইমার খুব বেশি উদ্বিগ্ন হলেন বলে মনে হল না। প্রথমে তিনি বললেন, 'চলে যেতে হলে যাবেন। তারপর যেন একটু মজা করার ঢঙেই বললেন, 'আমি তো ভাবছিলাম আপনি হয়তো এখানেই থেকে যাবেন। এই পাহাড়, এই প্রকৃতি, এই সুন্দর সুন্দর প্রাণীগুলোকে ছেড়ে আপনি যাবেন না।'

অনীশের মনে পড়ে গেল লেফটানেন্ট ছেত্রীর কথা। তাহলে হয়তো সত্যিই ভাইমার মজা করে হলেও এ কথাটা বলেছেন সেই সৈনিককে।

অনীশ হেসে ভাইমারকে বলল, 'এমন সুন্দর জায়গাতে থাকতে পারলে ভালোই হত। কিন্তু তার কি আর উপায় আছে।'

ভাইমার নিঃশব্দে হাসলেন তার কথা শুনে।

অনীশ এরপর বলল, 'আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। গতকাল বাতিটা ভেঙে গেছে। একটা বাতি লাগবে।'

ভাইমার বললেন, 'তেলের বাতি নেই। একটা মোমবাতি দিচ্ছি। আর তো মাত্র আজকের রাতের ব্যাপার। খুব অসুবিধা হবে না আশাকরি।'

এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে মোম নিয়ে ফিরে এলেন ভাইমার। সেটা তিনি অনীশের হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি এই চীনাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকব। সম্ভবত আজ আর আপনার সঙ্গে দেখা হবে না আমার। তাই আগাম শুভরাত্রি জানিয়ে রাখলাম আপনাকে।'

আকাশটা আবার কেমন যেন পালটাতে শুরু করেছে। তুষারপাত শুরু হবে আবার। মোমবাতিটা নিয়ে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়ল অনীশ।

বিকাল পাঁচটা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে আবার বাইরে বেরোল সে। তুষারপাত হচ্ছে। চীনাদের তাঁবু খাটানো হয়ে গেলেও তারা বাইরে তুষারপাতের মধ্যেই বসে আছে। ঝিরিঝিরি তুষারপাত তাদের পোশাককেও সাদা করে দিয়েছে। অনীশ হঠাৎ দেখতে পেল কাঁটাতারের বাইরে গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার গাড়িটা। পবন ফিরে এসেছে। বারান্দা থেকে নেমে চীনাদের জটলাটার পাশ কাটিয়ে অনীশ গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পবন বলল, 'পাসের ভিতরে ঢুকেও অনেকটা খুঁজে এলাম স্যার। তার দেখা মেলেনি। তবে একজন খচ্চরঅলা বলল যে গতকাল অন্ধকার নামার পর ওই বয়সেরই একটা ছেলে নাকি পাস দিয়ে আসছিল।'

অনীশ বলল, 'পেলে না যখন তখন আর কী করা যাবে! তুমি তবে গ্রামে ফিরে যাও। কাল আটটা নাগাদ চলে এসো। ফেরার জন্য রওনা হতে হবে।'

পবন বলল, 'হ্যাঁ, সার। আমি ঠিক সময় চলে আসব।'

ছেলেটাকে যখন পাওয়া গেল না তখন সম্ভবত আর কিছুই করার নেই অনীশের। ভাইমার যদি গ্রামবাসীদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিতে

পারেন ভালো, নইলে তার ক্যাম্পের ভাগ্যে যা আছে তা হবে। বিষণ্ণ ভাবে সে পিছু ফিরল ঘরে যাবার জন্য। চীনাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একবার থমকে দাঁড়াল। বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বেলে বসে আছে তারা। অনীশ সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই তাদের একজন তাকে দেখিয়ে কী যেন বলল। কথাটা শুনে অন্য চীনারাও তাকাল অনীশের দিকে। তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলতে বলতে হাসাহাসি শুরু করল নিজেদের মধ্যে। অস্বস্তি বোধ করল অনীশ। সে এগোল ঘরের দিকে।

বাইরে অন্ধকার নামার পর মোমের আলোতে তার টুকিটাকি জিনিসপত্র ব্যাগে গুছিয়ে নিল অনীশ। সকালবেলা বেরিয়ে অনেকটা পথ ফিরতে হবে তাকে। বাইরে তুষারপাত আর বাতাস ক্রমশ বাড়ছে রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। বেশ অবসন্ন বোধ করছে অনীশ। তার আসাটা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। পরদিন বেরোতে হবে বলে রাত আটটা নাগাদ খাওয়া সেরে শুয়ে পড়ল সে।

বাইরে অবিশ্রান্ত তুষারপাত আর বাতাসের শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

কিন্তু এদিনও মাঝরাতে অনীশের ঘুম ভেঙে গেল। খট্‌খট্‌ শব্দে কাঁপছে দরজাটা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে লাফিয়ে নামল অনীশ। বাইরে বাতাসের প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। তাতেই কি দরজাটা কাঁপছে, নাকি গতকালের নেকড়েটা ফিরে এসেছে?

পকেট হাতড়ে দেশলাই বার করে মোম জ্বালাবার চেষ্টা করল অনীশ। কিন্তু দরজা-জানলার ফাঁক গলে আসা বাতাসে কাঠি নিভে যাচ্ছে। বেশ কয়েকবারের চেষ্টায় দেশলাই দিয়ে মোম জ্বালাতে সমর্থ হল অনীশ। মোমের শিখাটা কাঁপছে, হয়তো বা এখনই সেটা নিভে যাবে। তবু তার আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। সেই আলোতে দরজার নীচের ফাটলের দিকে তাকিয়ে হৃৎস্পন্দন প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল অনীশের।

দরজার ফাটল গলে ঘরের ভিতর উঁকি দিচ্ছে একটা নেকড়ের মাথা! এ নেকড়েটা গতকালের নেকড়েটার চেয়ে আরও বড় আরও প্রকাণ্ড!

তার ধবধবে সাদা রং দেখে অনীশ বুঝতে পারল এটা সেই দলপতি নেকড়েটা। অদম্য জিঘাংসা জেগে আছে তার চোখদুটোতে। মোমের নরম আলোতেও ঝিলিক দিচ্ছে তার হিংস্র শ্বদন্তগুলো।

ভাইমার তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে গতকালের ঘটনাটা নিছকই দুর্ঘটনা বলে। তবে?

প্রাণীটা গতকালের নেকড়েটার মতোই মাথা দিয়ে ঠেলে ভাঙার চেষ্টা করছে দরজার ওপরের প্যানেলটা। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অনীশ তাকিয়ে রইল তার দিকে। থরথর করে কাঁপছে দরজাটা। নেকড়ের মাথার চাপে মচ্‌মচ্‌ করে শব্দ হচ্ছে পুরোনো আমলের কাঠের দরজা থেকে। বাইরে বাতাসের শনশন শব্দ। মোমবাতির শিখাটা কেঁপে উঠছে। এই বুঝি নিভে গেল সেটা।

এ নেকড়েটা অন্য নেকড়েদের চেয়ে অনেক বড়, অনেক শক্তিধর। তার বিশাল মাথার চাপে সত্যি একসময় খসে গেল আর একটা প্যানেলও। বেশ বড় একটা ছিদ্র তৈরি হল দরজার নীচের অংশে। মুহূর্তের জন্য একবার থমকে অনীশের দিকে তাকাল শ্বাপদটা। তারপর প্রথমে সামনের পা দুটোকে দরজার এ পাশে ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে গুড়ি মেরে ঘরের মধ্যে ঢুকতে শুরু করল।

প্রাণীটা তখন প্রায় তার দেহের অর্ধেক অংশটা ঢুকিয়ে ফেলেছে ঘরের মধ্যে, ঠিক সেই সময় হুঁশ ফিরল অনীশের। যেভাবেই হোক আটকাতে হবে নেকড়েটাকে। কিন্তু কীভাবে? তার কাছে তো তেমন কিছুই নেই। প্রাণীটা ক্রমশ ঢুকে আসছে ঘরের মধ্যে। মানুষ যখন প্রচণ্ড বিপদে পড়ে তখন খড়কুটো ধরেও বাঁচার চেষ্টা করে। স্বাভাবিক সময় ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হলেও সেটাই সত্যি।

টেবিলের ওপরই রাখা ফুলের বোকেটা তুলে নিয়ে সেটাই সে ছুড়ে মারল নেকড়েটাকে লক্ষ্য করে। প্রাণীটার কাঁধে গিয়ে পড়ল বোকেটা। কিন্তু তাতেই এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। ফুল নয় যেন কেউ কোনও কিছু একটা ভারী কিছু জিনিস দিয়ে আঘাত করেছে অথবা যেন তাকে আগুন ছুড়ে মেরেছে এমনভাবে প্রচণ্ড আর্তনাদ করে উঠল নেকড়েটা। তারপর

কোনওরকমে তার দেহটা হ্যাঁচোড়-প্যাচোড় করে দরজার বাইরে বার করে নিল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আক্রোশে গর্জন করতে লাগল প্রাণীটা। অনীশও বুঝে উঠতে পারল না যে ব্যাপারটা কী ঘটল? সে চেয়ে রইল দরজার ফাটলটার দিকে। বোকে থেকে ফুলগুলো খসে পড়ে ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে। দরজার ওপাশে গর্জন করেই চলেছে প্রাণীটা। কী রক্তজল করা তার ডাক! যেন অনীশকে নাগালের মধ্যে পেলেই সে তার টুঁটি ছিঁড়ে নেবে।

সময়ের পর সময় কেটে যেতে লাগল। দরজার দু-পাশে দাঁড়িয়ে রইল অনীশ আর নেকড়েটা। শেষ রাতের দিকে ধীরে ধীরে কমে এল নেকড়ের ডাকটা। তার ক্রুদ্ধ গর্জন দরজা ছেড়ে দূরে চলে যেতে লাগল। কতক্ষণ এভাবে দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল তা নিজেরও খেয়াল ছিল না অনীশের। একসময় সে দেখল দরজার ফোকর দিয়ে যেন আবছা আলো দেখা যাচ্ছে। ভোর হচ্ছে বাইরে।

৬

দুঃস্বপ্নের রাত অতিবাহিত হল শেষ পর্যন্ত। বাইরে সূর্যোদয় হয়েছে। অনীশ জানলা খুলতেই একরাশ আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। বাইরের দিকে তাকিয়েই অনীশ বুঝতে পারল গতকাল অন্ধকার নামার পর থেকেই আরও অনেক তুষারপাত হয়েছে। অন্তত চার-পাঁচ ফুট বরফের চাদরে ঢেকে গেছে মাটি। বাড়িটার সামনের বা পিছনের কোনও অংশ থেকেই কোনও শব্দ আসছে না।

ঘরে আলো ঢুকতেই মনে অনেকটা বল ফিরে এল অনীশের। সে মনে মনে ভাবল যে যাবার আগে গত রাতের ব্যাপারটা নিয়ে একবার জবাবদিহি চাইবে ভাইমারের কাছে। পরপর দু-রাত ভাইমারের অসতর্কতার জন্য প্রাণ যেতে বসেছিল তার। গ্রামবাসীদের অভিযোগ এবার সত্যি বলে অনীশের মনে হল। ওয়ার উল্‌ফ না হলেও তার নেকড়েগুলোই হয়তো ক্যাম্পের

বাইরে বেরিয়ে একের পর এক মানুষ মেরেছে। ভাইমার ঘটনাটা যতই অস্বীকার করুন না কেন এ ব্যাপারটাই সম্ভবত সত্যি। কপাল ভালো যে পরপর দু-রাত বেঁচে গেছে অনীশ।

অনীশের ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজল একসময়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মোবাইলও বেজে উঠল। ড্রাইভার পবনের ফোন। সে বলল, 'আমি চলে এসেছি স্যার।'

অনীশ বলল, 'ঠিক কোথায় তুমি?'

পবন বলল, 'ঠিক গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে। ভিতরে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে গেট খোলা।'

অনীশ বলল, 'দাঁড়াও আমি ঘরের বাইরে বেরোচ্ছি।'

দরজা খুলল অনীশ। বাইরেটা পুরো তুষারে মুড়ে আছে। এমনকী কাঁটাতারগুলো থেকেও ঝুলের মতো তুষার ঝুলছে। বারান্দার মেঝেও ঢেকে গেছে বাতাসে ভেসে আসা তুষারে। পবনকে দেখে হাত নেড়ে ভিতরে ঢোকার ইঙ্গিত করল অনীশ। চীনাদের তাঁবুটারও এখন কোনও চিহ্ন নেই। আশেপাশে তাকিয়ে কোথাও ভাইমার বা তার লোকজনকেও দেখতে পেল না অনীশ।

পবন হাঁটু পর্যন্ত বরফ ভেঙে বারান্দায় উঠে এল। তার চোখে মুখে কেমন যেন উত্তেজনার ছাপ। দরজার সামনে এসে বারান্দার মেঝের দিকে তাকিয়ে সে আঁতকে উঠে বলল, 'ওটা কী?'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে অনীশ দেখল দরজার বাইরে তুষারের মধ্যে আঁকা হয়ে আছে নেকড়ের অসংখ্য পায়ের ছাপ! গতরাতের ঘটনার চিহ্ন। অনীশ জবাব দিল, 'গত রাতে ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। একটা নেকড়ে দরজা ভেঙে ঢুকতে যাচ্ছিল। কোনওমতে বেঁচে গেছি!'

অনীশের কথা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল পবনের মুখ। অনীশ তাকে নিয়ে ঘরে ঢোকার পর পবন উত্তেজিতভাবে বলল, 'ওদিকে ভয়ংকর কাণ্ড ঘটেছে। তাই গ্রামে থাকা সুবিধার মনে হল না। তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম।'

অনীশ বলল, 'কী ঘটনা?'

পবন বলল, 'কাল সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরে এসে ছেলেটাকে যে পাওয়া যায়নি সে খবর দেবার পর গ্রামের লোকরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল দল বেঁধে। পাস থেকে যে রাস্তাটা এদিকে ঢুকেছে সেখানে জঙ্গলের মধ্যে ছেলেটার দেহর কিছু অংশ মিলেছে। নেকড়ে খাওয়া দেহ। সম্ভবত গত পরশু রাতে তাকে ধরেছিল নেকড়েগুলো। গ্রামবাসীরা প্রচণ্ড উত্তেজিত। তারা হয়তো সত্যিই পুড়িয়ে দেবে এই ক্যাম্প। যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে ফেরা যায় ততই ভালো।'

অনীশ তার কথা শুনে চমকে উঠে বলল, 'আমি তৈরি হয়েই আছি। এখনই বেরিয়ে পড়ব। যাবার আগে শুধু ভাইমারকে একবার জানিয়ে যাই।'

অনীশ বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর 'মিস্টার ভাইমার, মিস্টার ভাইমার' বলে হাঁক দিতে লাগল। কিন্তু কোথা থেকে কোনও সাড়া মিলল না ভাইমারের। বারান্দার সার বাঁধা একটার পর একটা ঘরগুলোও দেখল তারা দুজন। সব ঘর বাইরে থেকে তালা বন্ধ। এমনকী অনীশ প্রথমদিন যে ঘরে এসে বসেছিল সেটাও তালা দেওয়া। অনীশ বলল, 'ভাইমার নিশ্চয়ই তবে বাড়ির পিছনের দিকে আছেন। চলো সেখানে।'

অনীশ আর পবন বারান্দা থেকে নামতেই তাদের প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেল তুষারের মধ্যে। বরফ ভেঙে তারা বাড়ির পিছন দিকে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেইসময় একটা আর্মি জিপ এসে থামল গেটের সামনে। গাড়ি থেকে নামলেন ছেত্রীসাহেব সহ আরও জনা পাঁচেক অস্ত্রধারী সেনা। সটান গেট খুলে তারা প্রবেশ করলেন ভিতরে। অনীশ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তাদের দেখে।

অনীশদের সামনে এসে দাঁড়ালেন লেফটানেন্ট ছেত্রী। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এখানে যে চীনাদের দলটা ছিল তারা কই?'

অনীশ জবাব দিল, 'কাল সন্ধ্যায় তাদের তাঁবু ছিল। সকালে উঠে দেখতে পাচ্ছি না।'

থমথম করছে লেফটানেন্ট ছেত্রীর মুখ। তিনি বললেন, 'শুনেছেন নিশ্চয়ই কাল রাতে সেই নিখোঁজ ছেলেটার নেকড়ে খাওয়া দেহ মিলেছে।

ভাইমার সাহেব কই? তিনি হয়তো ঘটনাটা বলতে পারবেন। আমার ধারণা তার নেকড়েই পরশু এ কাণ্ডটা ঘটিয়েছে।'

অনীশ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, এখন আমারও তাই ধারণা। কাল আর পরশু দু-দিন রাতেই দুটো নেকড়ে আমার ঘরের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছে। ফিরে যাবার আগে তাকেই আমরা খুঁজতে যাচ্ছিলাম। হয়তো তিনি বাড়ির পিছনের অংশে আছেন।'

লেফটানেন্ট বলল, 'তবে চলুন ওদিকে।'

বাড়ির পিছন দিকে এগোল তারা সবাই মিলে। যেতে যেতে লেফটানেন্ট অনীশকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি গতকাল সন্ধ্যার পর বাইরে বেরিয়েছিলেন?'

অনীশ জবাব দিল, 'না, কেন বলুন তো?'

লেফটানেন্ট ছেত্রী যদিও জবাব দিলেন 'এমনি জিগ্যেস করলাম' কিন্তু তার জবাব শুনে লেফটানেন্টের সঙ্গে যেন মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি বিনিময় হল তার এক সেনার। ব্যাপারটা অনীশের চোখ এড়াল না।

অনীশরা বাড়ির পিছনে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে ভাইমার বা তার লোকজন কেউ নেই। সেই চীনাদের দল বা তাদের ভারবাহী পশুগুলোও নয়। আর এরপরই তাদের নজর পড়ল খাঁচাগুলোর দরজাতে। দরজাগুলো সব খোলা! কোনও খাঁচাতেই কোনও প্রাণী নেই!

বিস্মিত অনীশ বলে উঠল, 'নেকড়েগুলো সব কোথায় গেল?'

অন্যরাও বিস্মিত সবাই। কয়েক মুহূর্তের জন্য সবাই হতবাক হয়ে গেল। লেফটানেন্ট ছেত্রী বললেন, 'সম্ভবত বিপদের আঁচ করে পশুগুলোকে নিয়ে পালিয়েছেন ভাইমার। তবু ক্যাম্পটা একবার ভালো করে খুঁজে দেখতে হবে।'

লেফটানেন্টের নির্দেশ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল সেনারা।

অনীশ বলল, 'কিন্তু প্রাণীগুলোকে নিয়ে কোথায় যাবেন ভাইমার?'

লেফটানেন্ট জবাব দিল, 'সম্ভবত সীমান্তের ওপারে। চীনা সেনারা তো প্রাণীগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী। হয়তো ওই চীনা রসদ সরবরাহকারী দলের

সাহায্যে বা অন্য কোনওভাবে চীনা সেনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ভাইমার। পশুগুলোকে নিয়ে তিনি ওপাশে চলে গেলে আমাদের কিছু করার থাকবে না। যদিও আপনাকে সব কথা বলা ঠিক না তবু বলি চীনা সৈনিকদের একটা বেতারবার্তা ধরা পড়েছে আমাদের কাছে। সাংকেতিক সেই বেতারবার্তায় তারা নিজেদের মধ্যে খোঁজখবর নিচ্ছিল যে ওই চীনা ব্যবসায়ীদের দলটা এই ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছে কিনা? অর্থাৎ ওই লোকগুলোর সঙ্গে চীনা ব্যবসায়ীদের কোনও সম্পর্ক আছে। সেজন্য তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই এখানে এসেছিলাম আমি।'

লেফটানেন্ট ছেত্রীর পাশে একজন সেনা দাঁড়িয়ে ছিল। তার পিঠে বাঁধা ওয়ারলেস সেট। ছেত্রী তাকে বললেন, 'আটশো চব্বিশ আউটপোস্টের স্নো-আউল'কে ধরে দাও।'

তাঁর নির্দেশ শুনে সেই সৈনিক ওয়ারলেসে ধরে দিল স্নো-আউল ছদ্মনামের কোনও লোককে। মাইক্রোফোন নিয়ে লেফটানেন্ট বললেন, 'স্নো-লেপার্ড কলিং। এরপর অবশ্য সাংকেতিক কথা-বার্তা শুরু হল দুজনের মধ্যে। মিনিট তিনেক কথা বলার পর লাইনটা কেটে দিয়ে লেফটানেন্ট বললেন, 'আজ সূর্যোদয়ের সময় নাথুলা পাসে প্রবেশ করেছে চীনাদের ওই দলটা। ওদের সঙ্গে ভাইমার নেই ঠিকই কিন্তু পশুগুলোর পিঠে ভারী ভারী চটের বস্তা আছে। কিন্তু ওভাবে বস্তায় পুরে নেকড়ে নিয়ে যাওয়া কী সম্ভব? তারা ডাক ছাড়বে, ছটফট করবে, অনায়াসে চটের বস্তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে।'

পশুগুলোকে নিয়ে ভাইমার কোথায় গেলেন ভাবতে লাগলেন ছেত্রী। নেকড়ে তো আর কুকুর নয় যে চেনে বেঁধে কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে? তার ওপর অমন পাঁচ পাঁচটা হিংস্র নেকড়ে।

যে সব সেনারা ক্যাম্পের ভিতর ভাইমারকে খুঁজতে গেছিল তারা এসে জানাল যে ভাইমার কোথাও নেই। তবে?

হঠাৎ অনীশের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। সে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওভাবেও কিন্তু প্রাণীগুলোকে বস্তাবন্দি করে পাচার করা সম্ভব।'

বিস্মিত লেফটানেন্ট জানতে চাইল, 'কীভাবে?'

অনীশ বলল, 'আফ্রিকার রোডেশিয়াতে একবার একটা চিতা হানা দিচ্ছিল গ্রামে। গ্রামবাসীরা তাকে ফাঁদ পেতে ধরে খাবারে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে তাকে বস্তাবন্দি করে বাঁশে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছিল আমাদের রেসকিউ ক্যাম্পে। নেকড়েগুলোকে যদি ঘুমের ওষুধ বা ইনজেকশন দেওয়া হয়ে থাকে? আট-নয় ঘণ্টা অনায়াসে এভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় ওদের। ভাইমার অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি নিশ্চয়ই এ ব্যাপারটাও জানেন।'

অনীশের কথা শুনে লেফটানেন্ট চমকে উঠে বললেন, 'এমনটা হতেই পারে। ওই চীনাদের পিছু ধাওয়া করতে হবে। আপনি লোকগুলোকে চিনতে পারবেন? কেন না ওইরকম খচ্চরের পিঠে বস্তা চাপিয়ে অনেকে যাতায়াত করে রেশমপথে। সবাইয়ের তল্লাসী নেবার সময় হাতে নেই। ও দেশের সীমান্তে প্রবেশের আগেই তাদের ধরা চাই।

অনীশ জবাব দিল, 'সম্ভবত চিনতে পারব।'

লেফটানেন্ট ছেত্রী বললেন, 'সম্ভবত আজ আর আপনার ফেরা হবে না। সব ঠিক থাকলে কাল আপনি ফিরবেন। আপনার ফেরার যাবতীয় ব্যবস্থা আমি করব। এমনকী যদি তেমন প্রয়োজন হয় তবে আর্মি কপ্টার আপনাকে গন্তব্যে পৌঁছে দেবে। আমি আপনাকে কথা দিলাম। আর দেরি করা যাবে না। এখনই পিছু ধাওয়া করতে হবে আমাদের। চলুন আমার সঙ্গে।'

লেফটানেন্ট ছেত্রীর বাচনভঙ্গির মধ্যে এমন একটা প্রচ্ছন্ন নির্দেশ লুকিয়ে ছিল যে অনীশ কিছু বলতে পারল না। শুধু পবন বলল, 'আমি কি গাড়ি নিয়ে যাব আপনাদের সঙ্গে?'

ছেত্রী পকেট থেকে সঙ্গে সঙ্গে একটা কার্ড বার করে পবনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এতে আমার ফোন নং আছে। প্রয়োজন হলে, ভাইমার ফিরে এলে সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করবে আমার সঙ্গে। তাছাড়া তোমার স্যারের ফোন নম্বর তো নিশ্চয়ই আছে তোমার কাছে। তুমি এখানেই থাকবে।'

অনীশ বলল, 'তুমি বরং আমার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো। ওখানে

আমার জিনিসপত্র সব রাখা আছে।'

লেফটানেন্ট ছেত্রী অনীশকে তাড়া দিলেন—'দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলুন চলুন...।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই ক্যাম্প ছেড়ে নাথুলা পাস বা রেশম পথের উদ্দেশ্যে আর্মি জিপে রওনা হয়ে গেল অনীশরা।

বরফ মোড়া রাস্তা। পথের পাশের পাইন গাছগুলোর মাথাও বরফে ঢেকে আছে। অন্য পাশের পাথুরে দেওয়ালও বরফের চাদরে ঢাকা। আর্মি গাড়িটার চাকার চাপে দু-পাশে ছিটকে যাচ্ছে বরফের কাদা। সকলেই নিশ্চুপ, লেফটেনেন্ট আর তার সেনারা হিমশীতল মুখে বসে আছে, অনীশ বুঝতে পারল তাদের সবার ভিতরই প্রচণ্ড উত্তেজনা কাজ করছে। অনীশ নিজেও ভিতরে ভিতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড দুলে উঠছে গাড়িটা। মনে হয় এই বুঝি উলটে যাবে সেটা। তবু কারও মুখে কোনও ভাবান্তর হচ্ছে না। একসময় পাসের কাছাকাছি চলে এল গাড়িটা। তার আগে পথের পাশে পাইনবন যেখানে শেষ হয়েছে তার কিছুটা আগে বনের ভিতরে আঙুল তুলে দেখিয়ে ছেত্রী বললেন, 'ওর ভিতরই ছেলেটার দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। মাথা আর কাঁধ বাদ দিয়ে দেহের পুরো অংশটাই সাবাড় করে দিয়েছে নেকড়ের দল।'

পাসে প্রবেশ করল গাড়িটা। বরফ মোড়া রাস্তা। সংকীর্ণ পথের দু-পাশে কোথাও বরফের দেওয়াল, আবার কোথাও খাদ। নীচে পাকদণ্ডিগুলো দেখা যাচ্ছে। যে পথ বেয়ে অনীশ ওপরে উঠে এসেছিল। গাড়ি চলতে লাগল তার বিপরীতে আরও ওপর দিকে। কখনও গাড়িটা খাড়া উঠছে ওপর দিকে, আবার কখনও চুলের কাঁটার মতো বাঁক নিচ্ছে। বরফে চাকা পিছলোলেই যে-কোনও মুহূর্তে উলটে যেতে পারে গাড়ি। এ পথে কাউকেই ওপরে উঠতে দেখতে পাচ্ছে না অনীশরা। তবে মাঝে মাঝে দু-পাঁচ জনের ছোট ছোট দল ওপর থেকে নামছে। তাদের সঙ্গে কখনও বা নারী-শিশুও আছে। কখনও বা ভারবাহী খচ্চর বা গাধা। অনীশ জানতে চাইল, 'এই লোকগুলো কোথায় যাচ্ছে?'

লেফটানেন্ট জবাব দিলেন, 'পাসের এদিক-ওদিকে দু-চারটে ছোট ছোট

গ্রাম আছে। বরফ পড়ছে বলে ওরা নীচে নেমে আসছে। এই তিনমাস ওরা নীচে থাকবে। আর গ্রামগুলো জনশূন্য অবস্থায় বরফের নীচে চাপা পড়ে থাকবে।'

পাস বা রেশমপথ ধরে আরও কিছুটা ওপরে ওঠার পরই ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হল। তার সঙ্গে বইতে লাগল কনকনে ঠান্ডা বাতাস। মাঝে মাঝে পাহাড়ের ঢাল থেকে শুঁড়িপথ এসে মিশেছে মূল রাস্তায়। সেগুলোও বরফে মোড়া। সে পথগুলো দেখিয়ে লেফটানেন্ট তার এক সৈনিককে বললেন, 'এ পথগুলো বরফে ঢাকা না থাকলে ওরা নির্ঘাত এ পথগুলোই ধরত সীমান্ত পেরোবার জন্য। আমরা ওদের ধরতে পারতাম না। এখন সোজা পথে ওদের চলতে হচ্ছে এটা বাঁচোয়া।

চলতে লাগল গাড়ি। তুষারপাত আর বাতাস ক্রমশ বাড়ছে। মাঝে মাঝে সবকিছু ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। একসময় লেফটানেন্ট বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। তারপর আক্ষেপের স্বরে বললেন, 'এমন চললে আমরা হয়তো আর ওদের নাগাল পাব না। সীমান্ত পেরিয়ে যাবে ওরা। আমরা সীমান্তর অনেকটা কাছে চলে এসেছি। অথচ ওদের দেখা নেই!'

অনীশ প্রশ্ন করল, 'আর কতদূর সীমান্ত?'

লেফটানেন্ট জবাব দিলেন, 'আমাদের পথের ডানপাশের দেওয়ালটাই তো চীনের ভূখণ্ড। সীমান্ত বলতে যেখানে ওদের চেকপোস্ট আছে এই রেশম পথের ওপর আমি সে জায়গার কথাই বলছি। ও জায়গা এখান থেকে আর পাঁচ-ছয় কিলোমিটার হবে। হয়তো ওরা সীমান্তের ওপাশে পৌঁছে দাঁত বার করে হাসবে, আর এ-পাশ থেকে আমরা তাকিয়ে দেখব।'

এবার স্পষ্ট উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল লেফটানেন্ট আর তার সৈনিকদের মুখে। দাঁতে দাঁত চিপে শক্ত হাতে হুইল ধরে যথাসম্ভব গাড়িটা দ্রুত চালাবার চেষ্টা করছে ড্রাইভার। কিন্তু পারছে না। বাতাসের দাপটে মনে হচ্ছে উলটে যাবে গাড়িটা।

একসময় গাড়িটা এভাবেই আরও দু-তিন কিলোমিটার এসে থামল এক জায়গাতে। পথ সেখানে দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। ড্রাইভার ঘাড়

ফিরিয়ে প্রশ্ন করল, 'কোন পথ ধরব? দুটো পথই তো চীনা আউটপোস্টে পৌঁছেছে।'

লেফটানেন্ট মুহূর্তখানেক ভেবে নিয়ে বললেন, 'বাঁ-দিকের পথটা একটু শর্টকাটে চীনা আউটপোস্টে পৌঁছয় ঠিকই কিন্তু পথের শেষ এক কিলোমিটার খুব খাড়াই। ওদের পশুগুলোর পিঠে মাল আছে। ওদের পক্ষে ও পথে যাওয়া একটু কষ্টকর। ডান দিকের পথটাই বরং ধরো। যা হবার হবে।'

ডান দিকের পথটাই ধরল ড্রাইভার। একটু এগোতেই হঠাৎই একটা ধাতব খটখট শব্দ কানে এল অনীশদের। গাড়ির কিছুটা তফাতে রাস্তার ওপর যেন বরফের ঝড় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা থেমে গেল। লেফটানেন্ট গাড়ি থেকে মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে নেমে অনীশকে টেনে নামিয়ে জাপটে ধরে শুয়ে পড়লেন রাস্তার পাশে একটা ফাটলের মধ্যে। চাপা স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'চীনা আর্মি পাহাড়ের মাথা থেকে মেশিনগান চালাচ্ছে। মাথা তুলবেন না।'

গাড়ির অন্য জওয়ানরাও মুহূর্তের মধ্যে নেমে পড়েছিল গাড়ি থেকে। গাড়ির আড়াল বা বরফের দেওয়ালে পজিশন নিয়ে এবার তারা তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে প্রত্যুত্তর দিতে শুরু করল। বুলেটের আঘাতে ছিটকে উঠতে লাগল বরফ, এতগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দে খানখান হয়ে যেতে লাগল রেশম পথের নিস্তব্ধতা। টানা এক মিনিট মতো চলল গুলির লড়াই। তারপর হঠাৎই থেমে গেল গুলির শব্দ। শুধু অনেক ওপর থেকে ধপ করে কোনও ভারী জিনিস যেন খসে পড়ল রাস্তায়!

সাংকেতিক শিস দিল একজন সৈনিক। গর্ত ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লেফটানেন্ট আর অনীশ। কিছু দূরে রাস্তার পাশে পড়ে আছে একজন চীনা সৈনিকের মৃতদেহ। এ লোকটাই ওপর থেকে মেশিনগান চালাচ্ছিল। ভারতীয় সেনাদের গুলি ওপর থেকে পেড়ে ফেলেছে তাকে।'

মৃতদেহটাকে দেখে লেফটানেন্ট বললেন, 'আমরা ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছি। সেজন্য লোকটা আমাদের আটকাবার চেষ্টা করছিল। আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না। চীনাদের দলটা এখনও সীমান্ত পেরোতে পারেনি।'

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে গাড়িতে উঠল সকলে। আবার চলতে শুরু করল গাড়ি।

তুষারঝড় শুরু হয়েছে এ পথে। শনশন শব্দে বাতাস বইছে প্রবল বেগে। রাস্তা থেকে বাতাসের ধাক্কায় পাক খেয়ে উঠছে তুষারকণা। তারই মধ্যে দিয়ে চলছে গাড়িটা। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। হঠাৎ ড্রাইভারের পাশে যে জওয়ান অস্ত্র উঁচিয়ে বসে ছিল সে চিৎকার করে উঠল, 'ওই! ওই!'

অনীশ তাকাল সেদিকে। অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে ওদের। একটা বাঁকের দিকে এগোচ্ছে লোকগুলো। অনীশও বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ওরাই! ওরাই!' একটা বাঁক পেরোচ্ছে লোকগুলো। গতি বাড়িয়ে গাড়িটা তুষারঝড়ের মধ্যে দিয়ে এগোল তাদের দিকে। কিন্তু তাদের কাছাকাছি পৌঁছোবার আগেই লোকগুলো টের পেয়ে গেল তাদের পিছনে ধাবমান গাড়িটার উপস্থিতি। ভারবাহী পশুগুলোকে ফেলে লোকগুলো পালাবার জন্য তুষারঝড়ের মধ্যে এদিক-ওদিকে ছুটল। অনীশদের গাড়িটা যখন সে জায়গাতে পৌঁছল তখন ভারবাহী খচ্চরগুলোই শুধু রাস্তার মাঝে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারটে খচ্চরের পিঠে বিরাট বিরাট চটের বস্তা। তার মধ্যে সম্ভবত বড় বড় কাঠের বাক্সর মতো কিছু আছে।

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সবাই। ঠিক সেই সময় দূরের পাহাড় থেকে মেশিনগানের র‍্যাট র‍্যাট শব্দ শোনা যেতে লাগল। লেফটানেন্ট সৈনিকদের বললেন, 'তাড়াতাড়ি বস্তাগুলো নামিয়ে গাড়ির মাথায় তোলো। এখানে আর ওর ভিতর কী আছে দেখার সময় নেই। বস্তার ভিতর বাক্সর মধ্যে যদি জীবন্ত নেকড়েগুলো থাকে তবে সেগুলো ওদের কাছে দামী। ছাদে থাকলে গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাবে না ওরা।'

লেফটানেন্টের কথা মতোই কাজ হল। ছুরি দিয়ে দড়ি কেটে বস্তাগুলো নামিয়ে সেগুলো গাড়ির ছাদের খাঁচা মতো জায়গাটাতে তুলে ফেলা হল। মুখ ঘুরিয়ে ফেরার পথ ধরল অনীশদের গাড়ি। এদিকে পাসের মধ্যেও তখন তুষারঝড় শুরু হয়েছে। অনীশরা পাসে উঠে কিছুটা এগোতেই আবারও গুলির শব্দ ভেসে আসতে লাগল দূরের পাহাড়

থেকে। লেফটানেন্ট যাতে তাদের জিনিস নিয়ে পালাতে না পারেন সেজন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চীনা সেনারা। একটু বিস্মিতভাবে লেফটানেন্ট বলে উঠলেন, 'সামান্য এই নেকড়েগুলো হঠাৎ ওদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল কেন?'

তারপর তিনি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন, 'একটু এগিয়ে পাস থেকে ডান পাশের নীচে নামার পথটা ধরো। আমাদের ও পথে ফিরতে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে ঠিকই। কিন্তু পথটার দু-পাশেই পাথরের দেওয়াল আর ভারতের ভূখণ্ড। চীনা সেনাদের গুলি সেখানে পৌঁছোবে না।' লেফটানেন্টের নির্দেশ পালিত হল কিছুক্ষণের মধ্যেই। আর্মি গাড়িটা সে পথই ধরল। আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল চীনা সেনাদের মেশিনগানের শব্দ।

৭

শেষ বিকালে ক্যাম্পে এসে পৌঁছোল অনীশরা। ঘুর পথে চীনা সেনাদের গুলি এড়িয়ে ফিরতে বেশ সময় লেগেছে। তাছাড়া সে পথে তুষারপাতও হচ্ছিল খুব। যদিও এদিকে তুষারপাত থেমেছে এখন। ক্যাম্পের পিছনে বরফ পাহাড়ের মাথায় শেষবারের মতো উঁকি দিচ্ছে সূর্য। তার মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছে তুষারমোড়া ক্যাম্প চত্বরে। গাড়ি প্রবেশ করল ক্যাম্পের ভিতর। লেফটানেন্ট ড্রাইভারকে বললেন, 'গাড়িটা বাড়ির পিছন দিকে নিয়ে চলো। বস্তার মধ্যে যদি নেকড়ে থাকে তবে তো আপাতত সেগুলোকে খাঁচার মধ্যে রাখারই ব্যবস্থা করতে হবে।'

সেইমতো গাড়িটাকে নিয়ে আসা হল বাড়ির পিছন অংশে খাঁচাগুলোর সামনে।

গাড়ি থেকে প্রথমে নামল সবাই। গাড়ির মাথায় তুষারের আড়ালে চাপা পড়ে আছে বস্তাগুলো। সেগুলো সাবধানে মাটিতে নামানো হল। একজন সেনা প্রথমে আর্মি নাইফ দিয়ে একটা বস্তা কাটতেই তার মধ্যে

থেকে বেরিয়ে এল পাতলা পাইন কাঠের তৈরি বেশ বড় একটা বাক্স। অনায়াসে তার মধ্যে একটা ঘুমন্ত নেকড়েকে রাখা যায়। সেই সেনা কান পাতল বাক্সর গায়ে। তারপর লেফটানেন্ট ছেত্রীর উদ্দেশ্যে বলল, 'সম্ভবত প্রাণীটার ঘুম ভাঙেনি। কোনও শব্দ আসছে না। হয়তো বা প্রাণীটা মরে গিয়েও থাকতে পারে।'

তবুও সাবধানের মার নেই। অনীশকে কিছুটা তফাতে দাঁড়াতে বলে বাক্সটার দিকে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে সেটাকে ঘিরে দাঁড়াল সেনারা। লেফটানেন্ট ছেত্রীও কোমর থেকে তার রিভলবার খুলে হাতে নিলেন। যাতে ঘুম ভেঙে প্রাণীটা কাউকে আক্রমণ করার চেষ্টা করলেই তাকে এতগুলো আগ্নেয়াস্ত্রর গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া যায়।

একজন সৈনিক গাড়ি থেকে শাবলের মতো একটা স্প্যানার নামিয়ে আনল। তারপর সেটা দিয়ে সন্তর্পণে চাপ দিল বাক্সটার ঢাকনার খাঁজে। নরম পাইন কাঠের ঢাকনাটা খুলে মাটিতে খসে পড়ল। এক পা এগিয়ে সেই সৈনিক উঁকি দিল বাক্সর ভিতর। তারপর বিস্মিতভাবে চিৎকার করে উঠল, 'নেকড়ে নয়। ডেডবডি স্যার! চীনা সৈনিকের বডি।'

তার কথা শুনে অন্য সবাইও ঝুঁকে পড়ল বাক্সটার ওপর। অনীশও এগিয়ে এল বাক্সটার কাছে। হ্যাঁ, বাক্সটার ভিতর দুমড়ে মুচড়ে রাখা আছে একটা মানুষের মৃতদেহ। গায়ে তার সামরিক পোশাক। চীনা সেনাবাহিনীর সামরিক উর্দি!

সবাই নিস্তব্ধ। এরপর একে একে খুলে ফেলা হল চটের চাদর মোড়া অন্য তিনটে বাক্সও। তাদের মধ্যেও তিনটে মানব দেহ!

লেফটানেন্ট ছেত্রীর নির্দেশে এরপর দেহগুলোকে বাক্স থেকে বার করে পরপর পাশাপাশি শোয়ানো হল। অনীশের যেন কেমন চেনা লাগল তাদের হিমশীতল মুখগুলো। তাদের দিকে তাকিয়ে লেফটানেন্ট ছেত্রী বলে উঠলেন, 'আরে এদেরই তো খুঁজছিলাম আমরা!'

বিস্মিত অনীশ বলে উঠল, 'কারা এরা?'

লেফটানেন্ট ছেত্রী বললেন, 'মাস ছয় আগে চীনা সেনাদের এই দলটা সীমান্ত পেরিয়ে প্রবেশ করেছিল এদেশে। পাঁচজনের দল ছিল। তার মধ্যে

চারজনের দেহ পড়ে আছে এখানে। আমার ফাইলে এদেরই ছবি দেখেছেন আপনি। আমাদের সেনারা গুলি করে এদের মারে। ভালো করে দেখুন এদের শরীরে গুলির ক্ষত আছে। এ জায়গার কাছাকাছি ঘটনাটা ঘটেছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কীভাবে যেন লোপাট হয়ে যায় এদের দেহ। আমাদের একটা সন্দেহ হয়েছিল যে ভাইমার হয়তো তার এই নেকড়ে খামারে এনে লুকিয়ে ফেলেছেন এদের দেহ। গত ছ-মাস ধরে হন্যে হয়ে তল্লাশি চালিয়েও এই দেহগুলোর খোঁজ পাইনি আমরা। তিন দিন আগে এদের খোঁজ করতে গিয়েই নেকড়েদের পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়েছিল। যদিও একজনের দেহ এখানে নেই। ওদের দলনেতার দেহ। আমাদের অনুমান তবে সত্যি। ভাইমার দেহগুলোকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন, তারপর ওদেশে পাচার করছিলেন। এজন্যই চীনা সেনাদের এত আগ্রহ ছিল বস্তাগুলোর ওপর।'

লেফটানেন্ট ছেত্রীর কথা শেষ হলে বিস্মিত অনীশ বলল, 'দেহগুলো এমন অবিকৃত রইল কীভাবে? মনে হয় লোকগুলো ঘুমিয়ে আছে।'

লেফটানেন্ট জবাব দিলেন, 'বরফের নীচে থাকলে মানুষের দেহ শুধু ছ'মাস কেন, বছরের পর বছর অবিকৃত থেকে যায়। নিশ্চয়ই বরফের নীচে চাপা রাখা ছিল দেহগুলো।' এ কথা বলে লেফটানেন্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন সেই মৃতদেহগুলো।

হঠাৎ একটা মৃতদেহর ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি। তার মুখে কী যেন গেঁথে আছে। তার মুখ থেকে জিনিসটা তিনি খুলে নিলেন। ঈষৎ নীলাভ একটা কাচের টুকরো। জিনিসটা দেখেই অনীশের অন্য একটা জিনিসের কথা মনে পড়ে গেল। তার ঘরের বাতির কাচটাও এমন নীলাভ ছিল! যেটা সে ছুড়ে মেরেছিল নেকড়ের মুখ লক্ষ্য করে।

ভালো করে মরদেহগুলো খুঁটিয়ে দেখার পর লেফটানেন্ট গম্ভীরভাবে নির্দেশ দিলেন, 'আপাতত এই মরদেহগুলোকে একটা খাঁচার ভিতর রেখে তালা দাও। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। কাল সকালে যা করার করা যাবে।' সত্যিই তখন সূর্যদেব মুখ লুকিয়েছেন বরফ পাহাড়ের আড়ালে। শুধু তার লাল আভাটুকু জেগে আছে পাহাড়ের মাথায়।

লেফটানেন্ট ছেত্রীর নির্দেশমতো তার সেনারা মৃতদেহগুলোকে ধরাধরি করে একটা খাঁচার ভিতর রাখতে লাগল। অনীশ, লেফটানেন্ট ছেত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'তবে ভাইমার তার নেকড়েগুলোকে নিয়ে গেলেন কোথায়?'

লেফটানেন্ট ছেত্রী জবাব দিলেন, 'জানি না। হয়তো তিনি তাদের নিয়ে আত্মগোপন করেছেন পাইনবনে অথবা এই বরফরাজ্যের কোথাও। লুকিয়ে থাকার জায়গার এখানে অভাব নেই। তবে এতগুলো প্রাণী নিয়ে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবেন না তিনি। রাতে টহল দেবে সেনারা। সীমান্ত সিল করার ব্যবস্থা করছি। কাল সকাল থেকে বড় সেনাদল তল্লাশি অভিযান চালাবে চারপাশে। ভাইমার ঠিক ধরা পড়ে যাবেন।'

দেহগুলোকে একটা খাঁচার মধ্যে ঢোকানো হয়ে গেল। হঠাৎ অনীশের মনে পড়ে গেল ড্রাইভার পবনের কথা। সে কই?

অনীশ লেফটানেন্টকে বলল, 'আমার ড্রাইভার পবনকে দেখতে পাচ্ছি না। সে মনে হয় ঘরেই আছে। ও ঘরে আমার মালপত্রও আছে।'

লেফটানেন্ট বললেন, 'হ্যাঁ, সেগুলো নিয়ে নিন। ড্রাইভারকেও সঙ্গে নিন। আজ রাতে এখানে নয়, আমাদের ক্যাম্পে থাকবেন আপনি। কাল ভোরে ফেরার পথ ধরবেন।'

লাশগুলোকে খাঁচায় ঢোকানো হয়ে যাবার পর যে লোকটা বাক্সগুলো খুলেছিল সে লোকটা আর একজনকে খাঁচার সামনে পাহারায় রেখে অনীশ আর অন্য সেনাদের নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন লেফটানেন্ট ছেত্রী। গাড়িটা বাড়ির পিছন থেকে এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনের বারান্দার কাছে। গাড়ি থেকে নেমে অনীশের সঙ্গে বারান্দায় উঠে এলেন ছেত্রী আর তার সেনারা।

অনীশের ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। অনীশ বার কয়েক হাঁক দিল পবনের নাম ধরে। কিন্তু ভিতর থেকে কোনও সাড়া এল না। আশঙ্কার মেঘ তৈরি হল অনীশের মনে। ছেত্রী সাহেবের দিকে তাকালেন তিনি। লেফটানেন্ট ছেত্রী একজন সেনাকে বললেন, 'দরজা ভেঙে ফেলো।'

সে অনীশকে জিগ্যেস করল, 'দরজার ছিটকিনিটা কোথায়? ওপরে, মাঝে, না নীচে?'

অনীশ জবাব দিল, 'ওপরে।'

আন্দাজ মতো সে জায়গা লক্ষ্য করে হাতের অস্ত্র থেকে গুলি চালাল লোকটা। অন্য একজন লোক এরপর দরজাটা ধাক্কা দিতেই ছিটকিনি ভেঙে দরজাটা খুলে গেল। আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ঘরে ঢুকল সবাই। কিন্তু ঘরে কেউ নেই!

কোথায় গেল পবন?

একজন সেনা তার অস্ত্র উঁচিয়ে ঘর সংলগ্ন বাথরুমটাও দেখে এল। না সেখানেও কেউ নেই!

লেফটানেন্ট বিস্মিতভাবে বললেন, 'ঘর বন্ধ, অথচ কোথায় গেল লোকটা?'

হঠাৎ একটা খচমচ শব্দ শোনা গেল। শব্দটা আসছে খাটের নীচ থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে খাটের নীচের দিকে সবার অস্ত্রের নল ঘুরে গেল। কয়েক মুহূর্তর মধ্যে খাটের নীচ থেকে উঁকি দিল একটা মাথা। না নেকড়ে নয়, পবন! অনীশ বিস্মিতভাবে বলে উঠল, 'ওখানে কী করছিলে তুমি?'

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল পবন। তারপর আতঙ্কিতভাবে বলল, 'নেকড়ে! নেকড়ে!'

অনীশ বলল, 'কোথায় নেকড়ে?'

কয়েক মুহূর্ত ধাতস্থ হতে লাগল পবনের। তারপর সে বলল, 'আপনারা চলে যাবার পর এই ফাঁকা ক্যাম্পে কেমন যেন গা-ছমছমে ভাব লাগছিল আমার। তাই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তুষারপাতও শুরু হয়েছিল বাইরে। খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ বিকালের দিকে ঘুম ভেঙে গেল একটা শব্দে। উঠে দেখি একটা বিশাল নেকড়ে দরজার নীচের ওই ফোকর দিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে!

আমি চিৎকার করলাম। তারপর আপনার ব্যাগটা ছুড়ে মারলাম ওর দিকে। দেখুন ওই যে ব্যাগটা দরজার কোণে পড়ে আছে। কিন্তু প্রাণীটা

তারপরও ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাইরে কীসের যেন শব্দ পেয়ে সম্ভবত চলে গেল এ জায়গা ছেড়ে। কিন্তু প্রাণীটা যদি আবার ফিরে আসে সে ভয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে ছিলাম আমি।'

অনীশ বলল, 'প্রাণীটা যদি ঘরে ঢুকত তবে তো খাটের তলা থেকেই টেনে বার করত তোমাকে। তুমি বাঁচতে না। নেকড়েগুলো পরপর দু-রাত এভাবে আমাকেও ধরার চেষ্টা করেছিল এ ঘরে। হয়তো আমাদের ফিরে আসার শব্দ শুনেই সে পালিয়েছে। বেঁচে গেছো তুমি।'

পবন বলল, 'তাই হবে স্যার। আমিও বাইরে আপনাদের কথাবার্তা তারপর ডাকাডাকি টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু ভয়ে আমার গলা দিয়ে শব্দ হচ্ছিল না। হাত-পা অসাড় হয়ে গেছিল। খাটের নীচ থেকে বেরোতেও পারছিলাম না।'

লেফটানেন্ট বলল, 'অর্থাৎ নেকড়েগুলো খুব কাছাকাছিই আছে। অন্তত একটা নেকড়ে তো আছেই। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। দেখুন বাইরে অন্ধকার নামা শুরু হয়েছে। আশা করছি কাল পাইনবনে তল্লাশি চালালে ওদের সবার হদিশ মিলবে। চলুন এবার ফেরা যাক।'

অনীশের মালপত্র উঠিয়ে নিয়ে পবন সহ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল সকলে। ঠিক সেই সময় যেন ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল চারপাশে। বারান্দা থেকে নেমে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে সকলে, ঠিক সে সময় সবাইকে চমকে দিয়ে বাড়ির পিছন থেকে ভেসে এল নেকড়ের ডাক! সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সকলে। লেফটানেন্ট বলে উঠলেন, 'তবে নেকড়েটা এখনও এ চৌহদ্দি ছেড়ে যায়নি।'

কথাগুলো বলেই রিভলবার খুলে তিনি এগোলেন বাড়ির পিছন দিকে যাবার জন্য। ঠিক সেই সময় আবার শোনা গেল নেকড়ের ডাক। এক নয়, একাধিক নেকড়ের সম্মিলিত হিংস্র গর্জন! তবে কি সবক'টা নেকড়েই এখানেই আছে!

বিস্মিত অনীশরা সবাই এগোচ্ছিল বাড়ির পিছন দিকে। কিন্তু সেদিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসতে দেখা গেল খাঁচার কাছে প্রহরারত দুই জওয়ানকে। অস্ত্র হাতে থাকলেও ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তাদের মুখ।

অনীশদের সামনে তারা উপস্থিত হয়ে আতঙ্কিত স্বরে একসঙ্গে বলে উঠল, 'নেকড়ে! নেকড়ে!'

লেফটানেন্ট বলে উঠলেন, 'কোথায়?'

আতঙ্কিত স্বরে একজন বলে উঠল, 'খাঁচার মধ্যে আটকে আছে স্যার।'

অন্যজন বলল, 'ওদিকে যাবেন না স্যার।'

খাঁচার মধ্যে! লোক দুজনকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ছেত্রী ছুটলেন বাড়ির পিছন দিকে। অনীশ সহ অন্য সেনারাও অনুসরণ করল তাঁকে। এমনকী সেই আতঙ্কিত সেনা দুজনও নিরুপায় হয়ে পিছনে এল। নেকড়েদের ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসছে। বাড়ির পিছনে খাঁচাগুলোর সামনে উপস্থিত হল সবাই। যে খাঁচাটার ভিতর চীনা সৈনিকদের শবদেহগুলো রাখা ছিল সেখানে একসঙ্গে অনেকগুলো টর্চের আলো ফেলা হল। খাঁচার ভিতর দাঁড়িয়ে আছে চার চারটে নেকড়ে! টর্চের আলোতে ভাঁটার মতো জ্বলছে তাদের চোখ, টকটকে লাল জিভ আর হিংস্র দাঁতের ফাঁক গলে গড়িয়ে পড়ছে ফেনা।

কে যেন বলে উঠল, 'মৃতদেহগুলো কোথায় গেল?'

খাঁচার সামনে প্রহরারত সেই আতঙ্কিত সেনাদের একজন বলে উঠল, 'অন্ধকার নামতেই মৃতদেহগুলো যেন ঘুম ভেঙে প্রথমে নড়ে উঠল। তারপর ওরা ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনেই নেকড়ে হয়ে গেল!'

লোকটার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই চারটে নেকড়ে খাঁচার গরাদের ওপর এসে ঝাঁপাতে শুরু করল। আর তার সঙ্গে কী বীভৎস চিৎকার তাদের। যেন খাঁচার বাইরে একবার আসতে পারলেই তারা ছিঁড়ে খাবে সবাইকে। আদিম হিংসার প্রতিমূর্তি যেন প্রাণীগুলো। নাকি প্রেতমূর্তি?

হতভম্ব অনীশের পাশে দাঁড়ানো লেফটানেন্ট ছেত্রী বিস্মিতভাবে প্রাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'সত্যিই তবে এরা ওয়ার উল্‌ফ! সত্যিই এরা আছে!'

অনীশ যেন নিজের চোখ কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। কিন্তু সে ব্যাপারটা অবিশ্বাসও করে কীভাবে। চীনাদের শবগুলো তো এ খাঁচাতেই রাখা হয়েছিল। তাছাড়া লোকদুটোও তো নিজের চোখে...

হতভম্ব হয়ে খাঁচার দিকে চেয়ে রইল সবাই। নেকড়েগুলো খাঁচার গরাদগুলোর ওপর ঝাঁপাচ্ছে, সীমাহীন আক্রোশে কখনও কামড় বসাচ্ছে লোহার গরাদগুলো ভেঙে ফেলার জন্য। রক্তাক্ত হয়ে উঠছে প্রাণীগুলোর মুখ। বীভৎস এক দৃশ্য!

সম্বিত ফিরে পেয়ে এক জওয়ান হঠাৎ বলল, 'গুলি চালাব স্যার?'

লেফটানেন্ট ছেত্রী বললেন, 'সম্ভবত এদের ওপর গুলি চালিয়ে কোনও লাভ হবে না। চীনা আর্মির লোকরা তো গুলি খেয়েই মরেছিল...।'

অন্য একজন বলল, 'তাহলে স্যার?'

লেফটানেন্ট ছেত্রী বললেন, 'এদের ব্যবস্থা সম্ভবত কিছু সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে। ওই দেখো...।'—এই বলে তিনি আঙুল নির্দেশ করলেন পাইনবনের দিকে। সার সার মশালের আলো সেদিক থেকে এগিয়ে আসছে কাঁটাতারের দিকে। অন্ধকার নামতেই গ্রামবাসীরা ক্যাম্প জ্বালিয়ে দিতে আসছে হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য।

লেফটানেন্ট এরপর বললেন, 'এখন আর আমাদের এখানে থাকার দরকার নেই। বলা যায় না ভুল বোঝাবুঝি হয়ে তাদের আক্রমণ আমাদের ওপরও বর্ষিত হতে পারে। তখন আমাদেরও বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হবে। অযথা কিছু মানুষের প্রাণহানি হবে।'

এ কথা বলে তিনি এগোলেন জায়গাটা ছেড়ে যাবার জন্য। বাড়ির সামনের অংশে এসে গাড়িতে উঠে বসল সবাই। কাঁটাতারের বাইরে এসে পবন আর্মি গাড়ি থেকে নেমে উঠে বসল নিজের গাড়িতে। গ্রামবাসীরা তখন পৌঁছে গেছে কাঁটাতারের গায়ে। খুঁটি উপড়ে ফেলল তারা। তারপর চিৎকার করতে করতে ছুটল বাড়িটার দিকে। গাড়ি দুটোও সে সময় একইসঙ্গে রওনা হল সেনা ছাউনির দিকে। শেষবারের মতো নেকড়ে খামারটার দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত জিনিস যেন চোখে পড়ল অনীশের। মশাল হাতে বাড়িটার দিকে ধাবমান জনতার প্রথম লোকটাকে যেন ভাইমারের মতো লাগল! কিন্তু তা কী করে সম্ভব?

গাড়ি দুটো সেনা ছাউনির দিকে যেতে যেতেই নেকড়ে খামারের দিকে

আকাশটা লাল হতে লাগল। সেদিক থেকে ভেসে আসতে লাগল জনতার আক্রোশধ্বনি আর নেকড়েগুলোর আর্তনাদ। বাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ওরা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনা ছাউনিতে পৌঁছে গেল অনীশরা। এটাও কাঁটাতার ঘেরা। অনেক লোকজন সেখানে। অস্ত্র হাতে পাহারা দিচ্ছে সামরিক বাহিনীর লোকজন। নিরাপত্তার চাদরে মোড়া জায়গাটা। দুটো গাড়ি প্রবেশ করল সেখানে। অনীশ আর পবনের জন্য দুটো আলাদা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা হল। লেফটানেন্ট ছেত্রীর তত্ত্বাবধানে রাতের খাওয়া সাঙ্গ হবার পর অনীশকে তার ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন লেফটানেন্ট। বিদায় নেবার আগে তিনি বললেন, 'আমরা আজ যা দেখলাম, যা শুনলাম তা শুধু আমাদের অভিজ্ঞতা থাকাই বাঞ্ছনীয়। বাইরের কেউ এ কথা বিশ্বাস করবে না। আমাদের পাগল ভাববে। আমার চাকরি যাবে আর আপনার ওয়াইল্ড লাইফের পদও।'

অনীশ হেসে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমি ওয়াইল্ড লাইফকে রিপোর্ট করব যে ক্যাম্পের নেকড়েগুলো বাইরে বেরিয়ে গ্রামবাসীকে মেরেছিল। তাই তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে ক্যাম্পটা। নেকড়েগুলোও মারা পরেছে তাতে। কিন্তু ভাইমার এবং আর একটা নেকড়ে?'

লেফটানেন্ট ছেত্রী বললেন, 'সম্ভবত তাদের খুঁজে বার করব আমি। নেকড়েটাকে পুড়িয়ে মারব আর ভাইমারকে গ্রেপ্তার করব। আমিও আপনার মতো একই রিপোর্ট দেব সরকারের ঘরে।'

অনীশ এবার শেষ প্রশ্নটা করল, 'আমি তাহলে কাল রওনা হতে পারি তো?'

লেফটানেন্ট ছেত্রী বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনাকে আর আটকে রাখব না। যা তুষারপাত শুরু হয়েছে তাতে হয়তো পরশুই রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি আর ফিরতে পারবেন না। কাল ভোরের আলো ফুটলেই রওনা হয়ে যাবেন আপনি।'

এ কথা বলার পর ছেত্রী সাহেব একটু যেন ইতস্তত করে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। আপনাকে একটা শেষ প্রশ্ন করি—গত দু-দিন

কি অন্ধকার নামার পর সত্যিই ক্যাম্পের বাইরে বেরোননি আপনি?'

অনীশ জবাব দিল, 'না, বেরোইনি।'

ছেত্রী বললেন, 'তাহলে হয়তো ভুল দেখেছিল আমার লোকরা। রাতের ব্যাপার তো, এমন ভুল হয়। যান এবার নিশ্চিন্তে ঘুম দিন। আশা করি ভাইমার সাহেবের নেকড়েরা এখানে আপনাকে আর বিরক্ত করবে না। শুভরাত্রি।' এই বলে অনীশের থেকে বিদায় নিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন লেফটানেন্ট ছেত্রী। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বিছানাতে শুতেই ক্লান্ত-অবসন্ন অনীশের চোখে ঘুম নেমে এল।

৮

ভোর। অনীশ যখন তার ঘরের দরজা খুলল তখন সূর্যদেব সবে উদয় হচ্ছেন বরফ পাহাড়ের মাথায়। তবে ঝিরিঝিরি তুষারপাত হচ্ছে। হয়তো বা সারা রাত ধরেই এমন তুষারপাত হয়েছে। সেনা ছাউনির ঢালু ছাদগুলো ঢাকা পড়ে আছে সাদা তুষারের তলায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল অনীশ। পবন হাজির হয়ে গেছে তার দরজার বাইরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হলেন লেফটানেন্ট ছেত্রীও।

দুজনে সুপ্রভাত বিনিময়ের পর লেফটানেন্ট ছেত্রী বললেন, 'আপনি বেরোবার পর আমিও বেরোব ভাইমার আর তার নেকড়েটার খোঁজে। সেনারা তৈরি হচ্ছে। সমস্ত রাস্তা ইতিমধ্যে সিল করে দেওয়া হয়েছে। আপনি ছাড়া কেউ এখান থেকে বেরোতে পারবে না। যেভাবেই হোক শেষ ওয়ার উল্‌ফটার হদিশ পেতে হবে ভাইমারের কাছ থেকে।'

অনীশ বলল, 'ক্যাম্পটার শেষ অবস্থা কী?'

লেফটানেন্ট জবাব দিলেন, 'সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। সারা রাত সেখানে তাণ্ডব চালিয়ে নিজেদের আক্রোশ মিটিয়ে ভোরবেলা গ্রামে ফিরে গেছে লোকগুলো। চারটে নেকড়েকেই পুড়িয়ে মারা হয়েছে। শুনলাম নাকি গায়ে

আগুন লাগার পর নেকড়েগুলো আবার চীনা সৈনিকদের রূপ ধারণ করেছিল। ভল্‌কে ভল্‌কে রক্তবমি করছিল তারা। একজনের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল একটা কাটা আঙুল। সে আঙুলে একটা আংটি ছিল। যা দেখে গ্রামের লোকরা সেটা সেই নিহত ছেলের আঙুল বলে সনাক্ত করেছে। এই সুন্দর ভোরে, এসব কথা আর বেশি শুনতে ইচ্ছা করল না। অনীশ তার স্মৃতি থেকে যথাসম্ভব দ্রুত মুছে ফেলতে চায় এই অবিশ্বাস্য ভয়ংকর ঘটনাগুলোকে।

সে বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হয়তো আপনার জন্যই ফেরা হচ্ছে আমার। তবে ভাইমার আর তার ওয়ার উল্‌ফের সন্ধান পেলে আমাকে জানাবেন। সেই নেকড়েটা আমি দেখেছিলাম। ধবধবে সাদা রং, আকারে অন্য নেকড়েগুলোর প্রায় দ্বিগুণ। এবার তাহলে আমি চলি।'

লেফটানেন্ট ছেত্রী তার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'হ্যাঁ, আসুন। আমাকেও বেরোতে হবে।'

কিছুটা এগিয়ে অনীশ পবনকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। সেনা ছাউনি ছেড়ে ফেরার জন্য রওনা হয়ে গেল অনীশ। সেই নেকড়ে ক্যাম্পের পাশ দিয়ে ফেরার পথে ক্যাম্পের সামনে গাড়ির গতি মৃদু কমিয়ে সেদিকে তাকাল পবন। অনীশও শেষ বারের মতো সেদিকে তাকাল। চারপাশের কাঁটাতারের বেড়াগুলোকে সব উপড়ে ফেলা হয়েছে। বাড়িটার জায়গায় বিশাল জায়গা জুড়ে ছাইয়ের স্তূপের মধ্যে শুধু দু-একটা অগ্নিদগ্ধ খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে। তখনও কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে।

অনীশ স্বগতোক্তির স্বরে বলল, 'সবই ঠিক হল। একটাই শুধু ভয়, এখানে তো আরও নেকড়ে আছে, ভবিষ্যতে তাদের সবাইকেই না ওয়ার উল্‌ফ ভেবে পুড়িয়ে মারে গ্রামবাসীরা।'

তার কথা কানে যেতে বিষণ্ণ হেসে আবার গাড়ির গতি বাড়াল পবন।

পিছনে পড়ে রইল নেকড়ে খামার। একসময় রাস্তার পাশের সেই পাইনবনও হারিয়ে গেল। সে রাস্তা ছেড়ে পাসে প্রবেশ করল অনীশের গাড়ি। পাসের ভিতর অনেক বেশি তুষারপাত হচ্ছে। পথ, দু-পাশের

প্রাচীর সবই তুষারে আচ্ছাদিত। শনশন শব্দে বাতাসও বইছে। শক্ত হাতে হুইল ধরে তুষার ভেঙে পাকদণ্ডী বেয়ে নীচে নামতে শুরু করল পবন। অনীশ আর পবন দু-জনেই নিশ্চুপ। হয়তো তারা দু-জনেই ভাবছিল তাদের ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা। তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে একটার পর একটা বাঁক অতিক্রম করে নীচের দিকে নামতে লাগল গাড়ি। এ রাস্তাতেও আর আগের দিনের মতো দু-একজন লোকও চোখে পড়ছে না। নাগাড়ে কদিন ধরে তুষারপাতের ফলে লোকজনের চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই দেখে অনীশ একসময় মন্তব্য করল, 'রাস্তার যা অবস্থা তাতে ওপরে আর একদিন থাকলে আর ফেরা হত না।'

তার কথা শুনে ঘাড় নাড়ল পবন।

সামনেই একটা বাঁক। তার একপাশে বরফ মোড়া পাহাড়, অন্য পাশে খাদের ভিতর থেকে উঠে এসেছে গভীর পাইনবন। তাদের মাথাগুলো সব তুষারের চাদরে মোড়া। সেই বাঁকের মুখে পৌঁছে হঠাৎই যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল গাড়িটা। পবন চাবি ঘুরিয়ে বার কয়েক গাড়িটাকে চালাবার চেষ্টা করল ঠিকই কিন্তু তাতে গোঁ গোঁ শব্দ হল কিন্তু গাড়ি স্টার্ট হল না। গাড়ি থেকে নেমে পবন প্রথমে গাড়ির সামনের বনেটটা খুলল। ইঞ্জিনটা দেখতে লাগল সে।

গাড়ির ভিতরে বসে অনীশ জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?' পবন জবাব দিল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার। একবার গাড়ির নীচে ঢুকে দেখি। নইলে মেকানিক ডাকতে হবে ফোন করে।' এই বলে পবন গাড়ির বনেট বন্ধ করে শুয়ে পড়ে গাড়ির তলায় ঢুকে গেল। গাড়ির তলায় খুটখাট শব্দ শুরু হল। অনীশ তাকিয়ে রইল রাস্তার পাশের পাইনবনের দিকে। খাদের ভিতর যে জায়গা থেকে গাছগুলো ওপরে উঠে এসেছে সে জায়গাটাতে কী অন্ধকার। সূর্যের আলো প্রবেশ করে না সেখানে। হয়তো বা ওরকম জায়গাই নেকড়েদেরও প্রিয়। সেদিকে তাকিয়ে এ সব নানা কথা ভাবতে লাগল অনীশ। সময় এগিয়ে চলল।

একটা সময় সে জায়গায় বেশ তুষারপাত শুরু হল। ঠিক সে সময় অনীশের খেয়াল হল গাড়ির তলা থেকে আর যেন কোনও শব্দ কানে

আসছে না। ইতিমধ্যে মিনিট পনেরো সময় কেটে গেছে। অনীশ হাঁক দিল—'পবন? পবন?' কিন্তু পবনের কোনও সাড়া মিলল না। পবন কি তবে অনীশকে গাড়িতে একলা রেখে মেকানিকের খোঁজে গেল? কিন্তু এ রাস্তায় সে মেকানিক পাবে কোথায়?'

ব্যাপারটা বোঝার জন্য গাড়ি থেকে অনীশ লাফিয়ে নীচে নামল। গাড়ির বাইরে ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবল তুষারপাত শুরু হল। তার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র কনকনে বাতাস। কিছুটা তফাতেই সব কিছু যেন তুষার ঝড়ে অদৃশ্য লাগছে। পিছনের পথটাতে ভালো করে দেখার চেষ্টা করল অনীশ। তারপর শেষ একবার গাড়ির নীচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পবন তুমি কি গাড়ির তলাতেই আছ?'

অনীশের কথার প্রত্যুত্তরে প্রথমে একটা অস্পষ্ট খসখস শব্দ হল গাড়ির তলা থেকে। তারপর পবনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হ্যাঁ, আমি এখানে। বেরোচ্ছি...।'

গাড়ির সামনে থেকে অনীশ কয়েক হাত তফাতে সরে এল পবনকে বাইরে আসার সুবিধা করে দেবার জন্য। কিন্তু গাড়ির তলা থেকে তুষার ঝড়ের মধ্যে গুড়ি মেরে যে ধীরে ধীরে বাইরে বেরোতে শুরু করল তাকে দেখে প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল অনীশের হৃৎপিণ্ড।

বিশাল একটা ধবধবে সাদা নেকড়ে বেরিয়ে আসছে গাড়ির তলা থেকে। জ্বলন্ত চোখ, চোয়ালে সার সার হিংস্র দাঁতের পাটির আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে লাল জিভ, সাদা ফেনা ঝরছে তার থেকে। মুহূর্তের মধ্যে তাকে চিনে ফেলল অনীশ। ভাইমারের সেই পালের গোদা ওয়ার উল্‌ফটা। যে হানা দিয়েছিল অনীশের ঘরে।

গাড়ির তলা থেকে বেরিয়ে একবার হাঁ করল প্রাণীটা। ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো দেখিয়ে সে যেন হেসে অনীশকে বলল, 'এবার কোথায় পালাবে তুমি?' সত্যিই অনীশের পালাবার পথ বন্ধ। রাস্তার একপাশে খাড়া পাথুরে দেওয়াল, অন্যপাশে পাইনবনের অন্ধকার খাদ। তার পিছনের রাস্তাটা তুষারঝড়ে অদৃশ্য আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে নেকড়েটা!

অনীশ তবুও কিছুটা ছুটে পাথরের দেওয়ালের একটা খাঁজে আত্মরক্ষার

জন্য পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কীভাবে আত্মরক্ষা করবে অনীশ? তার কাছে একটা লাঠিও নেই। নেকড়েটা এবার এগোতে লাগল তার দিকে। ধীরে সুস্থে একটু যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোচ্ছে সে। শিকার ধরার কোনও তাড়া নেই তার। কারণ সে বুঝতে পেরেছে শিকারের পালাবার সব পথ বন্ধ। তার ধবধবে সাদা দেহ তুষারের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তুষার ঝড়ের মধ্যে শুধু দেখা যাচ্ছে তার জ্বলন্ত চোখ দুটো আর টকটকে লাল জিভটা। জিভ চাটছে বীভৎস প্রাণীটা। জ্বলন্ত চোখ দুটো ক্রমশ এগিয়ে আসছে অনীশের দিকে।

হঠাৎ অনীশ তার পায়ের সামনেই বরফের মধ্যে পড়ে থাকা একটা পাথরখণ্ড দেখতে পেল। বাঁচার জন্য একটা শেষ চেষ্টা করল অনীশ। সে পাথরটা তুলে নিয়ে সজোরে ছুড়ে মারল প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে। পাথরটা আছড়ে পড়ল নেকড়েটার পিঠের ওপর। একটা রক্ত জল করা গর্জন করে প্রাণীটা প্রথমে লাফিয়ে উঠল। তার নখের আঘাতে ছিটকে উঠল বরফের ধুলো। আর এরপরই সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দ্রুত এগোতে লাগল অনীশের দিকে।

অনীশের হাত দশেক দূরে এসে থামল প্রাণীটা। কী হিংস্র তার চোখের দৃষ্টি। আদিম জিঘাংসার প্রতিমূর্তি যেন এই প্রাণীটা। পৃথিবীর সব বীভৎসতা, সব অশুভ শক্তি যেন সঞ্চারিত হয়েছে তার মধ্যে।

ধীরে ধীরে খাড়া হয়ে উঠতে লাগল সেই ভয়ংকর, অশুভ জীবটার ঘাড় ও পিঠের রোমগুলো। থাবার থেকে উঁকি দিল ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ নখর। সে এবার ঝাঁপ দেবে শিকারকে লক্ষ্য করে। অসহায় অনীশ হাত দিয়ে তার গলাটা আড়াল করল যাতে সে প্রথমেই গলায় কামড় বসাতে না পারে। ধনুকের ছিলার মতো ওপর দিকে বেঁকে গেল জন্তুটার পিঠ। লাফ দেবার ঠিক আগের মুহূর্ত! ঠিক এই সময় প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। লাফ দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে কীসের যেন প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়ল হিংস্র প্রাণীটা। রক্তজল করা একটা বীভৎস আর্তনাদ ছিন্নভিন্ন করে দিল চারপাশের নিস্তব্ধতাকে। আর এর পরক্ষণেই অনীশের মাথার ওপর পাথরের দেওয়ালের ওপর থেকে ঝুপঝুপ করে

লাফিয়ে নীচে নামল বেশ কয়েকজন সামরিক পোশাক পরা লোক। তার মধ্যে লেফটানেন্ট ছেত্রীও আছেন। এরপর একযোগে বেশ কয়েকটা স্বয়ংক্রিয় রাইফেলের গুলি একনাগাড়ে বর্ষিত হতে লাগল নেকড়েটার ওপর। গুলির আঘাতে উড়তে লাগল তার লোম, ছিটকে উঠতে লাগল তার রক্ত। বেশ কিছুক্ষণ গুলি বর্ষণের পর থামল সেনারা। ক্ষতবিক্ষত নেকড়ের দেহটার দিকে আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে তাকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়াল সেনারা।

অনীশ এবার দেওয়াল ছেড়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল লেফটানেন্টের পাশে। তিনি অনীশের কাঁধে হাত দিয়ে আশ্বস্ত করে বললেন, 'আর এখন ভয় নেই আপনার। আপনি সত্যি বেঁচে গেলেন এ যাত্রায়।'

প্রত্যুত্তরে অনীশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় হঠাৎই নড়ে উঠল নেকড়ের মৃতদেহটা। একজন সেনা আবার গুলি চালাতে যাচ্ছিল কিন্তু ছেত্রীসাহেব ইশারায় থামতে বললেন তাকে। এরপর দেহটার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল উপস্থিত সবাই। মাথার ওপর থেকে তুষার ঝরে পড়ছে দেহটার ওপর। নেকড়ের দেহটা প্রথমে দুমড়াতে-মুচড়াতে আরম্ভ করল, গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগল মৃত নেকড়েটার মুখ থেকে। তারপর সবার চোখের সামনেই নেকড়ের দেহটা বদলে গেল একটা মানুষের মৃতদেহে। দীর্ঘকায় এক চীনার মৃতদেহ!

তার মুখটা যেন কেমন চেনা চেনা মনে হল অনীশের। লেফটানেন্টের কথায় তার ভাবনার উত্তর পেয়ে গেল অনীশ। তিনি বললেন, 'এ লোকটার ছবি আমি আপনাকে আমার ফাইল থেকে দেখিয়েছিলাম। পাঁচটা লোকের ছবি ছিল ফাইলে যাদের গুলি করে মারে আমাদের বাহিনী। এদের দলপতি ছিল এ লোকটাই। চীনা সৈন্যদের মধ্যে সাধারণত এমন লম্বা চওড়া লোক দেখা যায় না। আমাদের সেনা ছাউনিতে নাশকতা চালাবার জন্য এরই নেতৃত্বে আরও চারজন এদেশে ঢুকেছিল সীমান্ত পেরিয়ে। যাই হোক শেষ পর্যন্ত ওদের দলের শেষ লোকটাকে, শেষ নেকড়েটাকে খুঁজে পেলাম আমরা। তবে এ দেহটাকেও এখন পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে হবে। নইলে অন্ধকার নামলেই বেঁচে উঠবে দেহটা।'

অনীশ বলল, 'কিন্তু ভাইমার? আসল যে লোকটা এই ওয়ার উল্‌ফগুলোকে আশ্রয় দিয়েছিল তার কী খবর। ধরতে পেরেছেন ভাইমারকে?'

লেফটানেন্ট প্রথমে হাসলেন। তারপর ফিরে তাকালেন পিছন দিকে। কখন যেন সেখানে নিঃশব্দে হাজির হয়েছে একটা সামরিক জিপ। তার থেকে নেমে তুষারঝড়ের মধ্যে এগিয়ে আসছে একজন। লোকটা কাছাকাছি আসতেই তাকে দেখে আবারও অনীশের হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এগিয়ে আসছেন স্বয়ং ভাইমার। তার হাতে ধরা একটা কাঠগোলাপের থোকে।

খুঁড়িয়ে নয়, বেশ লম্বা লম্বা পা ফেলে লোকটা এসে দাঁড়াল অনীশের সামনে। তারপর মৃদু হেসে অনীশের উদ্দেশ্যে বলল, 'হ্যাঁ, আমিই ভাইমার। যে নেকড়ে খামারটা ছিল সেটা আমারই ছিল।'

অনীশের মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। তাই দেখে লোকটা বলল, 'আমি খোঁড়াও নই আর এই কাঠগোলাপের গন্ধ আমার বেশ ভালোই লাগে। ওয়ার উল্‌ফরা ভয় পায় এই বুনো কাঠগোলাপকে। আপনি ওয়ার উল্‌ফ কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যই প্রতি সকালে গ্রামবাসীরা এই কাঠগোলাপের স্তবক দিত আপনার হাতে। আমিই বনের ভিতর থেকে ফুল সংগ্রহ করে দিতাম নরবুকে। আপনার সঙ্গে আমার একদিন সত্যিই সাক্ষাৎ হয়েছিল পাইনবনের ভিতর। এটা আমার উপহার। —এই বলে তিনি ফুলটা ধরিয়ে দিলেন অনীশের হাতে।

অনীশের মাথার ভিতরটা কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সে অস্পষ্টভাবে বলল, 'আপনার সঙ্গে যদি আমার মাত্র একবার দেখা হয়ে থাকে তবে কোন ভাইমারের সঙ্গে তিনটে রাত নেকড়ে খামারে কাটালাম?'

ভাইমার মাটিতে পড়ে থাকা দেহটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই লোকটার সঙ্গে। ওয়ার উল্‌ফরা আমার আপনার সবার দেহ ধারণ করতে পারে। ও করেও ছিল তা।'

অনীশ বলল, 'আমার মাথার ভিতর সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে!

আপনারা কীভাবে এখানে উপস্থিত হলেন?'

লেফটানেন্ট ছেত্রী বললেন, 'চলুন আপনাকে পৌঁছে দেবার পথে সব কথা বুঝিয়ে দেব। ভয় নেই আমরা কেউ ওয়ার উল্ফ নই। আপনার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি সত্যি ভাইমার।'

অনীশ এবার চারপাশে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করে বলল, 'কিন্তু আমার ড্রাইভার পবন কোথায় গেল?'

লেফটানেন্ট সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'সে আর কোনওদিন ফিরবে না।'

তারপর তিনি বললেন, 'মালপত্র নিয়ে আমাদের গাড়িতে উঠুন। যা তুষারপাত শুরু হয়েছে তাতে দেরি হলে আপনাকে গ্যাংটক শহরে পৌঁছে দিয়ে আমরা আর ওপরে ফিরতে পারব না।'

সৈনিকদের কয়েকজন চীনা সৈনিকের সেই দেহটাকে পোড়াবার প্রস্তুতি শুরু করল। তাদের সেখানে ছেড়ে রেখে লেফটানেন্ট অনীশ, ভাইমার আর দু-জন সেনাকে নিয়ে আর্মি গাড়িটাতে উঠে বসলেন। পাকদণ্ডী বেয়ে নামতে শুরু করল গাড়ি।

৯

রেশমপথ বেয়ে নীচে নামতে লাগল গাড়িটা। প্রথমে লেফটানেন্ট ছেত্রী আর ভাইমার চুপচাপ রইলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় কিছুটা বিহ্বল, উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল অনীশ। হয়তো বা তাকে ধাতস্থ হবার জন্য কিছুটা সময় দিলেন তারা। তারপর প্রথমে অনীশের উদ্দেশ্যে মুখ খুললেন ভাইমার। তিনি বললেন, 'ঘটনাটা তবে খুলেই বলি আপনাকে। আমার কথার কোনও অংশ বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করবেন।'

অনীশ বলল, 'আচ্ছা।'

একটু চুপ করে থেকে ভাইমার বলতে শুরু করলেন, 'আপনি যেমন বন্যপ্রাণ প্রেমী মানুষ আমিও ঠিক তেমনই মানুষ। আমার বাড়ি জার্মানীর বাভারীয় পর্বতাঞ্চলের যে অংশে সেখানে প্রচুর তুষার নেকড়ে পাওয়া

যায়। তাই ছোটবেলা থেকেই ওদের সঙ্গে আমি পরিচিত, ভালোবাসি এই প্রাণীগুলোকে। খোঁজ নিলে দেখবেন ওদেশের নেকড়ে সংরক্ষণ আন্দোলনের সঙ্গেও আমি যুক্ত ছিলাম। সব দেশেই অত্যাচার চালানো হয় ওদের ওপর। কখনও বা তা চামড়ার জন্য, কখনও বা ওয়ার উল্ফ ভেবে মারা হয় ওদের। যাই হোক এদেশে আমি প্রথম টিবেটিয়ান উল্ফের খোঁজে আসিনি। এসেছিলাম পায়ে হেঁটে সিল্করুট অতিক্রম করার জন্য। ট্রেকিং আমার অন্যতম নেশা। যাই হোক ট্রেকিং করতে করতে একদিন পাসের মধ্যে পেয়ে গেলাম একটা নেকড়েকে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল ওটা। জানলাম দু-দেশের সীমান্তে সৈনিকদের গুলিতে প্রায়শই এই ঘটনা ঘটে। রাতের অন্ধকারে নেকড়েগুলোকে ঠিক চিনতে না পেরে অপর পক্ষের সেনা আত্মগোপন করে আছে ভেবে গুলি চালায় সেনারা। তখন আমি আশ্রয় নিয়েছি যেখানে উল্ফ রিহ্যাবিলেটেশন ক্যাম্প করেছিলাম সেখানেই। বাড়িটা তখন পরিত্যক্ত ছিল। ট্রেকার্সরা মাঝে মাঝে রাত কাটাত সেখানে। যাই হোক সে বাড়িটাতে আমি তুলে আনলাম আহত নেকড়েটাকে। তার শুশ্রুষা করে তাকে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তুলতে লাগলাম।

নেকড়েদের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই আমার মমত্ব। তাই আমি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম পাস ধরে তিব্বত না গিয়ে আমি কাজ করব এই অসহায় প্রাণীগুলোর জন্য। আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানালাম এ ব্যাপারে। তারাও স্বাগত জানাল ব্যাপারটাকে। আর্মিও ছাড়পত্র দিল ক্যাম্প খোলার জন্য। বাড়িটা মেরামত করে টিবেটিয়ান উল্ফ রিহ্যাবিলেটেশন ক্যাম্প খুলে বসলাম আমি। স্থানীয় গ্রামবাসীরা তার নাম দিল 'নেকড়ে খামার'। তাদের সঙ্গেও বেশ সুসম্পর্ক ছিল আমার। তারা আমার সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করেছিল ঠিকই, কিন্তু নেকড়ে সম্পর্কে প্রচলিত ভয়ার্ত ধারণার জন্য তারা কেউ খামারে কাজ করতে চাইল না। তার ফলে সীমান্তর ওপার থেকে চারজন তিব্বতী শরণার্থীকে আমি খামারের কাজে নিয়োগ করলাম। তাদের সবাই সৎ, নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিল। তবে গ্রামপ্রধান নরবুর থেকে খামার বা ক্যাম্পের রসদ সংগ্রহ

করা হত। ভালোই চলছিল সবকিছু, একে একে আরও তিনটে, অর্থাৎ মোট চারটে নেকড়ে সংগ্রহ করলাম আমি...

এতক্ষণ ভাইমার সাহেব যা বললেন তার অনেকখানিই ফাইলে পড়েছে অনীশ। তবুও সে শুনে গেল তার কথাগুলো।

একটু থেমে ভাইমার সাহেব এরপর বললেন, 'কিন্তু এ সব ঘটনার সূত্রপাত মাস ছয়-সাত আগে। ঠিক সেদিনের আগের রাতে আমি গুলির লড়াইয়ের শব্দ শুনেছিলাম আমার ক্যাম্পে বসে।'

ভাইমারের কথার মাঝেই লেফটানেন্ট ছেত্রী এবার বললেন, 'হ্যাঁ, ওই রাতেই আমরা গুলি চালাই চীনা সেনাদের ওই পাঁচজন অনুপ্রবেশকারীকে লক্ষ্য করে। আমরা নিশ্চিত ছিলাম সবাই নিহত হয়েছে। কিন্তু পরদিন অনেক অনুসন্ধান করেও তাদের কারো মৃতদেহ আমরা খুঁজে পাইনি।'

ভাইমার সাহেব এরপর বললেন, 'যাই হোক সেদিন সারারাত গুলি যুদ্ধর পর, পরদিন সকালে পাইনবনের মধ্যে খুঁজে পেলাম একটা অর্ধমৃত নেকড়েকে। মর্টারের শেলের আঘাতে একটা পা ভেঙে গেছে তার। তবে অতবড় নেকড়ে আমি আগে কোনওদিন দেখিনি।

দানবাকৃতির নেকড়ে! ধবধবে সাদা গায়ের রং। ঠিক যেমন নেকড়েটাকে দেখেছিলেন আপনি। নেকড়েটাকে তুলে আমি ক্যাম্পে নিয়ে এসে কিছুদিনের মধ্যেই তাকে সুস্থ করে তুললাম। তবে তার পা-টা সম্পূর্ণ ঠিক হল না। সুস্থ হলেও একটু খুঁড়িয়ে হাঁটত সে। তখন আমি বুঝতে পারিনি সে আসলে কে? তাকে ক্যাম্পে আনাই আমার কাল হয়েছিল। এর কয়েকদিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে ক্যাম্পে অস্বাভাবিক কিছু ঘটনা ঘটতে লাগল। ধরুন আমার চারজন কর্মচারীদের কেউ বাইরে কাজে বেরিয়েছিল কিন্তু তারা সে রাতে আর কেউ ফিরল না।

পরদিন তারা যখন ফিরল তখন তারা কেমন যেন অচেনা মানুষ। হাজার জিগ্যেস করলেও তারা বলত না যে সারা রাত তারা কোথায় কাটিয়েছে। আর যেদিন তারা রাতে উধাও হত তার পরদিন ভোরেই জঙ্গলের মধ্যে খোঁজ মিলত এক একটা মৃতদেহর। সাধারণত নেকড়েরা কোনও কারণে মানুষ মারলেও তার মাথা খায় না। কিন্তু এই বিবস্ত্র

দেহগুলোর মাথা থাকত না। তাই তাদের সনাক্তও করা যেত না। পরে বুঝেছিলাম যে সেগুলো আসলে ছিল আমার কর্মীদেরই দেহ। তাদের খেয়ে ফেলে পরদিন তাদের অবয়ব ধারণ করে ফিরে আসত এক একজন মৃত চীনা সেনা বা ওয়ার উল্‌ফ। একে একে আমার চারজন কর্মীকেই মেরে তাদের জায়গা দখল করল তারা। তারপর একদিন আমার চারটে নেকড়েকেও কীভাবে যেন মেরে খাঁচার ভিতর ঢুকে তাদের জায়গায় নেকড়ে রূপ ধারণ করল তারা চারজন। আর তাদের দলপতি তো নেকড়েরূপে আগেই ছিল খাঁচার মধ্যে।

একদিন সকালে উঠে আমি আর আমার কোনও লোককেই খুঁজে পেলাম না। লোকগুলো গেল কোথায়? সেদিন সন্ধ্যায় আমি খাঁচার কাছাকাছি গিয়ে শুনলাম এক অদ্ভুত কথোপকথন। খাঁচার ভিতর থেকে একজন যেন বলছে 'সাহেবটাকে শেষ করে দিতে পারলেই আমরা দখল নিতে পারব বাড়িটার।'

তার কথা শুনে আর একজন লোক যেন বলল, 'হ্যাঁ, দু-এক দিনের মধ্যেই কাজটা শেষ করব।'

কথাবার্তাটা কানে যেতেই আমি চমকে উঠে খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু কোনও খাঁচায় কোনও লোক নেই। খাঁচার ভিতর থেকে নেকড়েগুলো যেন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তাদের চোখে এ দৃষ্টি আমি কোনওদিন দেখিনি। সেদিনই আমার প্রথম সন্দেহ হয় ওয়ার উল্‌ফের ব্যাপারে। আমি ঘটনাটা বলার জন্য টেলিফোন করেছিলাম ছেত্রী সাহেবকে। কিন্তু উনি আমার কথা শুনে হাসলেন, আমিও ফোন রেখে দিলাম...।'

লেফটানেন্ট ছেত্রী এ কথা শুনে বললেন, 'তখন এ কথা আমার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না। আর আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আপনার নেকড়ের মৃতদেহ আমরা দু-দিন আগে বরফের তলা থেকে সংগ্রহ করেছি চীনা সৈনিকদের মৃতদেহ খুঁজতে গিয়ে।'

ভাইমার আবার শুরু করলেন তার কথা—'পরদিন রাতেই কীভাবে যেন বেরিয়ে পড়ে আক্রমণ করার চেষ্টা করল আমার ওপর। বরাতজোরে

আমি ক্যাম্প থেকে কোনওরকমে আত্মগোপন করলাম পাইনবনে। সেখানে বনের ভিতর এক জায়গাতে কাঠগোলাপের অনেক গাছ আছে সেখানেই। কারণ বনের ওই একটা অংশকেই এড়িয়ে চলে ওয়ার উল্‌ফরা। কোথায় যাব আমি? কাকে বলব আমার কথা? কেউ বিশ্বাস করত না আমার কথা। তবে একজন বিশ্বাস করল আমার কথা। সে হল নরবু। তার দয়াতেই বাঁচলাম আমি। দুজনে মিলে আলোচনা করে ঠিক করলাম সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। তবে সে সুযোগ যে নরবুর নাতির প্রাণের বিনিময়ে আসবে তা জানা ছিল না আমাদের। অবশ্য একইভাবে এটাও সত্যি যে সেদিন রাতে খিদের জ্বালাতে নেকড়েগুলো যদি ক্যাম্পের বাইরে বেরিয়ে ছেলেটাকে না মারত তবে হয়তো ঘটনাটার শেষ হত না। কতদিন আমি পাইনবনের ভিতর থেকে দেখেছি ক্যাম্পের ভিতর আমারই ভেক ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই বিশাল ওয়ার উল্‌ফটা। কিন্তু তাকে সে সময় চুপচাপ দেখা ছাড়া কিছু করার ছিল না আমার।'

লেফটানেন্ট ছেত্রী এরপর বললেন, 'পালের গোদা শয়তান নেকড়েটা দু-রাত আপনার রূপ ধরেও বেরিয়েছিল। ইচ্ছা করেই সে আমার সেনাদের বলেছিল যে আপনি নাকি এ জায়গায় থেকে যেতে চান। কারণ, সে ভেবেছিল যে আসল ভাইমারকে সে যদি শেষ করতে না পারে, ভাইমার যদি আত্মপ্রকাশ করেন তবে আপনার রূপ ধরেই জায়গাটাতে থেকে যাবে সে। আমরা ঠিক সময় উপস্থিত না হলে তার ইচ্ছা হয়তো বাস্তব হত।'

অনীশ এবার প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আমার খোঁজ আপনারা পেলেন কীভাবে?'

ভাইমার বললেন, 'গতকাল রাতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ক্যাম্পটা জ্বালাতে গেছিলাম আমিও...।'

অনীশ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি মুহূর্তের জন্য একবার গ্রামবাসীদের মধ্যে আপনাকে দেখেছিলাম। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। আমার দৃষ্টি বিভ্রম ভেবে আমি কথাটা বলিনি ছেত্রী সাহেবকে।

ভাইমার বললেন, 'হ্যাঁ, ব্যাপারটা আপনার কাছে অবশ্যই অবিশ্বাস্য ছিল। ক্যাম্পে ঢুকে প্রথমে চারটে ওয়ার উল্‌ফকে পুড়িয়ে মারলাম আমরা। তারপর পুরো বাড়িটাতে আগুন লাগাবার আগে আমরা তল্লাশি শুরু করলাম পালের গোদা নেকড়েটার খোঁজে। একটা ঘরে তার দরজার একটা পাল্লার নীচের অংশ ভাঙা ছিল। নেকড়ের নখের অজস্র চিহ্ন ছিল দরজার গায়ে। সে ঘরের খাটের নীচে উঁকি দিতে দেখেই একটা লাশ। সেই দেহটা বার করতেই আমি চিনতে পারলাম তাকে। আপনার ড্রাইভার পবন। নরবুও চিনতে পারল তাকে। পবন নামের ওই লোকটাকে আমি আপনাকে গ্রাম থেকে পাইনবন পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দেখেছি। তার গলার নলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছিল নেকড়ের দাঁতে।'

অনীশ বিস্মিতভাবে বলে উঠল, 'ওটাই আমার ঘর ছিল। তবে পবনকে খুন করে তার রূপ ধারণ করে খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এসেছিল ওয়ার উল্‌ফটা?' লেফটানেন্ট ছেত্রী মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করলেন অনীশের কথায়।'

ভাইমার এবার বললেন, 'ক্যাম্পটাকে পুড়িয়ে শেষ করে দিতে প্রায় রাত হয়ে গেল। গ্রামে ফিরে এসে নরবুর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম এবার ব্যাপারটা খুলে বলা প্রয়োজন লেফটানেন্টের কাছে। নইলে হয়তো আমাকেই ওয়ার উল্‌ফ ভেবে বা তাদের আশ্রয়দাতা ভেবে গুলি চালিয়ে মারবে সেনারা। একটা কাঠগোলাপের বোকে আর নরবুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম সেনা ছাউনিতে। লেফটানেন্ট তখন আমারই সন্ধানে অর্থাৎ সেই ওয়ার উল্‌ফ ভাইমারের সন্ধানে বেরোতে যাচ্ছিলেন। আমি আর নরবু তাকে খুলে বললাম সব কথা। ওর মুখেই শুনলাম আপনার ড্রাইভার পবন নাকি রওনা হয়েছে আপনাকে নিয়ে। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল সবকিছু। আপনার ড্রাইভার আসলে পবন নয়, সে আসলে পবনের রূপধারী ওয়ার উল্‌ফ! সঙ্গে সঙ্গে আপনার অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। ভাগ্যিস আমরা ঠিক সময় পৌঁছেছিলাম। আর একটু হলেই...।' কথা শেষ করলেন ভাইমার।

অনীশের আর কিছু জানা বা বোঝার নেই। তাই আর কোনও প্রশ্ন

করল না সে।

গাড়ি প্রথমে পৌঁছোল নাথুলা পাসের সেই ট্যুরিস্ট স্পটে। তারপর এগোল গ্যাংটক শহরের দিকে। দুপুরবেলা গ্যাংটক শহরে এক হোটেলে অনীশের আশ্রয় ঠিক করে বিদায় নিলেন লেফটানেন্ট ছেত্রী আর ভাইমার। যাবার আগে লেফটানেন্ট আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন তার কথা—'আপনি যা দেখলেন, যা শুনলেন কাউকে তা বলতে যাবেন না। লোকে আপনাকে পাগল ভাববে।'

অনীশ বলল, 'আচ্ছা। তবে চেষ্টা করবেন যাতে গ্রামবাসীরা নেকড়ে দেখলেই তাকে ওয়ার উল্‌ফ ভেবে পুড়িয়ে না মারে।'

ভাইমার আর লেফটানেন্ট ছেত্রী একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমরা সে চেষ্টাই করব।'

ভাইমার আর লেফটানেন্ট ছেত্রী চলে যাবার পর হোটেলের দোতলায় উঠে নিজের কামরাতে প্রবেশ করল অনীশ। খোলা জানলা দিয়ে দূরের পাহাড়শ্রেণি দেখা যাচ্ছে। ওদিকেই তো নাথুলা পাস। ওদিক থেকেই নেমে এসেছে সে। গ্যাংটক শহরে তুষারপাত না হলেও আকাশটা কেমন যেন মেঘাচ্ছন্ন। হয়তো বা বৃষ্টি হবে। ঘরের ভিতর বিরাজ করছে আঁধো অন্ধকার।

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলতেই একটা লোক ঘরে ঢুকল। সে জানতে চাইল অনীশের কিছু প্রয়োজন আছে কিনা? হোটেলেরই কর্মচারী সে। তার চেহারা দেখে অনীশের মনে হল সে চীনা বা তিব্বতী হতে পারে। অনীশ তাকে বলল, 'কিছু খাবার দিয়ে যাও।'

লোকটা অর্ডার নিয়ে চলে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় অনীশের হঠাৎ মনে হল, ঠিক এমনই একটা লোককে সে যেন দেখেছিল সেই নেকড়ে খামারে! এ লোকটাও ওয়ার উল্‌ফ নয়তো?'

অনীশ তাকে বলল, 'এক মিনিট দাঁড়াও।'

দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা।

অনীশ তাকে ব্যাগ থেকে ভাইমারের উপহার দেওয়া সেই বুনো কাঠগোলাপের বোকেটা বার করে লোকটার হাতে ধরিয়ে বলল, 'এটা

আমি তোমাকে উপহার দিলাম।'

লোকটা স্বাভাবিকভাবেই বোকেটা নিল। তারপর বলল, 'ধন্যবাদ স্যার। ওই যে নাথুলা পাসের ওদিকে পাহাড় দেখলেন ওখানেই ফোটে এই কাঠগোলাপ। এটা আমি বাড়িতে রেখে দেব। আপনি শহুরে মানুষ। হয়তো ওয়ার উল্‌ফে বিশ্বাস করেন না। সীমান্তে যারা যুদ্ধে মারা যায় তারা ওয়ার উল্‌ফ—অপদেবতা হয়। নেকড়ে মানুষ! আমরা বিশ্বাস করি ব্যাপারটা। এই বুনো গোলাপের শুকনো ফুলও যদি বাড়িতে থাকে তবে ওই ওয়ার উল্‌ফরা বাড়িতে ঢুকতে সাহস পায় না। অনেকদিন ধরে এ ফুল খুঁজছিলাম স্যার।' এই বলে লোকটা ফুলের বোকেটা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অনীশ চেয়ে রইল জানলার বাইরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেঘ কেটে গেল। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ল বরফ ঢাকা পাহাড়ের মাথায়। অনীশের ঘরটাও ভরে উঠল আলোতে। অন্ধকার কেটে গেল। খোলা জানালা দিয়ে বাইরের সূর্যালোকে উদ্ভাসিত পাহাড়শ্রেণির অপরূপ সৌন্দর্যর দিকে তাকিয়ে অনীশ মনে মনে বলল, 'হয়তো বা পুরো ঘটনাটাই নিছকই একটা দুঃস্বপ্ন ছিল!'



মাদাগাস্কারের জঙ্গলে পাওয়া যায় এক নরখাদক গাছ।
সেই গাছের সন্ধানে ক্রিপ্টোজুলজিস্ট হেরম্যান
আর সুদীপ্ত অভিযান চালায় জল-জঙ্গলে
ঘেরা কুমির-শিকারিদের গ্রামে।
তারপর... ?
সিকিমের কুয়াশামাখা পার্বত্য অঞ্চলে প্রাচীন রেশম পথ।
সেখানে তুষার নেকড়েদের পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলেছেন
জার্মান পশুপ্রেমী মিস্টার ভাইমার। ওই প্রাণীগুলো
নেকড়ে, নাকি অন্য কিছু? হিমালয়ের
পটভূমিতে গা-ছমছমে উপন্যাস।



ISBN 978-81-8374-441-6



www.bookspatrabharati.com